ISSN-0971-8435

যোজনা
ধনধান্যে

বিশেষ সংখ্যা

অক্টোবর ২০১৪ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹২০

অপ্রথাগত ক্ষেত্র

ভারতের প্রথাবহির্ভূত অর্থনীতির ভূমিকাসমূহ
বারবারা হ্যারিস হোয়াইট

ভারতের শহুরে অপ্রথাগত ক্ষেত্র
অরূপ মিত্র

লোকবিদ্যা ও ভারতের অপ্রথাগত ক্ষেত্র
অমিত বেসোল

অপ্রথাগত ক্ষেত্র এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান
ড. উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য

ভারতে অপ্রথাগত ক্ষেত্র : বৈশিষ্ট্য ও কর্মসংস্থান
ভব রায়

প্রধানমন্ত্রীর জন-ধন যোজনা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ
প্রভাকর সাহু

গান্ধীজী ও স্বাস্থ্যবিধান
সুদর্শন আয়েঙ্গার

The story of a Man
who became a Mahatma
Read Our Books

Publications Division

Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

e-mail: dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com
website: publicationsdivision.nic.in
Now on Facebook at www.facebook.com/publicationsdivision

SOME IMPORTANT TITLES OF PUBLICATIONS DIVISION

1. The Economic History of India—Vol-One	175.00
2. The Economic History of India—Vol-Two	260.00
3. Babu Jagjivan Ram	132.00
4. Conscience of the Race—India's Off-beat Cinema	240.00
5. Indian Navy—a Perspective	300.00
6. Growing Fruits and Vegetables	240.00
7. Children in India—A Legal Perspective	75.00
8. Indian Railways—Glorious 150 years	250.00
9. Media Ethics	100.00
10. The Story of India's Struggle for Freedom	75.00
11. India In the Space Age	235.00
12. Folk Arts and Social Communication	125.00
13. Aspects of Indian Music	60.00
14. A Brief History of Water Resources in India	70.00
15. The Charkha and the Rose	75.00
16. Ramananda Chattopadhyay	75.00
17. R. N. Tagore	95.00
18. Some Eminent Indian Scientist	125.00
19. Subhas Chandra Bose	100.00
20. Khudiram Bose (Beng.)	75.00
21. Indian Civilisation and the Science of Fingerprinting	160.00
22. Story of INA	35.00

Available at :

SALES EMPORIUM :
8, Esplanade East ; Kolkata-700 069
Ph. : 2248-6696, 2248-8030

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 20.00

October, 2014
REGISTERED No. KOL-RMS/109/2014
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 100/- ☐ 2. yrs. for Rs. 180/- ☐ 3. yrs. for Rs. 250/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, শ্রীমতি সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

অক্টোবর, ২০১৪

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **রাজেশ কুমার ঝা**

সম্পাদনায় : **অন্তরা ঘোষ**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ভারতের অপ্রথাগত অর্থনীতির ভূমিকাসমূহ — বারবারা হ্যারিস হোয়াইট — ৫
- অপ্রথাগত ক্ষেত্র এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান — ড. উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য — ৮
- লোকবিদ্যা ও ভারতের অপ্রথাগত ক্ষেত্র — অমিত বেসোল — ১১
- ভারতের অপ্রথাগত ক্ষেত্র : বৈশিষ্ট্য ও কর্মসংস্থান — ভব রায় — ১৪
- ভারতের শহরে অপ্রথাগত ক্ষেত্র — অরূপ মিত্র — ১৮
- কলসেন্টারের কর্ম নিরাপত্তা — বাবু পি. রমেশ — ২২
- অপ্রথাগত ক্ষেত্রের আর্থসামাজিক সমস্যা — ড. অভিজিৎ নন্দী — ২৫
- নীতি রচয়িতাদের কাছে 'অপ্রথাগত' ক্ষেত্রের নতুন ব্যাখ্যা — সুপ্রিয় রাউত — ২৮
- ভারতে অপ্রথাগত ক্ষেত্র — অনিন্দ্য ভুক্ত — ৩২
- বিশ্বজুড়ে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের একটি চালচিত্র — অসীমা মজুমদার — ৩৫
- অপ্রথাগত ক্ষেত্রের বাড়বাড়ন্ত দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে তুলছে — তপনকুমার ভট্টাচার্য — ৩৯
- ভারতের অপ্রথাগত ক্ষেত্র, কর্মসংস্থান ও জীবিকা — ড. বি ভি ভোসলে — ৪৩

বিশেষ নিবন্ধ

- প্রধানমন্ত্রীর জন-ধন যোজনা — প্রভাকর সাহু — ৪৬
- ভারত-বাংলাদেশ বদ্বীপ ও গঙ্গার প্রাকৃতিক প্রবাহ — ড. এইচ এস সেন ও ড. দীপঙ্কর ঘড়াই — ৫০
- উপকূলের অধিকার — আনন্দ গুপ্ত — ৫৩

ফোকাস

- গান্ধীজি ও স্বাস্থ্যবিধান — সুদর্শন আয়েঙ্গার — ৫৭

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ডায়েরি — সংকলক : দেবাংশু দাশগুপ্ত — ৬১
- জানেন কি? (পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন) — মলয় ঘোষ — ৬৬
- পরীক্ষা প্রস্তুতি (অন্ত্রপ্রেনিওরশিপ) — মহুয়া গিরি — ৬৮
- যোজনা ক্যুইজ — জয়ন্ত সাহা — ৭০

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

ভারতের নির্মাতা

সকাল সকাল দরজার বাইরে ঘণ্টা বাজল। পেপারওয়ালা খবরের কাগজটা আমাদের দোরগোড়ায় ছুঁড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে আমরা তৈরি হয়ে রওনা দিই—রিকশা, অটো বা বাসে করে আমাদের কাজের জায়গায়, দোকান-বাজারের দিকে। কাজের জায়গায় দারোয়ান আমাদের কর্মস্থলটিকে পাহারা দেয়; সাফাইকর্মীরা সব ঝেড়ে-পুঁছে পরিষ্কার করে রাখে। যে কোনও সরকারি দপ্তরে ব্যক্তিগত ফাইফরমাইশ ও অন্যান্য ছোটখাট কাজের জন্য কর্মী ও সহায়করা আছে। এই সব বিভিন্ন ধরনের কর্মী—পেপারওয়ালা, অটো, বাস বা রিকশার চালক, দারোয়ান, অফিসে দিন-মজুরি পাওয়া চাপরাশি, জমাদার, কম্পিউটার অপারেটর, ইত্যাদি সকলেই অপ্রথাগত ক্ষেত্রের কর্মী। কর্মস্থল হোক বা আমাদের জীবনের অন্য কোনও দিক, বাস্তবে আমাদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অপ্রথাগত কর্মীদের ওপর আমরা খুব বেশি নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও বহুমাত্রিক এই ক্ষেত্রটির গুরুত্ব আমরা একরকম উপেক্ষা করেই চলি।

ঘানায় গবেষণাকালে ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ কীথ হার্টের 'অপ্রথাগত ক্ষেত্রের' তত্ত্বের জন্ম। পরবর্তীকালে, ১৯৭০-এর দশকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংঘ (আইএলও) এই তত্ত্বে 'সম্মানজনক কাজ'-এর উপাদান যোগ করে—অর্থাৎ 'কর্মসংস্থানের অধিকার, কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের অধিকার, শ্রম সংগঠনের (বা আলোচনায় বসার) অধিকার এবং সামাজিক সুরক্ষার অধিকার'। কিন্তু কোনও কোনও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, অপ্রথাগত ক্ষেত্রকে শুধুমাত্র অর্থনীতির আওতায় আবদ্ধ রাখলে চলবে না। কারণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে এর প্রভাব যথেষ্ট। আর তাই এর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিলেই সমস্তটা বলা হয় না। তাঁদের বক্তব্য হল 'অপ্রথাগত ক্ষেত্রের পরিসর সুবিস্তৃত এবং প্রথাগত কাঠামোর আওতার বাইরে সামাজিকভাবে যে কোনও মূল্যবান কাজকর্মই এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।' উদাহরণস্বরূপ, বিনা পারিশ্রমিকে করা গৃহকর্ম আলাদা কোনও অর্থনৈতিক শ্রেণিভুক্ত নয়; এই কাজকে অপ্রথাগত শ্রেণির আওতায় আনা দরকার এবং এ ধরনের কাজকে মাথায় রেখে যথাযথ নীতি প্রণয়ন করা দরকার। টাকার লেনদেন হয় না বলে এ ধরনের কাজের গুরুত্ব কিন্তু কমে যায় না।

আকারে-আয়তনে এবং গুরুত্বের বিচারে এই শ্রেণি ও তার প্রভাবকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। তাই এর অর্থনৈতিক দিকটিকে নীতি প্রণেতারা যথাযথ গুরুত্ব দিন, এটাই কাম্য। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৯-১০ সালে কৃষিক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ এবং অকৃষিক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ নিয়োগই ছিল প্রথামুক্ত শ্রেণিভুক্ত। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে এই কর্মীরা। বলা যায়, গুরুত্বের এবং সংখ্যার বিচারে এরাই এখন প্রথম ও প্রধান। অপ্রথাগত ক্ষেত্রে নিয়োগের বৃদ্ধি-হার খুব বেশি না হলেও এটি আমাদের অর্থনীতির এক অত্যন্ত গতিশীল অঙ্গ। সংগঠিত ক্ষেত্র এখন পিছিয়ে পড়েছে, এগোচ্ছে এই অপ্রথাগত ক্ষেত্র— উৎপাদনের এবং মূলধন একত্রিত করবার বিচারেও বটে। একে আর থমকে যাওয়া অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্র বলে অভিহিত করা ঠিক হবে না।

যেহেতু এই অপ্রথাগত ক্ষেত্র এখন আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, এই ধরনের কর্মীদের জন্য এবার নিয়ম-বিধির আওতায় আনা উচিত যাতে তাঁরা অন্যান্য ক্ষেত্রের কর্মীদের মতো যথেষ্ট সুযোগ, বেতন ইত্যাদি পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে এঁরা যেন যথাযোগ্য মর্যাদা পান, এঁদের জীবনযাত্রায় যাতে উন্নতি ঘটে এবং এঁদের জীবনযাত্রার মান যাতে উন্নত হয়। অপ্রথাগত ক্ষেত্রের কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলে কোনওদিন কিছু ছিল না। এঁদের মজুরি নির্দিষ্ট নয়; কর্মীদের জন্য যে প্রাথমিক অধিকার, তা এঁদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। 'স্বনিযুক্তি'-র তকমা আঁটা কাজ হলেও এঁদের ক্ষেত্রে তা এক অসহায় মানুষের খড়-কুটো আঁকড়ে বাঁচার শেষ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এঁদের অবহেলা করলে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে না, এ আর স্বীকার না করে লাভ নেই। তাই এই ক্ষেত্রকে স্বীকৃতি ও সমস্ত সুযোগসুবিধা দানের মাধ্যমে শনাক্ত করে তোলা সবার পক্ষেই মঙ্গলজনক।❑

ভারতের অপ্রথাগত অর্থনীতির ভূমিকাসমূহ

ভারতে অপ্রথাগত অর্থনীতির আকার, আয়তন, বিস্তার, কাঠামো, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ এই নিবন্ধে তুলে ধরেছেন **বারবারা হ্যারিস হোয়াইট**। *নীতি ও পরিকল্পনার পরিধির বাইরে থেকে যাওয়া এই ক্ষেত্রটি সম্পর্কে বহু ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়ে নিয়ন্ত্রণহীনতা ও অপরাধপ্রবণতা কীভাবে এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়েছে, বিভিন্ন সমীক্ষার সাপেক্ষে তার সম্যক পরিচয় রয়েছে এই লেখায়।*

অপ্রথাগত অর্থনীতির আকার ও তাৎপর্যের নিরিখে বিচার করলে বিশ্বে ভারতের স্থান অনন্য। অপ্রথাগত অর্থনীতির ধারণা নিয়ে বিদ্বৎমহলে বিস্তর বিতর্ক ও সমালোচনা রয়েছে। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, এটা এমন কিছু অনথিভুক্ত কাজকর্ম, যা রাষ্ট্র বা তার আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। সাধারণ মানুষের কাছে এগুলি অত্যন্ত পরিচিত এবং সেজন্য এর প্রতি পরিকল্পনাকারীদেরও বিশেষ মনোযোগ রয়েছে। এই নিবন্ধে আমরা সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এর ভূমিকা এবং নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

অপ্রথাগত অর্থনীতির কাঠামো ও সম্পর্ক

প্রথমত, প্রথাবহির্ভূত অর্থনীতি প্রকৃতিগতভাবে সাময়িক নয়। সাতের দশকে পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ায় এমন একটা ধারণা হয়েছিল যে, অনথিভুক্ত কার্যকলাপ খুব দ্রুত প্রথাগত শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে জাতিগঠনের কর্মযজ্ঞে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু 'উন্নয়নের দশক' অতিক্রান্ত হবার পরেও অপ্রথাগত অর্থনীতির অস্তিত্ব এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করল। দেখা গেল, বহু অর্থনীতিতেই যে অনথিভুক্ত কাজকর্ম রয়ে যাচ্ছে কেবল তাই নয়, নথিভুক্ত কর্মপ্রক্রিয়া থেকে সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে একে শোষণ করা হচ্ছে এবং অনথিভুক্ত কর্মপ্রক্রিয়ায় উৎপাদিত সস্তা পণ্য ও পরিষেবা থেকে নথিভুক্ত কর্মপ্রণালী লাভবানও হচ্ছে। যতই সমালোচনা হোক না কেন, অনথিভুক্ত কাজের পরিসর আরও প্রসারিত হয়েছে অপ্রথাগত শ্রমিকের সর্বব্যাপিতায়। যাঁদের কল্যাণে কোনও প্রকল্প চালু করা হয়, তাঁরা প্রায়শই কেন বঞ্চিত হন, তার কারণ অনুসন্ধানে যে গবেষণা হয়, তার নীতি নির্ধারণ ও রূপায়ণের পরিসরও অপ্রথাগত বলে অনেকের ধারণা। নির্বাচনী ব্যয় বিষয়ক গবেষণাতেও দেখা গেছে অপ্রথাগত অর্থনীতি ও কালো টাকা কীভাবে ভারতের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, ভারতের অপ্রথাগত অর্থনীতি কিন্তু ব্রিকস (BRICS) দেশগোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো মূল অর্থনীতির একটি প্রান্তিক অকিঞ্চিৎকর অংশমাত্র নয়, এটি অনেক ব্যাপ্ত। এদেশে জীবিকা অর্জনের আনুমানিক ৯২.৫ শতাংশ উৎসই অনিবন্ধিত। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন জিডিপি-তে এর ভাগ দুই-তৃতীয়াংশ। তবে যে পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, আর্থিক চাপের কারণে তার অভিমুখ ও মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। আবার বিকল্প পদ্ধতিতে, ছোট ছোট সমীক্ষা ও ঘটনার ভিত্তিতে এই হিসাব করলে তাতেও জ্ঞান সম্পর্কিত ধারাবাহিকতার অভাব থেকে যায়। 'জানা'-র দুটি ভিন্ন পদ্ধতি আছে। জাতীয় হিসাবের সঙ্গে সব সময়ে তাদের মেলবন্ধন ঘটানো সম্ভব নয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, এই অপ্রথাগত অর্থনীতি বিকাশে সাহায্য এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছে। তাই স্বাধীনোত্তর ভারতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও এটি ভারতের তুলনামূলক সুবিধার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

তৃতীয়ত, অপ্রথাগত অর্থনীতিকে কেবল দারিদ্রের স্বর্গরাজ্য বলে ভাবা ঠিক নয়। এর মধ্যে অবশ্যই দারিদ্র এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন আইএলও-র পরিভাষায় 'অসমীচীন কাজ' (কর্মস্থলে সংগঠিত হবার ও সামাজিক সুরক্ষা পাবার কার্যগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া) রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দারিদ্রের মোকাবিলায় বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল শ্রমিক ও তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তবে শ্রমিকের থেকেও নাগরিক হিসাবে তাঁরা এই সুবিধা পেয়েছেন। অপ্রথাগত অর্থনীতিতে সম্পদ সৃষ্টি এবং তার মজুতও হয়। এখানে সম্পদ ও দারিদ্রের মধ্যেকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক, দারিদ্রের কারণ প্রভৃতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

চতুর্থত, পরিসংখ্যান ও সরকারি নথিপত্রে অপ্রথাগত ক্ষেত্রকে 'অংসগঠিত' বলে উল্লেখ করা হলেও একে বিশৃঙ্খল বলা যায় না। অপ্রথাগত বাজারগুলি রাষ্ট্রের দ্বারা না হলেও সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হাজার হাজার বণিক সংগঠন ও ব্যবসায়িক সহযোগী, শিক্ষানবিশদের ওপর একধরনের সামাজিক কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, নিয়ন্ত্রিত হয় কাজের সুযোগ। ঘরোয়াভাবে তারাই দক্ষতার শংসাপত্র দেয়, চুক্তি নিয়ে বিতর্ক মেটায়, দামের ওপর প্রভাব খাটায় এবং বাজারে, বিশেষত শ্রমের বাজারে আধিপত্য ভোগ করে। তারা সম্মিলিতভাবে বিমার সুবিধা পায়, রাষ্ট্রের হুঁশিয়ারির সামনে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করে ভাড়া সৃষ্টি করে সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে তা ভাগ করে নেয়, পুনর্বণ্টনযোগ্য সম্পদ একত্রিত করে, প্রযুক্তি

ও চাহিদা সংক্রান্ত উদ্ভাবনী নানা তথ্যের সমাবেশ ঘটায়, উন্নয়নবাদী তাত্ত্বিকরা মানতে না চাইলেও এই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে লিঙ্গ, জাতিগোষ্ঠীগত পরিচয়, ধর্ম, এলাকা, ভাষা, বর্ণ প্রভৃতিকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এগুলির জেরে মূলধন ও শ্রমের সচলতা ক্ষুণ্ণ হয়, আবার একইসঙ্গে এগুলি অর্থনৈতিক বিকাশের অনুকূল। পরিকাঠামো ও সুস্থিতির সহায়ক।

পঞ্চমত, ছোট ছোট অর্থনৈতিক একক থাকলেও প্রথাবহির্ভূত অর্থনীতি তার মধ্যেই আবদ্ধ নয়। ৯৫ শতাংশের বেশি সংস্থাতেই শ্রমিকের সংখ্যা ৫ জনের কম। ১৯৯০-তে সংস্থাপিছু কর্মরত গড় শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২.৯ শতাংশ। ২০০৫ সালে তা কমে ২.৪ শতাংশ হয়েছে। উদারীকরণের জেরে অজস্র ছোট সংস্থা গড়ে উঠেছে। ছোট আকার হওয়ায়, সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধিনিয়মের আওতায় না আসা এই সংস্থাগুলির মালিকদেরও, শ্রম আইনে শ্রমিক হিসাবে ধরা হয়। মালিকদেরও তাই শ্রমিকদের মতো একই অধিকার থাকে। এই মালিকদের ৯৫ শতাংশই ক্ষুদ্র পণ্যের উৎপাদক এবং পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায়ে যুক্ত। এই ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন, ভারতীয় অর্থনীতিতে জীবিকা অর্জনের সব থেকে জনপ্রিয় উৎস। প্রথাগত ও অপ্রথাগত দুটি ক্ষেত্রেই এটি দেখতে পাওয়া যায়। জীবিকার এই উৎসটি ছোট অথচ জটিল। স্বাধীন স্বতঃপ্রণোদিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং পরনির্ভরশীল ছদ্মবেশী মজুরিভিত্তিক শ্রমের মধ্যে বহু বিচিত্র আঙ্গিক ও সম্পর্কে এর উপস্থিতি। এই সব ছোট সংস্থাগুলি খুব সামান্য মূলধন ও শ্রমিক নিয়ে কাজ করে বলে এদের উৎপাদন পদ্ধতিতে বহুল বৈচিত্র দেখা যায়। মুনাফা সর্বাধিকীকরণের থেকেও এরা বেশি জোর দেয় সর্বোচ্চ উৎপাদনের ওপর। পারিবারিক শ্রমকে বাজার দরে না ধরে তারা মূলধন নিবিড়, বৃহৎ মাত্রার প্রযুক্তি থেকে দূরে থাকে। এরা বাজার অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্জিত মুনাফা পুনর্নিয়োগ করে ব্যবসায় পরিধি বাড়ানোর প্রয়াস এদের মধ্যে দেখা যায় না বললেই চলে। অপ্রথাগত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামান্য অঙ্কের উদ্বৃত্ত, ঋণ করে পাওয়া অর্থ, বিবাহে পাওয়া যৌতুক, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পদ প্রভৃতি বিনিয়োগ করা হয়। আধুনিক ভারতে ধনতান্ত্রিকতার সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য এটাই।

তবে শুধু ছোট সংস্থাতেই নয়, বৃহৎ উদ্যোগেও প্রথাবহির্ভূত ক্ষেত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি নজরে পড়ে। কর্পোরেট ক্ষেত্রের ৪০ থেকে ৮০ শতাংশ শ্রমিকই নথিভুক্ত নয়। শ্রমশক্তির একটা সামান্য অংশই ইউনিয়নের দ্বারা সংঘবদ্ধ। শ্রমিকদের অধিকাংশই হয় তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়, অথবা মালিকপক্ষের ভয়ে সংকুচিত। কয়লাক্ষেত্রে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এখানে নথিভুক্ত শ্রমিকদের পাশাপাশি অবাধে চলছে বেআইনি, প্রথা বহির্ভূত শ্রমের রাজত্ব। এমনকী রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতেও অনিবন্ধিত ঠিকাদারদের মাধ্যমে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগের প্রবণতা স্পষ্ট। বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগের মতো বিভিন্ন পদক্ষেপে রাষ্ট্রে এই অপ্রথাগত ছবি ফুটে উঠছে, পরিকল্পনা কমিশনের নথিতে যার উল্লেখ মেলে না।

ভারতের বিকাশশীল কর্পোরেট ক্ষেত্র নিয়ে সংবাদমাধ্যম বেশ মতামাতি করলেও, ভারতীয় অর্থনীতির সিংহভাগই এখনও অপ্রথাগত ক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল। ছবিটা এমনই থাকবে, নাকি নীতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে এই ক্ষেত্রকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা সম্ভব—আসুন, এবার এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক।

নীতি ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন

অপ্রথাগত অর্থনীতির ছোট সংস্থাগুলির জন্য ভারতের কোনও সার্বিক অর্থনৈতিক প্রকল্প আছে কি না—এই প্রশ্নটি বহু বিতর্কিত। অনেকেই মনে করেন, এমন কোনও প্রকল্প নেই। তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে তাঁরা কর্মসংস্থানহীন বিকাশের ছবি তুলে ধরেন। ছোট মাত্রার উৎপাদন কীভাবে পরিকল্পনা ও স্বীকৃতির বৃত্তের বাইরে থেকে যাচ্ছে, তার নিদর্শন দেখান। অন্যদিকে অপ্রথাগত অর্থনীতিকে যাঁরা ধনতান্ত্রিক বলে মনে করেন না, রাষ্ট্রের কাছ থেকে যাঁরা উচ্ছেদের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেন, তাঁদের ধারণা, রাষ্ট্রের 'হয়তো' এমন কোনও প্রকল্প রয়েছে। সবুজ বিপ্লব, ভূমিসংস্কার, সংরক্ষিত শিল্প এবং সর্বাত্মক উন্নয়নের প্রবক্তারা বলেন বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্পের কথা। চতুর্থ একটি মত হল, ভারতে বরাবরই ছোট সংস্থাগুলির নিরাপত্তা, ধ্বংস, সুরক্ষা ও উন্নয়নকে জড়িয়ে বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অপ্রথাগত ক্ষেত্রের বহু ছোট সংস্থা শহরের সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে বন্ধ হয়ে যায় বা তাদের উচ্ছেদ করা হয়, এই সংস্থাগুলিই আবার সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা ভোগ করে, ক্ষুদ্র ঋণের সুযোগ পায়, স্থানীয় বাজারে ব্যবসা করে। কোনও পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে এগুলি করা হয় না। কিন্তু দীর্ঘদিনের এই প্রথা অস্বীকার করে এগুলিকে আজ বন্ধ করে দেওয়া বা সুসংগঠিত করে তোলা—কোনওটাই সম্ভব নয়।

একবিংশ শতকে অপ্রথাগত ক্ষেত্রেও বিধিনিয়ম ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত হচ্ছে। কৃষক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যেকার লেনদেনে মেনে চলা হচ্ছে কৃষি বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন। তবে মজা হল, এই বিধিনিয়মগুলি আবার কর্পোরেট মূল্যবোধ শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলে সমালোচিত। অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণ নির্বাচিত কিছু সংস্থার ওপরেই প্রযোজ্য। এই সংস্থাগুলিকে এখন লাইসেন্স নিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধিত হতে হয়। কিন্তু এরপর এরা যথেচ্ছভাবে শ্রম ও পরিবেশ আইন লঙ্ঘন করে, বাণিজ্যিক ও পৌর কর প্রদানে অনিয়মিত হয়। অনেক সময়ে এরা বেআইনি কাঁচামালও ব্যবহার করে এবং সেজন্য সরবরাহকারী, পরিবাহক ও নিরাপত্তা প্রদানকারীদের চাহিদা মতো অর্থ দিতেও পিছপা হয় না।

নির্বাচিত ক্ষেত্রে নীতি প্রয়োগের একটা সাধারণ ধরন আছে। দীর্ঘদিন ধরেই দেখা গেছে, ভারতের সর্বোচ্চ পুঁজিপতি শ্রেণি রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিভিন্ন সুবিধা নিলেও নিয়মনীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহী নয়। অপ্রথাগত ক্ষেত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রিত এই অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের নির্মিত পরিকাঠামো উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। এর সামাজিক সুরক্ষাজাল শ্রমশক্তির নির্বাচিত অংশের অস্তিত্বরক্ষায় সাহায্য করে। কিন্তু এখানেও অবৈধ ভাড়ার বাজারের অনুপ্রবেশ ঘটে। ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষায় শৃঙ্খলা ভাঙা এবং কর ফাঁকি দেওয়া হয়। এক সমান্তরাল ছায়ারাষ্ট্র এই

অপ্রথাগত অর্থনীতিকে শাসন করে। রাষ্ট্র এবং সমান্তরাল ছায়ারাষ্ট্র দুইয়েরই সহাবস্থান ঘটে। এর জেরে অর্থনীতি এগিয়ে চলে, তবে ক্ষুণ্ণ হয় আইনসংগত জনপরিসর।

রাষ্ট্র চাইলে বেআইনি এই কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে উন্নয়নমূলক, গণতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু তার বদলে ইচ্ছাকৃতভাবেই এই অনিয়মকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে কোনও নীতি রূপায়ণের পর তার ফলাফল, যে উদ্দেশ্যে ওই নীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল তার সঙ্গে তুলনা করে দেখা সম্ভব হয় না। ফলে কতটা সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হল, তাও অজানা থেকে যায়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ঘটনার সমীক্ষার মাধ্যমেই একমাত্র কিছু তথ্য সামনে আসতে পারে। নীতিনির্ধারকরা হয়তো এই নিদর্শনকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করবেন না, তবুও তথ্য সংগ্রহের এই একটিই পথ। বেঙ্গালুরুতে জমি ব্যবহার সংক্রান্ত এমনই একটি সমীক্ষায় প্রকাশ পায়, কীভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিগত স্বার্থের মিশেলে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে পর্যন্ত হাতের মুঠোয় নিয়ে এসে জমির বে-আইনি ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। নাগরিক সমাজের কোনও আপত্তিতেই কর্ণপাত করা হয়নি।

দারিদ্র দূরীকরণ নীতি ও তার সুফল নির্দিষ্ট মানুষজনের কাছে না পৌঁছানো নিয়ে মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে আর একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। এতে আমলাতান্ত্রিক রাজনীতির কৌশলগত চলন সামনে উঠে আসে। ব্যক্তি ও বেসরকারি স্বার্থরক্ষা কীভাবে করা হয়, প্রকাশিত হয় তাও।

কৃষি এবং ফলন পরবর্তী সরবরাহ শৃঙ্খল নিয়ে হরিয়ানায় তৃতীয় সমীক্ষাটি করা হয়। দেখা গেছে, জমি সংক্রান্ত বিষয়ে এখনও জমি আইনের পরিবর্তে এখানে জাতপাতের অঙ্কই বেশি মেনে চলা হয়। নিয়ন্ত্রিত বাজার আইন কখনও কখনও কার্যকর হলেও এর লঙ্ঘন করা হলে জরিমানার কোনও ব্যবস্থা নেই। কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে একাধিক লাইসেন্স পাওয়ার জন্য ঘুষ দেওয়া, দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধি উপেক্ষা করা, পণ্যের গুণমান বজায় না রাখার মতো ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। পরিবহণক্ষেত্রে এজেন্টরা ঘুষ দেবার জন্য 'এক জানালা ব্যবস্থা'ও তৈরি করে ফেলেছে। এমনকী ঘুষের জন্য প্রিপেইড কার্ডের প্রচলনও হয়েছে। বেআইনি ওভারলোডিং-এর মুনাফা মালিক, বুকিং এজেন্ট, কমিশন এজেন্ট, মহাজন, সরকারি আধিকারিক, রাজনীতিবিদ এবং স্থানীয় মোড়লদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলির মধ্যে গড়ে উঠেছে এক দুষ্টচক্র।

রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক নীতির পরিধি অস্পষ্ট বলে মনে করা হলেও এই সমীক্ষায় দেখা গেল, তা আসলে রাজনৈতিক পরিসরে পরিণত হয়েছে। ক্ষেত্র ও অঞ্চলভেদে এর বিভিন্নতা কতটা, তা জানতে আরও সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। নিয়ন্ত্রণমূলক রাজনীতি ভাড়াকে দুভাবে কাজে লাগায়। রাষ্ট্রের হাতে থাকে নিয়ন্ত্রণমূলক স্বাধীনতা আর রাষ্ট্রকে হাতে রাখে স্থানীয় পুঁজি।

শহর ও অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়ে পরিকল্পনাকারীরা যেসব সমস্যায় পড়েন, তার সমাধানে তাঁরা মূলত দুভাগে এগোন। একটি পথ হল নমনীয় বিধিনিয়ম এবং অপরটি আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু এর কোনওটিই অপ্রথাগত অর্থনীতির ওপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

নীতি রূপায়ণের এই প্রতিবন্ধকতা, বিধি কার্যকর করার শক্তির অভাব এখন গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছে। রাষ্ট্রের নীতি এখন বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের স্বার্থের সঙ্গে সমঝোতা করে পরিশোধিত হয়ে আসে। ভবিষ্যতের কোনও পরিকল্পনা করার সময়ে এই সত্যটি অবশ্যই মাথায় রাখা দরকার।

আনুষ্ঠানিকতা

প্রথাবহির্ভূত অর্থনীতিকে আনুষ্ঠানিক কাঠামোয় আনার কথা মাঝে মাঝেই ওঠে। কিন্তু আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিই এখন ক্রমশ আনুষ্ঠানিকতামুক্ত হয়ে উঠছে। নির্বাচিত লাইসেন্সধারীরা ব্যাংক ঋণের সুবিধা পাচ্ছেন। ব্যবসায়িক সংগঠনগুলি দক্ষতার শংসাপত্র দিচ্ছে। এর জেরে শ্রমের সচলতা বাড়ছে। আধারের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পসহ বিভিন্ন সরকারি কাজের টাকা বৈদ্যুতিনভাবে মিটিয়ে দেওয়ার যে পদ্ধতি শুরু হয়েছে, তা দেশের সর্বত্র সমানভাবে এখনও চালু না হলেও এর জেরে শ্রম ও নাগরিকত্বের মধ্যে একটা আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণের জন্যও নথিভুক্তির প্রয়োজন হয়, কিন্তু স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এই ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের সময়ে বহু ক্ষেত্রেই জাতপাত ও লিঙ্গ পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এনইএফটি-এর মাধ্যমে বাজারের ভৌগোলিক পরিধি প্রসারিত হয়েছে এবং ঋণ মজুরির ক্ষেত্রে খামখেয়ালিপনা কমেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও মৌখিক চুক্তির পরিসর রয়েই গেছে। রাষ্ট্রের পরিবর্তে বাজারই এখন ত্রুটিপূর্ণ এই পদ্ধতির চালিকাশক্তি।

রাষ্ট্র এখন অনেকটাই আপসকামী। বিশেষত স্থানীয় স্তরে মরশুমি আয়ের স্বল্পতায় বহু জায়গাতেই মৌলিক পরিকাঠামো সেভাবে গড়ে ওঠেনি। এর জেরে অঘোষিতভাবে সরকারি পরিষেবার বেসরকারিকরণ ঘটে চলেছে। এর ফলে সমাজে বৈষম্য বাড়ছে। ভারতে এমন বিভিন্ন ক্ষেত্র ও অঞ্চল রয়েছে, যেখানে স্থানীয় অর্থনীতি শুধু অপ্রথাগতই নয়, দুর্বৃত্তায়িত হয়ে উঠেছে। সেখানে পদে পদে আইন লঙ্ঘন করা হচ্ছে, গড়ে উঠছে সমান্তরাল ব্যবস্থা, পাশাপাশি উৎপাদিত হচ্ছে আইনসংগত ও বেআইনি পণ্যসামগ্রী। একে রক্ষা করছে দুর্বৃত্তদের দল। এর সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক দলের তহবিলে অর্থ সংগ্রহের বিষয়। রাজনৈতিক পরিসরের দুর্বৃত্তায়ন ঘটছে। নির্বাচনী ব্যয় সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের নির্বাহ করার প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে ঘোরতর বিরোধিতা করেছে, কর ফাঁকি ও মূলধনি যুদ্ধ যেভাবে চলছে, তাতে অপ্রথাগত ও কালো টাকার অর্থনীতির এখনই লুপ্ত হবার কোনও ইঙ্গিত মিলছে না।

নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, প্রথাবহির্ভূত অর্থনীতি, পরিবর্তনের বিরোধী নয়, ভারতের তুলনামূলক উচ্চ বিকাশ হারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই ক্ষেত্র সব ধরনের উদ্ভাবনকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। প্রযুক্তিগত, পদ্ধতিগত, সাংগঠনিক—যেকোনও উদ্ভাবনকেই অপ্রথাগত অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সাদরে গ্রহণ করেছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের এই সত্য স্বীকারের এবং এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সময় এসেছে।❑

[লেখক অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির 'সিনিয়ার রির্সাচ ফেলো' ও 'এমেরিটাস প্রফেসার অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ'।

email: barbara.harriss-white@qeh.ox.ac.uk]

অপ্রথাগত ক্ষেত্র এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান

ভারতের অর্থনীতিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এ দেশের মোট শ্রমশক্তির ৮৬ শতাংশ অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, দেশের সামগ্রিক নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বর্তমান বাজারদরের নিরিখে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অবদান ৬০ শতাংশেরও বেশি। এই প্রবণতা শ্রমিকদের জীবনমান তথা দেশের অর্থনীতির পক্ষে একেবারেই মঙ্গলজনক নয়। অপ্রথাগত ক্ষেত্রের বর্তমান চিত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে **ড. উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য***-র এই প্রবন্ধ।*

আধুনিক বিশ্বে শ্রমশক্তির বাজারে একটা বড় অংশ জুড়ে আছে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের শ্রম। এই শ্রমিকরা পুরোপুরিভাবে অসংগঠিত এবং বিভিন্ন ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত। বিগত বেশ কয়েক দশক ধরে দেখা গেছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বেশ উচ্চগ্রামে বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মজার কথা এই যে উন্নয়নের হার উচ্চ হলেই যে শ্রম নিযুক্তির হার সেই পরিমাণে বাড়বে তা নয়। এই সত্য প্রতিভাত হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রথাগত নিযুক্তির ক্ষেত্রে। প্রথাগত নিযুক্তি উন্নয়ন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হয় আদৌ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি, নতুবা খুবই কম হারে বেড়েছে। অন্যদিকে দেখা গেছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ওই একই সময়ে অত্যন্ত দ্রুতহারে প্রথামুক্ত ক্ষেত্রের নিযুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে (ILO-WTO, 2009)। এছাড়া বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দশকে সারা বিশ্ব জুড়ে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল এবং তার ফলশ্রুতিতে উন্নয়নশীলসহ বিশ্বের তাবৎ দেশে প্রথাগত ক্ষেত্রে যে ব্যাপক কর্মচ্যুতি দেখা দেয়, তা পরবর্তী বছরগুলিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রে শ্রমশক্তি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রথাগত ক্ষেত্রের ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকরা একপ্রকার বাধ্য হয়েই অপ্রথাগত ক্ষেত্রের শ্রমের বাজারে যুক্ত হয়েছিল (ILO, 2009)। ভূমিকায় এই উল্লেখটুকুর দরকার এই কারণে যে বর্তমানে আমাদের দেশসহ বিশ্বের বহু উন্নয়নশীল দেশেই প্রথাগত ক্ষেত্রের চাইতে প্রথামুক্ত ক্ষেত্রের শ্রমিক সংখ্যা বহুগুণ বেশি। তাই আজকের দিনে কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্যালোচনা তথা দেশের শ্রমবাজারের পরিস্থিতি নিরূপণ ও কর্মক্ষম জনসংখ্যার নিযুক্তি বিশ্লেষণে অপ্রথাগত ক্ষেত্রকে উপেক্ষা করা তো যায়ই না, বরং তা সবিশেষ পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে।

অপ্রথাগত ক্ষেত্র কী

১৯৭১ সালে কীথ হার্ট 'প্রথামুক্ত আয়ের সুযোগ এবং ঘানায় শহরাঞ্চলে নিযুক্তি' শীর্ষক গবেষণাপত্রে প্রথম 'অপ্রথাগত ক্ষেত্র' বিষয়ের আলোচনা করেন। তবে হার্টের বিশ্লেষণে প্রথামুক্ত ক্ষেত্রটি এইভাবে বিচার করা হয়েছিল যে শ্রমদান বাবদ শ্রমিক আদৌ মজুরি হাতে পাচ্ছে, না কি শ্রমিকের শ্রমদান স্বনিযুক্তিতে সীমাবদ্ধ। কারণ স্বনিযুক্তিতে শ্রমিকের মজুরি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট হারে পাওয়ার উপায় থাকে না, কেননা সে নিজেকেই নিজে তার আপন অর্থনৈতিক কাজ কারবারে নিয়োজিত করেছে। তবে ১৯৭২ সালে আফ্রিকার কেনিয়াতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংঘের (আইএলও) বিশেষ কার্যক্রমের মাধ্যমে 'অপ্রথাগত ক্ষেত্রের' আলোচনা ও বিশ্লেষণ অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৯৩ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংঘ প্রথামুক্ত ক্ষেত্রের তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যুক্তিনিষ্ঠ এক নিয়মাবলি প্রণয়ন করে এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রসংঘ উক্ত নিয়মাবলিকে মান্যতা দেয়। এর পর থেকেই অপ্রথাগত ক্ষেত্রের সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপ্রথাগত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমশক্তির বিশালতা ও ব্যাপকতা আন্দাজ করা বাস্তবিকই শক্ত। তবু বিভিন্ন জীবিকায় নিযুক্ত শ্রমিকদের মোটের ওপর নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্ষেত্রে ভাগ করা যেতে পারে—

(ক) কৃষিকার্য : ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, পশুপালন, শস্য সংরক্ষণ ও খামারশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক, কারুজীবী প্রভৃতি।

(খ) শিল্প : ইটভাটায় ও নির্মাণ প্রকল্পে নিযুক্ত শ্রমিক, বিড়ি শিল্প, ধূপকাঠি শিল্প ও অন্যান্য কুটির শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক।

(গ) সেবাক্ষেত্র : স্থানীয় পরিবহণে নিযুক্ত শ্রমিক, দোকান ও গৃহকর্মে নিযুক্তি, রাস্তার হকার, কাগজ কুড়ানি প্রভৃতি।

(ঘ) কর্মশালা : জুতা তৈরি, দরজির কাজে, সূচীশিল্পে নিযুক্তি। তাছাড়া কামারশালা, গ্রিল তৈরি প্রভৃতি।

(ঙ) ঘরোয়া বা পারিবারিক ক্ষেত্র : পোশাক তৈরি, হস্তশিল্প এবং কারুশিল্পে নিযুক্তি।

উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলি বলা চলে উদাহরণমূলক, এর বাইরে অসংখ্য জীবিকা ও উপজীবিকা আছে যা মূলত অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অন্তর্গত। এ কথা বলা চলে যে প্রথাগত ক্ষেত্রের মতোই অপ্রথাগত ক্ষেত্র

দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন এবং বণ্টনে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু প্রথামুক্ত ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে কোনও একটি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে নিযুক্ত শ্রমশক্তি সংখ্যায় খুবই অল্প (আইএলও-এর সংজ্ঞানুসারে যা দেশবিভেদে ৫ থেকে ১০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে) এবং শ্রমিকরা তাদের আয়ের উৎস হিসেবে এই ক্ষেত্রে শ্রমদান করে। এখানে কোনও বাঁধাধরা কাজের সময় নেই, নেই অন্য কোনও সামাজিক নিরাপত্তা, এমনকী মজুরির হার দেশে প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট থাকে না। অপ্রথাগত ক্ষেত্রের শ্রমিক প্রায়শই ঘরোয়াভাবে নিযুক্ত হন, অনেক ক্ষেত্রেই তা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা চেনা-পরিচিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাই অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অনেকটাই ঘরোয়া ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতে অপ্রথাগত ক্ষেত্র

১৯৪৮ সালের কারখানা আইনের বিধান এই যে, কোনও উৎপাদন প্রতিষ্ঠান যদি শক্তি ব্যবহার করে কমপক্ষে ১০ জন অথবা শক্তির ব্যবহার ব্যতিরেকে কমপক্ষে ২০ জন শ্রমিক নিযুক্ত করে তবে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এই আইনের আওতায় আসবে এবং তা প্রথাগত ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। এর বাইরে থাকা সমস্ত উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকেই অপ্রথাগত ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করা হবে।

ভারতে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দপ্তর (NSSO) বেশ কিছুকাল ধরে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের বিভিন্ন পরিসংখ্যান সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত আছে এবং বলাই বাহুল্য অপ্রথাগত ক্ষেত্রের আলোচনায় এই পরিসংখ্যানই যথাযথ মান্যতা পায়। ভারতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করা যায়—

১) অপ্রথাগত ক্ষেত্রে শ্রম ও মূলধনের পার্থক্য খুব সামান্যই বা অনেক সময় প্রায় থাকে না বললেই চলে। এর সাংগঠনিক কাঠামো খুবই ছোট এবং প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্র মাত্রিক।

২) অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই পারিবারিকভাবে গড়ে তোলা হয় এবং ঘরোয়া আত্মীয়স্বজন এতে প্রয়োজন অনুযায়ী নিযুক্ত হন।

৩) প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেই প্রথামাফিক হিসাবনিকাশের কোনও খাতাপত্র থাকে না। এর ফলে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়।

৪) প্রতিষ্ঠানের মালিক নিজস্ব দায়বদ্ধতা ও ঝুঁকিতে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের দায় সীমাহীন হয় কেননা প্রাতিষ্ঠানিক যা কিছু ক্রিয়াকার্য তা সবটাই ব্যক্তি কেন্দ্রিক।

৫) বহুক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাড়ির নিজস্ব খরচ খরচার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচ জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এজন্য প্রকৃত উৎপাদন খরচ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্র এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে আছে। ২০০৪-০৫ সালের এক সমীক্ষায় (NSSO সমীক্ষা) প্রকাশ যে ভারতবর্ষের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৬ শতাংশ প্রথামুক্ত ক্ষেত্রে নিযুক্ত। বাকি অংশের মধ্যে ৪.৫ শতাংশ সরকারি সংগঠিত ক্ষেত্রে, ২.৫ শতাংশ যৌথমূলধনি কারবারি প্রতিষ্ঠানে এবং অবশিষ্ট প্রায় ৭ শতাংশ নিয়োগ সংগঠিত ও প্রথাগত ঘরোয়া প্রতিষ্ঠানে হয়েছে যেখানে ৫ বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োজিত। আর যদি দেশের সামগ্রিক নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের কথা দেখা যায়, সেক্ষেত্রে বর্তমান বাজারদরের নিরিখে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অংশভাগ ৬০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। NSSO-এর এক হিসাবে দেখানো হয়েছে যে ২০০৪-০৫ সালে ভারতবর্ষে শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৪৫ কোটি ৭৫ লক্ষের মতো। সংখ্যাটি তার বছর পাঁচেক আগে ছিল সাড়ে উনচল্লিশ কোটির মতো। ২০০৪-০৫ সালে সমগ্র ভারতে প্রায় চল্লিশ কোটির কাছাকাছি মানুষ অপ্রথাগত ক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন যা ভারতের মোট শ্রমিক সংখ্যার প্রায় ৮৬ শতাংশ।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার পাঁচ বছরে ভারতে কী হারে প্রথাগত ও প্রথামুক্ত ক্ষেত্রের নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তা সারণি-১-এ দেখানো হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে প্রথাগত ও অপ্রথাগত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা উক্ত পাঁচ বছরের সময়কালে উভয়ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে গ্রামাঞ্চলে গড় বার্ষিক শ্রমিক নিযুক্তি বৃদ্ধির হার প্রথাগত ক্ষেত্রে (৩.৬৯ শতাংশ) বেশি, প্রথামুক্ত ক্ষেত্রে (২.৭ শতাংশ) কিছু কম। কিন্তু শহরাঞ্চলে বিষয়টা ঠিক উলটো। সেখানে ওই সময়কালে (১৯৯৯-০০ থেকে ২০০৪-০৫ সাল) প্রথাগত ক্ষেত্রে গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার (২.৬৭ শতাংশ) অপ্রথাগত ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হারের (৪.৩৬ শতাংশ) বেশ কম।

অপ্রথাগত ক্ষেত্রের নিযুক্তি কোনও দেশের সামগ্রিক নিয়োগের নিরিখে কী স্থান অধিকার করে থাকে তা তুলনামূলক ব্যাখ্যার জন্য এশিয়ার তিনটি দেশ যথা—ভারত,

সারণি-১
ভারতে অপ্রথাগত ও প্রথাগত ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের নিযুক্তির সংখ্যা
(১০ লক্ষের হিসাবে)

ক্ষেত্র	লিঙ্গ	অপ্রথাগত ক্ষেত্র		প্রথাগত ক্ষেত্র		সর্বমোট	
		১৯৯৯-২০০০	২০০৪-২০০৫	১৯৯৯-২০০০	২০০৪-২০০৫	১৯৯৯-২০০০	২০০৪-২০০৫
গ্রামীণ	পুরুষ	১৭৮.৫০	১৯৭.৮৭	১৮.২৪	২১.১৭	১৯৬.৭৪	২১৯.০৪
	নারী	৯৮.৬৩	১১৭.২১	৫.৩৯	৬.৮২	১০৪.০২	১২৪.০৩
	মোট জনসংখ্যা	**২৭৭.১৩**	**৩১৫.০৮**	**২৩.৬৩**	**২৭.৯৯**	**৩০০.৭৫**	**৩৪৩.০৭**
নগরাঞ্চল	পুরুষ	৫১.৬২	৬১.৯৪	২৫.৪২	২৮.৪৬	৭৭.০৫	৯০.৪
	নারী	১৩.৮৯	১৭.৮৮	৫.০৭	৬.১২	১৮.৯৬	২৪.০
	মোট জনসংখ্যা	**৬৫.৫১**	**৭৯.৮২**	**৩০.৫০**	**৩৪.৫৮**	**৯৬.০১**	**১১৪.৪**
সর্বমোট	পুরুষ	২৩০.১২	২৫৯.৮১	৪৩.৬৬	৪৯.৬৩	২৭৩.৭৮	৩০৯.৪৪
	নারী	১১২.৫২	১৩৫.০৯	১০.৪৬	১২.৯৪	১২২.৯৮	১৪৮.০৩
	মোট জনসংখ্যা	**৩৪২.৬৪**	**৩৯৪.৯০**	**৫৪.১২**	**৬২.৫৭**	**৩৯৬.৭৬**	**৪৫৭.৪৭**

উৎস : ভারতের NSSO-এর ৫৫তম (১৯৯৯-২০০০) এবং ৬১তম (২০০৪-০৫) সমীক্ষা থেকে গৃহীত।

সারণি-২
কৃষি ব্যতিরেক ক্ষেত্রে অপ্রথাগত নিযুক্তি (তিনটি দেশের তুলনা)

সময় কাল ২০০৯-১০

দেশের নাম	পরিবহণে নিযুক্তি		নির্মাণকার্যে নিযুক্তি		ব্যবসায় নিযুক্তি		উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্তি		পরিবহণ ও বাণিজ্য ব্যতীত অন্যান্য সেবা		সামগ্রিক অকৃষি ক্ষেত্রের প্রথামুক্ত নিযুক্তি	
	কত শতাংশ প্রথামুক্ত	সামগ্রিক অ-কৃষি নিযুক্তির কত শতাংশ	কত শতাংশ প্রথামুক্ত	সামগ্রিক অ-কৃষি নিযুক্তির কত শতাংশ	কত শতাংশ প্রথামুক্ত	সামগ্রিক অ-কৃষি নিযুক্তির কত শতাংশ	কত শতাংশ প্রথামুক্ত	সামগ্রিক অ-কৃষি নিযুক্তির কত শতাংশ	কত শতাংশ প্রথামুক্ত	সামগ্রিক অ-কৃষি নিযুক্তির কত শতাংশ	কত শতাংশ প্রথামুক্ত	মোট শতাংশ
ভারত[১]	৮৪.৫	৯.৩	৯৭.৬	২০.৮	৯৭.২	২১.৫	৮৭.১	২৩.৩	৫৯.৯	২৫.১	৮৩.৬	১০০
পাকিস্তান[২]	৮৪.৯	৯.৬	৯৬.৭	১২.৩	৯৬.১	২৯.৪	৮০.০	২৫.৫	৪১.৫	২৩.২	৭৮.৪	১০০
চীন[৩]	২১.৮	৯.২	৩৫.২	৪.১	৫৯.৬	২০.৭	১৭.১	১৫.২	২৭.৬	৫০.৪	৩২.৪	১০০

উৎস : ১. ভারতের জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (৬৬তম)। ২. পাকিস্তানের শ্রমশক্তি সমীক্ষা। ৩. চীনের নগরকেন্দ্রিক শ্রম সমীক্ষা (ছয়টি শহরে)।

পাকিস্তান এবং চীনের 'কৃষিক্ষেত্র বহির্ভূত নিযুক্তির' বিশ্লেষণ করা হয়েছে (সারণি-২) যার সবটুকু অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অন্তর্গত। কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে—পরিবহণ, নির্মাণকার্য, উৎপাদন, ব্যবসা এবং 'ব্যবসা ও পরিবহণ ব্যতীত' অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্ষেত্র।

সারণি-২ পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ভারত এবং পাকিস্তানের ক্ষেত্রে পরিবহণ, ব্যবসা, নির্মাণকার্য ও উৎপাদন—এই চারটি অ-কৃষি ক্ষেত্রে প্রথামুক্ত নিযুক্তি প্রায় সমান বা কম বেশি কাছাকাছি। তবে পাকিস্তানে নির্মাণ কার্যের ভূমিকা সামগ্রিক অ-কৃষি নিযুক্তির নিরিখে কম, মাত্র ১২.৩ শতাংশ (ভারতে ২০.৮ শতাংশ)। আর চীনের ক্ষেত্রে এই হার আরও কম—মাত্র ৪.১ শতাংশ। ভারত ও পাকিস্তানে যেখানে অপ্রথাগত অ-কৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্তি যথাক্রমে ৮৩.৬ এবং ৭৮.৪ শতাংশ, চীনের ক্ষেত্রে তা বেশ কম, মাত্র ৩২.৪ শতাংশ। অর্থাৎ চীনের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের নিযুক্তি প্রথাগত নিযুক্তির চেয়ে অনেক কম যা ভারত ও পাকিস্তানে সম্পূর্ণ বিপরীত। চীনে 'পরিবহণ ও বাণিজ্য ব্যতীত অন্যান্য সেবাক্ষেত্র'-এ নিযুক্তি ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিগুণ—৫০.৪ শতাংশ। একথা তাই বলা যেতে পারে যে এশিয়া মহাদেশে অর্থনৈতিকভাবে অন্যতম এক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারত কিন্তু চীনের থেকে অনেক বিষয়ে পিছিয়ে আছে; যার একটি দিক হল অপ্রথাগত ক্ষেত্রে ব্যাপক সংখ্যায় নিযুক্তি যা কিনা অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উপসংহার

বর্তমানে দেশে ঠিক কত সংখ্যায় শ্রমিক অপ্রথাগত ক্ষেত্রে নিযুক্ত আছেন এবং দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ঠিক কতটা অংশ অপ্রথাগত ক্ষেত্রের দান তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা শক্ত কারণ এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য আহরণের অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও এই সীমাবদ্ধতা কম বেশি সত্য। তবে যাই হোক NSSO সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বলতে হয় যে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের যে অবদান তা প্রথাগত ক্ষেত্রের চেয়ে কোনও অংশে কম তো নয়ই বরং অপ্রথাগত ক্ষেত্রের নিযুক্তি দেশের এক বিশাল সংখ্যক কর্মক্ষম মানুষকে উপার্জনের রাস্তায় এনেছে। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা দীর্ঘকাল ধরেই চরম অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার। তাদের না আছে ন্যূনতম মজুরি পাবার নিশ্চয়তা, না আছে কোনও সামাজিক সুরক্ষা। এমনকী বছরে সব দিন কাজও জোটে না এবং অসুস্থতা, আঘাতজনিত কারণে শারীরিক সক্ষমতা নষ্ট হলে অনাহার ও মৃত্যুই যেন অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। উলটো দিকে প্রথাগত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের, বিশেষত সরকারি ক্ষেত্রে, চাকুরি জীবন এবং অবসরকাল সবটাই অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট সচ্ছল। একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কেউই জেনে বুঝে শখ করে কম বেতনে ও কঠোর শর্তে প্রথামুক্ত ক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে চায় না। প্রথাগত ক্ষেত্রে নিয়োগে সুযোগের অভাব তাকে অপ্রথাগত ক্ষেত্রে যুক্ত হতে বাধ্য করে। অথচ, এটাও সত্য যে দেশের অর্থনীতির সিংহভাগ এই অপ্রথাগত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের শ্রমদানে গড়ে উঠছে। ওই বিষয়টিতে আমাদের দেশের সরকারের আশু নজর দেওয়া প্রয়োজন যাতে করে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের একটা বড় অংশ, যারা বৃহৎ শিল্পের অনুসারী ক্ষেত্রে যুক্ত তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন সম্ভব হয়। উন্নয়নশীল অনেক দেশেই ওই বিষয়ে নজর দেওয়া হচ্ছে। ভারতেও বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। আগামী দিনগুলোতে আশা করা যায় যে ওই বিষয়ে আরও সুসংবদ্ধ নীতি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে যার সঠিক রূপায়ণ কিছুটা হলেও অপ্রথাগত ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের জীবনে সুবাতাস বহন করে আনবে।❑

[লেখক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রামোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান।]

লোকবিদ্যা ও ভারতের অপ্রথাগত ক্ষেত্র

স্বীকৃতি না থাকলেও, বিশ্বায়নের হাত ধরার আগে থেকেই ভারতীয় অর্থনীতিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ছিল। বাজার অর্থনীতির যুগে এই অপ্রথাগত ক্ষেত্রের আধিপত্য ছাপিয়ে গিয়ে প্রথাগত ক্ষেত্রের কর্মসংস্থানেও বেশ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। আর নিত্যনতুন প্রযুক্তির ভিড়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে হারিয়ে যাচ্ছে ভারতের সনাতন লোকবিদ্যা। লোকবিদ্যার সঙ্গে অর্থনৈতিক বিকাশের সমন্বয় ঘটিয়ে সার্বিক উন্নয়নের পরিকল্পনা কতটা বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী? আলোচনা করছেন **অমিত বেসোল।**

অপ্রথাগত ক্ষেত্র বলতেই চোখে ভেসে ওঠে অদক্ষ বা আধা-দক্ষ শ্রমিকদের আনাগোনা আর কর্মব্যস্ততা। অসংগঠিত ক্ষেত্রের সংস্থা সংক্রান্ত জাতীয় কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গিও এ ছবির রকমফের মাত্র। কমিশনের কথায় এই ক্ষেত্রে অদক্ষ কর্মী সংখ্যায় বেজায় গরিষ্ঠ (সেনগুপ্ত ও অন্যান্য ২০০৯)। একথা মনগড়া নয়। অভিজ্ঞতালব্ধ দুটি তথ্য থেকে এর সমর্থন মেলে। এক, অপ্রথাগত কর্মীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ স্কুল-কলেজের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কম। দ্বিতীয়ত, এর ফলশ্রুতি অল্প মজুরি ও কম উৎপাদনশীলতা। এ নিবন্ধে দুটি দিকই আমি খুঁটিয়ে দেখব। এই ইস্যুটায় অধিকাংশের সঙ্গে আমার মত মেলে না। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই অপ্রথাগত ক্ষেত্রে আছে এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার। সেই জ্ঞান দেয়ানেয়া বা বিনিময় এবং দক্ষতা আর কুশলতা গড়ে তোলার চলও যথেষ্ট। ক্ষুদ্র শিল্প শুমারি, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (এন এস এস), বারাণসীর তাঁতশিল্পী ও খাবার বিক্রেতা এবং মুম্বইয়ে রাস্তার হকারদের নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষার তথ্য নিবন্ধে কাজে লাগানো হয়েছে। ঠাঁই পেয়েছে পত্রপত্রিকা এবং বইপত্তরের লেখালেখিও।

সনাতন ও লোকায়ত জ্ঞান (ট্র্যাডিশনাল অ্যান্ড ইনডিজিনাস নলেজ) নিয়ে ইদানীং বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ব মেধাস্বত্ব সংস্থা বেশ উৎসুক। সৃজন ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে এ জ্ঞান আধুনিক জ্ঞান থেকে ভিন্ন গোত্রের। দেশবিদেশে শত শত বছর ধরে এই লোকায়ত জ্ঞান ভাণ্ডার পুষ্ট করেছে, কিষাণ, কারিগর, জনজাতির মানুষজন ও মেয়েমহল। জীববৈচিত্র, কৃষি-বনায়ন, শিল্পকলা, চিকিৎসা, বাস্তুসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে এদের এ জ্ঞান নিয়ে কত কিছু লেখাজোখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে (বেসোল ২০১২)। এরাই খাটাখাটনি করে অপ্রথাগত ক্ষেত্রে। সনাতন ও লোকায়ত জ্ঞান অবশ্য অপ্রথাগত ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করতে তেমন কাজে লাগানো হয়নি। কারণ বোধহয়, শুধুমাত্র কৃষি ও হস্তশিল্প নয়, চিরায়ত শিল্পের তকমায় পড়ে না এবং আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারকারী খাদ্য, বস্ত্র, প্লাস্টিক, ধাতু, যন্ত্রপাতি, নির্মাণ এবং পরিষেবার মতো বহু শিল্পে খোঁজ মিলবে অপ্রথাগত কর্মীর। অনেক ক্ষেত্রে এসব কর্মী আবার জনজাতির নয়। সহস্রবুধী ও সহস্রবুধী (২০০১) এই জ্ঞানের নাম দিয়েছেন 'লোকবিদ্যা'। স্কুলকলেজের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ না পাওয়া লোকজনের দক্ষতা এর আওতায় পড়ে। লোকবিদ্যার সঙ্গে যোগ আছে মূল্য বা নীতিবোধের। জাতীয় জ্ঞান কমিশনের স্বপ্ন ভারতকে এক জ্ঞানভিত্তিক সমাজে রূপান্তর করা। সে স্বপ্ন হাসিল করতে হলে দেশের কোটি কোটি খেটে খাওয়া মানুষের সৃষ্ট ও ব্যবহৃত এই লোকবিদ্যাকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দিয়ে কাজে লাগানো দরকার।

মজুরি, উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতার সম্পর্ক

অপ্রথাগত ক্ষেত্রে দক্ষতা কমসম। এখানে অল্প মজুরি ও কম উৎপাদনশীলতা এর প্রমাণ বলে হামেশা যুক্তি খাড়া করা হয়। সত্যি বলতে, দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা আর মজুরির মধ্যে সম্পর্কটা জটিল। এই সম্পর্ক নির্ভর করে প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত কারণের ওপর । ভারতের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এক প্রধান কাঠামোগত বাস্তবসত্য হল উদ্বৃত্ত বা বাড়তি শ্রমিক। সংখ্যায় তুমুল গরিষ্ঠ খেটে খাওয়া মানুষকে ঠাঁই দিতে প্রথাগত ক্ষেত্র অক্ষম। কাজ না মেলায় অনেকে নেমে পড়ে ক্ষুদ্র সংস্থা খুলতে। বাদবাকিরা ভিড় জমায় অপ্রথাগত শ্রম বাজারে। পণ্যের বাজারে এই দু'পক্ষের মধ্যে চলে গলাকাটা প্রতিযোগিতা। কী শুধুমাত্র দক্ষতার দরুন। প্রথাগত ও অপ্রথাগত কর্মীদের রোজগারের ফারাক না কী সংস্থার গড় আকৃতি, পণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতার মাত্রা ও মূলধন-শ্রমিক অনুপাত ইত্যাদির মতো কাঠামোগত কারণও দায়ী। গবেষণার একটা দিক হবে এটা খতিয়ে দেখা। এছাড়া, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে বাজার দামের ওপর, পণ্যের বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার দরুন দাম পড়ে যায়। অর্থাৎ বেশি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদনশীলতা কম। সে তুলনায় বাজারের একটা মোটা অংশের দখলদার সংস্থার উৎপাদনশীলতা বেশি।

দ্বিতীয় বিভ্রান্তিকর ব্যাপার, শ্রমিক উদ্বৃত্ত হলে দক্ষ কর্মীদের মজুরিও কমতে পারে। শ্রমিকদের দর কষাকষির ক্ষমতা তেমন না থাকাটাই এর হেতু। এখানে শেষ নয়, উৎপাদনশীলতা বাড়লে তার সুফল ভোগ করবে শ্রমিক এমনটা ভাবা ঠিক নয়।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দরুন বাড়তি আয়টা সংস্থার মালিক মুনাফা হিসেবে পকেটে পোরে। আর প্রতিযোগিতামূলক বাজার হলে পোয়াবারো ক্রেতাদের। জিনিস মেলে কম দামে। এর নজির হিসেবে খাড়া করা যায় বারাণসীর তাঁত শিল্পকে। হস্তচালিত তাঁতের তুলনায় বিদ্যুৎচালিত তাঁতে উৎপাদন দশ গুণের বেশি। অথচ দু'ক্ষেত্রেই ঘণ্টা পিছু মজুরি তুল্যমূল্য।

জ্ঞান বলতে কী ধর্তব্য

অপ্রথাগত কর্মী অদক্ষ, এই ধ্যানধারণা কেবল অর্থনৈতিক কারণের ওপর নির্ভর করে না। সমাজতান্ত্রিক কারণ যেমন জ্ঞানের রকমভেদে তার সঙ্গে যুক্ত মর্যাদা বা মূল্য এবং দার্শনিক কারণ যথা জ্ঞান বলতে কী বোঝায়—এই দুইও গুরুত্বপূর্ণ।

নমুনা হিসেবে নারী ও নিচু জাতের কর্মীদের জ্ঞানের কথা উল্লেখ করা যায়। অপ্রথাগত কর্মীদের মধ্যে এদের সংখ্যা ঢের বেশি। আদ্যিকাল থেকে তাদের জ্ঞানের উচিত মূল্য জোটেনি। জাতীয় কমিশনের নজরে এসেছে নারীদের কাজে 'কম দক্ষতা'-র তকমা দেগে দেওয়া হয় হামেশা। তা সে কাজ যতই অসাধারণ প্রতিভা এবং বেশ কিছু বছরের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ফসল হোক না কেন। বস্ত্র এবং চীনামাটি শিল্পে চিকন বা মাটি তৈরির কাজে যথেষ্ট মুনশিয়ানা দরকার। এতে তুখোড় মেয়ে কর্মীরা। অথচ মজুরি তাদের ছিটেফোঁটা। গোটা দিনের কাজের শেষে বারাণসীর নারী চিকন কর্মীদের প্রাপ্তি সাকুল্যে ২৫-৩০ টাকা মাত্র। ব্যবসায়ীরা ভাবে এটাই ঢের। চিকনের কাজে তো মেয়েরা দড় হয়ে যায় আপনা আপনি। এরা স্থায়ী কর্মী নয়, কাজ করে তো ফুরসত সময়ে। আশ্চর্য, বঞ্চনার অভিযোগ দূরের কথা, খোদ মেয়ে কর্মীরাও একই ভাবনাচিন্তার শরিক।

অপ্রথাগত অর্থনীতির জ্ঞান-ভিত্তি চিহ্নিত করার প্রচেষ্টায় সরকারি সমীক্ষা নেহাতই মামুলি। কারণ লোকবিদ্যাকে জ্ঞান হিসেবে ধরার কোনও ব্যবস্থা এতে নেই। তৃতীয় এবং চতুর্থ নিখিল ভারত ক্ষুদ্র শিল্প শুমারিতে সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাদের কারিগরি জ্ঞানের উৎস জানাতে। এক নম্বর সারণি থেকে দেখা যায় প্রায় ৯০ শতাংশ অরেজিস্ট্রিকৃত (অর্থাৎ অপ্রথাগত) সংস্থা পড়ছে 'কোনও উৎস নেই' শ্রেণিতে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, যত ছোট হোক না কেন অধিকাংশ সংস্থা কিছু কারিগরি জ্ঞান ছাড়া কাজ চালায় কী করে। বাজারের চাহিদা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে ছোটখাট উদ্ভাবনার পথেও পা বাড়াতে হয় বইকি। অপ্রথাগত ক্ষেত্রে জ্ঞান কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে সমীক্ষা অপারগ। ক্ষুদ্র সংস্থায় কারিগর ও কর্মীদের 'অভ্যন্তরীণ' বা নিজস্ব গণ্ডির আওতাধীন জ্ঞান, তাদের অপ্রথাগত আন্তর্জাল (নেটওয়ার্ক) এবং সংগঠিত ক্ষেত্রের জ্ঞান অনুকরণ বা নিজেদের প্রয়োজন মাফিক তা সাজিয়ে নেবার ক্ষমতাকে হিসেবে আনার কোনও ব্যবস্থা সরকারি সমীক্ষায় নেই।

সারণি-১
অরেজিস্ট্রিকৃত ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থায় কারিগরি জ্ঞানের উৎস

উৎস	২০০১	২০০৭
বিদেশ	০.৬৭	০.৮০
দিশি সংস্থার সহযোগিতা	৫.৫৮	২.১১
দেশে গবেষণা ও বিকাশ	৪.৮৪	৩.২২
কোনওটা নয়	৮৮.৯১	৯২.৮৩

ক্ষুদ্র শিল্পের তৃতীয় শুমারি, ২০০০-০১ ও অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোগের চতুর্থ শুমারি থেকে নেওয়া।

জাতীয় নমুনা সর্বেক্ষণের কর্মসংস্থান-বেকারি সমীক্ষায় (২০১১-১২) দেখা গেছে গ্রামাঞ্চলে ৭০ ও শহরে ৪৩ শতাংশ ১৫ বছরের বেশি বয়েসি ছেলে মাধ্যমিক শিক্ষার গণ্ডি পেরোয়নি। মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা যথাক্রমে ৮৩ এবং ৫৫ শতাংশ। সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী ৮৯ শতাংশ কর্মী কোনও প্রথাগত ও প্রথা-বহির্ভূত কারিগরি বা বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ পায়নি। এই সমীক্ষা ও জাতীয় নমুনা সর্বেক্ষণের অন্যান্য অনুরূপ তথ্য থেকে অসংগঠিত ক্ষেত্রের সংস্থা সংক্রান্ত জাতীয় কমিশনের সিদ্ধান্ত '১৫ বছরের বেশি বয়েসিদের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষের কোনও দক্ষতা নেই।'

এই সিদ্ধান্তে সায় দেওয়া যায় কী। আমি মনে করি প্রচলিত সমীক্ষায় অপ্রথাগত ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন প্রক্রিয়া ও জ্ঞান সৃজনের ধরনধারণ ধরা মুশকিল। প্রচলিত সমীক্ষায় দেখা হয় ক'বছর ইস্কুলে পড়া, প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে হাজিরা, সার্টিফিকেট জোটানো ইত্যাদি। অপ্রথাগত ক্ষেত্রে এসবের বালাই নেই বললে চলে। জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া বরং জীবিকা উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত। স্কুলকলেজের শিক্ষাদীক্ষা অ্যাকাডেমিক জগৎ ও নীতি প্রণেতাদের নেকনজর পেয়ে আসছে বহুদিন যাবৎ। এছাড়া, কিছু কিছু অপ্রথাগত কর্মী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পথ পাড়ি দিয়ে এলেও ভাবে তাদের জ্ঞান সেই শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের ফল নয়। বরং তা 'নিছক' কাজ করতে করতে শেখা গেছে। মিষ্টান্ন শিল্পে কর্মীরা দক্ষতা অর্জন করে কীভাবে। জবাবে বারাণসীর এক মিষ্টির দোকানদার আমাকে বলেছিলেন, "এ নিয়ে চর্চা করার কী আছে।" শুধু সেই দোকানদার নয়, এটাই সাধারণ মনোভাব। আবার একইসঙ্গে মানুষ সচেতন যে দু'ধরনের শিক্ষার মধ্যে উঁচুনিচু ভেদাভেদ অন্যান্য। বারাণসীতে তাঁতশিল্পীদের হরবখত আক্ষেপ—শ্রমের বাজারে স্কুলকলেজের সার্টিফিকেটের কদর বেশি। বেশ ক'বছর অপ্রথাগত ক্ষেত্রে হাতেকলমে কাজ শেখার তেমন দাম নেই।

কর্মস্থলে সৃজিত জ্ঞান আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে নিরেস নয়, এই মতবাদের চল বাড়ছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস, শিক্ষার মনোবিদ্যা থেকে জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, বহু মহল এতে শামিল। বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদরা বলেন যে দর্শন, বিজ্ঞান এবং অঙ্কের উৎপত্তি কারিগর ও শ্রমজীবী মানুষের দ্বারা। এসব শাস্ত্র বা বিদ্যা অকেজো, এহেন দোষারোপ ধোপে টেকে না। বরং ব্যবহারিক সমস্যাদি মেটানোর উপায় খুঁজতে খুঁজতে এসব শাস্ত্রের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। একজন সাধারণ কারিগর তার রোজকার কাজে তখনকার বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত থাকে। জ্ঞান ব্যবস্থাপনা নিয়ে বার্নেট (২০০০:১৭) বলেন যে জ্ঞান সৃজনের এক উৎস কাজ। তার দর্শন, কাজে লাগাতে পারলে তবে সে জ্ঞান খাঁটি। কাজ হচ্ছে জ্ঞানকে যাচাই করার এক হাতিয়ার। শুধুমাত্র কাজ কেন, খেলাধুলা থেকেও জ্ঞান অর্জন করা যায়। বাপ-দাদারা তাঁত চালানোর সময় তন্তুজীবী পরিবারের বাচ্চাকাচ্চারা মেতে ওঠে মাকু নিয়ে খেলায়? অনেক সময় তাঁতশালায় নিছক সময় কাটাতে বা গল্পগাছা করতে করতে তারা কাজের শব্দ ও দৃশ্যের সঙ্গে সড়গড় হয়ে ওঠে (উড

২০০৮)। অপ্রথাগত ক্ষেত্রে জ্ঞান সৃজন ও প্রসারের বিষয়টি বুঝতে এই তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

লোকবিদ্যা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার চাইতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশি ও কাজ করতে করতে প্রশিক্ষণ (অন দ্য জব ট্রেনিং) ব্যবস্থা অনেক বেশি লোকের উপকারে আসে। কিন্তু শিক্ষানবিশি ও কাজ করতে করতে প্রশিক্ষণ এর অর্থনীতি সংক্রান্ত বইপত্তর অমিল বললেই চলে। কারিগরদের সংস্থাগুলি নিয়ে চালানো ইদানীংকার সমীক্ষায় দক্ষতা হস্তান্তরে শিক্ষানবিশি এবং বংশগত প্রথার গুরুত্ব জানা গেছে (পার্থসারথি ১৯৯৯)। এ সত্ত্বেও উন্নয়ন অর্থনীতিবিদরা অপ্রথাগত শিল্প নিয়ে চর্চায় দক্ষতা অর্জনের দিকটি খতিয়ে দেখতে গা লাগাননি। দু'একটি ব্যতিক্রম নেই বললে অবশ্য সত্যের বেসাতি করা হবে (বিশ্বাস ও রাজ ১৯৯৬)। অগোছালো বা ছড়ানো ছেটানো বলে এসব প্রথা নিয়ে চর্চায় হ্যাপা আছে বলাটা ঠিক নয়। আদতে আমাদের তত্ত্বতালাশের পদ্ধতিগুলোই কাঁচা, অনুপযুক্ত। অপ্রথাগত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে খোঁজখবরে সবচেয়ে বড় বাগড়া এই যে তা সাধারণ জীবন ও কাজকর্মের সঙ্গে পুরোপুরি সেঁটে আছে। শিক্ষা অর্জন কোথায় এবং কখন হচ্ছে তা সবসময় ঠাহর করে ওঠা মুশকিল। প্রশিক্ষণ বা শিক্ষার পরিমাণ মাপাও যথেষ্ট আয়াসসাধ্য। এ ব্যাপারে প্রামাণ্য নথিপত্র, তথ্য অর্থাৎ ডকুমেন্টেশনের একান্ত অভাব। প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা বাবদ কোনও ফি নেই। অথচ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার্থী যে সময়টা দেয় তার একটা দাম তো আছে। প্রশিক্ষণ দেয়ানেয়ার ব্যাপারটি পরিবার, জাত, লিঙ্গ ও সম্প্রদায়গত সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত। এটা অ-অর্থনৈতিক বলে ধরা হয়। এসবের জন্য দরকারি বিভিন্ন মানবজাতি বিবরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বা এমন গ্রাফিক দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থনীতিবিদরা তাতে গররাজি। তাই এসব প্রথা নিয়ে আমাদের যেটুকু জ্ঞানগম্যি তার অধিকাংশটা অর্থনৈতিক নৃতত্ত্ববিদদের কাছ থেকে পাওয়া (বারবারা ২০০৪ এবং বেসোল ২০১২)।

অপ্রথাগত ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন, উদ্ভাবনা, সংস্থাগুলির মধ্যে জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া ইত্যাদি বিষয় বুঝতে গেলে স্পষ্ট হয়ে যায় অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য এই ক্ষেত্র এক ছাঁচে ঢালা ভাবাটা ভুল। সাক্ষাৎকার নিয়ে দেখা গেছে অপ্রথাগত কর্মীদের প্রশিক্ষণে সময় লাগে স্কুল-কলেজের ডিগ্রি ও সার্টিফিকেটের মতো। অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি। পরিবারের মধ্যে বা পরিবার বহির্ভূত ক্ষেত্রে হামেশা শিক্ষানবিশি চলে কিছু মাস থেকে কয়েক বছর ইস্তক। স্কুল-কলেজের তুলনায় এখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক দিকটা তেমন কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তবে জাতপাত বা ছেলেমেয়ের ভেদাভেদটা অনেক সময় বড় উৎকট। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার বেশ উন্নতি এবং তার একটা ভালো কাঠামো গড়ে তোলা যেতে পারে। ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা ও শেখার প্রতি আকাঙ্ক্ষার গুরুত্ব শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকের বুঝতে পারা দরকার। পাছে অন্যরা শিখে ফেলে তাই নিয়োগকর্তা বা সংস্থার মালিক অনেক সময় দক্ষ কর্মীদের আগলে রাখে। নতুন জিনিস শেখা যায় এমন কাজ খোঁজে শ্রমিকরা। শুধু উৎপাদনমুখী দক্ষতা অর্জনে তারা ক্ষান্ত নয়। চায় যোগাযোগের মতো ক্ষেত্রেও দক্ষতায় দড় হতে। ইংরাজি ভাষায় রপ্ত হবার রকমসকম বুঝতে মুম্বইয়ে রাস্তার হকার, ট্যাক্সি চালক ও ভ্রমণ গাইডদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন বিড়লা ও বেসোল (২০১৩)। সিনিয়রদের কাছ থেকে শেখা তো আছেই। ইংরাজিতে সড়গড় হতে বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড হোর্ডিং গ্রাহকদের সঙ্গে কথাবার্তা, নতুন মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য প্রযুক্তি, সবকিছু তারা কাজে লাগায়। মুম্বইয়ে প্রসিদ্ধ লিংকিং রোডের এক দোকানির জবানিতে 'লিংকিং রোড স্কুল বন যাতা হ্যায়'।

এখানে বিশদ আলোচনা সম্ভব না হলেও, আমি অপ্রথাগত ক্ষেত্রে সংস্থা স্তরে উদ্ভাবনার দিকটি অনুসন্ধানের গুরুত্ব তুলে ধরতে চাই। রাস্তার ধারে টুকিটাকি খাবারদাবার এবং মিষ্টি বিক্রেতার মতো ছোটখাট ব্যবসায়ীও তার পসরা নিয়ে বড়াই করে। তার খাবারের নামডাকে গর্বিত। খাবারের তালিকায় নতুন আইটেমের দেখা মেলে প্রায়ই। কারিগরদের শিল্প সংস্থার মতো এখানেও উদ্ভাবনা চলতেই থাকে। মেধাস্বত্ব অধিকারের বালাই নেই বলে ব্যবসায়িক গোপনীয়তা আগলে রাখতে তারা সদাসতর্ক। কারিগরদের শিল্প কিছু ক্ষেত্রে আধুনিক রূপ নেয়। যেমন তাঁতশিল্পে বসে পাওয়ারলুম। কারিগরি পরিবর্তনে চিরাচরিত সংস্থার সামর্থ্য এ থেকে ধরা যায় (হেইনস ২০১২)। 'ভারতে উদ্ভাবনা' সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে জাতীয় জ্ঞান কমিশন এই ইস্যুতে গুটিকয়েক ক্ষুদ্র সংস্থার ইন্টারভিউ নিয়েছে। তবে এ ব্যাপারে আরও অনেক কাজ করা দরকার।

সবশেষে

আগে এতসব যুক্তিতর্কের জাল বোনার মানে এই নয় স্কুলকলেজের শিক্ষা খামোখা। ঠারেঠোরে ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি যে অপ্রথাগত ক্ষেত্রে বর্তমান জ্ঞানের প্রথা পর্যাপ্ত। অপ্রথাগত ক্ষেত্রের সংস্থা সংক্রান্ত জাতীয় কমিশনের তোলা প্রশ্ন সনাতন পদ্ধতি মারফত অপ্রথাগত সংস্থায় কাজ করতে করতে দক্ষতা অর্জনের বর্তমান ব্যবস্থা কী যথেষ্ট (সেনগুপ্ত ও অন্যান্য ২০০৯)। এর সাফ উত্তর 'না' দক্ষতা উন্নয়ন, সনাতন বৃত্তিতে আধুনিক কৃৎকৌশল প্রয়োগ ও আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত নীতি মস্ত ফারাক গড়ে দিতে পারে। তবে কিনা জাতীয় কমিশনও বলেছে সরকারের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অপ্রথাগত কর্মীকে কাজকর্ম জোটানোয় সাহায্য করতে বিফল মনোরথ। অপ্রথাগত ক্ষেত্রের কর্মী ও কারবারিদের থেকে এসব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব বিলক্ষণ। এক্ষেত্রে উপায় কী। বিকল্প হিসেবে বর্তমান অপ্রথাগত প্রথাগুলি গড়েপিটে নিতে হবে। আর এ কাজে অংশ নিতে হবে খোদ অপ্রথাগত ক্ষেত্রকে। এ বিষয়ে নমুনা হিসেবে নাইজিরিয়ার জাতীয় মুক্ত শিক্ষানবিশি প্রকল্প (ন্যাশনাল ওপেন অ্যাপ্রেনটিসশিপ স্কিম) এবং অন্যান্য প্রকল্প নিয়ে জাতীয় কমিশন আলোচনা করেছে। এগুলি আমাদের দেশেও কাজে লাগতে পারে। এজন্য জ্ঞান সৃজন, হস্তান্তর, উদ্ভাবনা ইত্যাদি খতিয়ে দেখতে আরও গবেষণা দরকার। তবে নীতি শেষ কথা নয়। স্কুলকলেজের শিক্ষার সঙ্গে এক আসনে ঠাঁই দিতে হবে লোকবিদ্যাকে। লোকবিদ্যার জন্য সম মর্যাদার দাবিতে চাই রাজনৈতিক সক্রিয়তা।❑

[লেখক বস্টনের ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপক।
email:abasole@gmail.com]

ভারতে অপ্রথাগত ক্ষেত্র
বৈশিষ্ট্য ও কর্মসংস্থান

দেশের মোট কর্মীবাহিনী বা ওয়ার্ক ফোর্স-এর সিংহভাগই অপ্রথাগত ক্ষেত্রভুক্ত। অর্থাৎ নিযুক্তি সংক্রান্ত কোনও বিধি এই সমস্ত কর্মীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোনও রকম সামাজিক সুরক্ষার আওতাতেও এরা পড়ে না। অর্থাৎ বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে কোনও একটা কাজ করতে পারলেই, এদের পক্ষে যথেষ্ট। দারিদ্র যত বাড়বে, ততই এরাও সংখ্যায় বাড়বে, এমনটাই লক্ষ করা যায়। আমরা মনে করি—কিছু তো একটা করছে, একেবারে বসে তো নেই! কিন্তু না, সব কর্মসংস্থানই কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে ইতিবাচক নয়। লিখছেন **ভব রায়।**

অর্থনীতিতে 'অপ্রথাগত ক্ষেত্র' বা 'Informal Sector' কথাটি খুব বেশি দিনের নয়। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতে, অর্থনীতিবিদ কীথ হার্ট সর্বপ্রথম এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেন, ১৯৭১ সালে আফ্রিকার একটি সেমিনারে একটি বক্তৃতায়। ঠিক তার পরের বছরে (১৯৭২) আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের অনুমোদনে এই শব্দটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। এখন দেখা যাক, 'অপ্রথাগত ক্ষেত্র' বা 'অপ্রথাগত শ্রমিক' বলতে ঠিক কী বোঝায়। তার মোটামুটি 'সংজ্ঞা'ই বা কী হতে পারে। তবে, এই শব্দটির প্রায়-সমার্থক একটি শব্দের সঙ্গে আমরা পরিচিতি, সেটি হল 'অসংগঠিত ক্ষেত্র'। আপাতভাবে প্রায়-সমার্থক মনে হলেও শব্দ দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। অন্তত একটি পার্থক্যের কথা এখানে তুলে ধরাই যায়। সেটি হল—রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সমস্ত সংস্থা এবং ১০ জনের বেশি কর্মী বিশিষ্ট যে কোনও অ-কৃষিভিত্তিক বে-সরকারি সংস্থাই সংগঠিত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। তার বাইরে যে কোনও সংস্থাই অ-সংগঠিত ক্ষেত্র। তবে উভয়ক্ষেত্রেরই অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে প্রথাগত ও অপ্রথাগত দু'ধরনের সংস্থাই। ১৯৭২ সালের পরবর্তী সময় থেকে অদ্যাবধি আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁদের বিধি-নির্দেশিকা অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অপ্রথাগত ক্ষেত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন জাতীয় তথ্য-পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সমীক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে, ভারতের পটভূমিতে আজও কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রটির কোনও সর্বসম্মত সংজ্ঞা গড়ে ওঠেনি। তাই এই বিশেষ সংজ্ঞাকে ঘিরে অর্থনীতিবিদ-বিশেষজ্ঞমহলে আজও রয়েছে 'নানা মুনির নানা মত'। তবে এই সব সত্ত্বেও বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা গড়ে তুলতে অসুবিধা হয় না।

ভারতে অপ্রথাগত ক্ষেত্র : সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

আমাদের দেশে প্রচলিত অনেক সংজ্ঞার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত সংজ্ঞাটি দিয়েছে ভারতের অসংগঠিত ক্ষেত্রের সংস্থাসমূহের জাতীয় কমিশন (NCEUS)। 'অপ্রথাগত ক্ষেত্র' এবং 'অপ্রথাগত শ্রমিক'—দুটি বিষয় নিয়ে রয়েছে দুটি স্বতন্ত্র সংজ্ঞা। প্রথমটির সংজ্ঞা হিসেবে হলা হয়েছে, "The informal sector consists of all unincorporated private enterprises owned by individuals or households engaged in the sale and production of goods and services operated on a proprietary or partnership basis and with less than ten total workers." অর্থাৎ, অপ্রথাগত ক্ষেত্রের মধ্যে থাকবে ব্যক্তি বা গৃহস্থ মালিকানাধীন সব ধরনের বিক্ষিপ্ত বে-সরকারি সংস্থা, যারা দশ-এর কম কর্মীসহ স্বত্ব অথবা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পণ্য ও পরিষেবা বিক্রয় ও উৎপাদনের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টির সংজ্ঞা এই রকম : "Informal workers consist of those working in the informal sectors or households, excluding regular workers with social security benefits provided by the employers and the workers in the formal sector without any employment and social security benefits provided by the employers." এখানে, অপ্রথাগত শ্রমিক বা কর্মচারীর একটি পরিচিতি বা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, অপ্রথাগত ক্ষেত্রে বা নিজ গৃহে কাজ করে যে শ্রমিক বা কর্মচারী, তাকেই বলা হবে 'অপ্রথাগত শ্রমিক'। এরা সরকার বা সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা-প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত। এই ক্ষেত্রের কর্মীরা কখনও খুব ছোটখাট সংস্থায় 'বেতনভুক' হিসেবে নিযুক্ত থাকতে পারে, কখনও বা হতে পারে 'স্ব-নিযুক্ত' পেশাজীবী। এই শ্রেণির এক বড় অংশের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল—শ্রমের সম্পর্ক এখানে মূলত অনিয়মিত ধরনের অর্থাৎ 'মালিক-শ্রমিক' চুক্তির অস্তিত্বই এখানে থাকে না। বরং এই সব ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে

কাজ করে নিকট-দূর আত্মীয়তা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা অন্য কোনও সামাজিক সম্পর্ক।

ভারতের পটভূমিতে এই অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। ফুটপাথের হকারি, জুতো-পালিশ থেকে শুরু করে দর্জিগিরি, জঞ্জাল-পরিষ্কার, এমনকী ভিক্ষাবৃত্তিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের চৌহদ্দির মধ্যে; অন্যদিকে আবার এই একই ক্ষেত্রের মধ্যে থাকতে পারে সাব-কন্ট্রাকটর, ফ্রি-লান্সার, গৃহশিক্ষক এবং এ জাতীয় আরও অসংখ্য পেশা ও জীবিকা। মোট কথা, ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুসারে, যে কোনও ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থার কার্যকারিতার জন্য জমি-শ্রম-মূলধন ইত্যাদি উপকরণের সমন্বয় অত্যাবশ্যক। অপ্রথাগত ক্ষেত্রে এ ধরনের শর্তের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এখানে মূলধন কখনও থাকে কখনও থাকে না। থাকলেও তা নামমাত্র, জমি বা শ্রম তথা দক্ষতা সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এ কারণে প্রথাগত ক্ষেত্রের (সরকারি ও বে-সরকারি) যেমন বিভিন্ন খুঁটিনাটি পরিসংখ্যান ও তথ্য পাওয়া যায়, অপ্রথাগত ক্ষেত্রে তা যায় না। বাস্তব কারণেই হয়তো বা তা পাওয়া সম্ভবও নয়; তাই, এসব ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহ করতে হয় কখনও অনুমানের ভিত্তিতে, কখনও বা বিক্ষিপ্ত নমুনা-সমীক্ষার (random sampling) মাধ্যমে।

ভারতে অপ্রথাগত ক্ষেত্র : কর্মসংস্থান-প্রবণতা

বিগত কয়েকটি দশক যাবৎ অপ্রথাগত ক্ষেত্রের মোট আয়তন, তার কর্মসংস্থান বৈশিষ্ট্য ঠিক কীরকম—সে প্রসঙ্গে এবার কিছুটা নজর দেওয়া যেতে পারে। এই সূত্রেই আমরা খুঁজে পাব, প্রথাগত তথা সংগঠিত ক্ষেত্রের সাপেক্ষে আলোচ্য ক্ষেত্রটির তুলনামূলক অবস্থান এবং সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতিতে তার প্রভাব ও গুরুত্বের মাত্রা। এই অনুসন্ধানের সহায়ক একটি পরিসংখ্যান-সারণি এখানে দেওয়া হল। সারণি-১-এর বিভিন্ন উপ-শিরোনামভুক্ত পরিসংখ্যানগুলি সামগ্রিকভাবে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের কর্মসংস্থান প্রবণতার

সারণি-১
সংগঠিত ও অ-সংগঠিত ক্ষেত্রে প্রথাগত এবং অপ্রথাগত কর্মসংস্থান (মিলিয়নে)

	১৯৯৯-২০০০			২০০৪-০৫			২০০৯-১০		
	অপ্রথাগত	প্রথাগত	মোট	অপ্রথাগত	প্রথাগত	মোট	অপ্রথাগত	প্রথাগত	মোট
অ-সংগঠিত ক্ষেত্র	৩৪১.৩	১.৪	৩৪২.৭	৩৯৩.৫	১.৪	৩৯৪.৯	৩৮৫.০৮	২.২৬	৩৮৭.৩৪
সংগঠিত ক্ষেত্র	২০.৫	৩৩.৭	৫৪.২	২৯.১	৩৩.৪	৬২.৫	৪২.১৪	৩০.৭৪	৭২.৮৮
মোট	৩৬১.৮	৩৫.১	৩৯৬.৯	৪২২.৬	৩৪.৮	৪৫৭.৪	৪২৭.২২	৩৩.০০	৪৬০.২২

সূত্র : ভারত সরকার, যোজনা কমিশন, দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১২-১৭ (দিল্লি, ২০১২)

অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

(১) সমস্ত ক্ষেত্র মিলিয়ে, ভারতের মোট কর্মীবাহিনীর ৯০ শতাংশেরও বেশি অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কাজ করে। ২০০৪-০৫ সালে এই অনুপাত ছিল ৯২.৪ শতাংশ, ২০০৯-১০ সালে এই হার ছুঁয়েছিল ৯২.৮ শতাংশে।

(২) দেশের মাত্র ৭ শতাংশ কর্মী প্রথাগত ক্ষেত্রে কাজ করে।

(৩) অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষরাই দেশের সামগ্রিক কর্মীবাহিনীর সিংহভাগ, যার অনুপাত ৮৬ শতাংশের কাছাকাছি।

(৪) ২০০০ থেকে ২০০৫—স্বল্পকালীন এই ৫ বছরে সংগঠিত ক্ষেত্রের আনুপাতিক কর্মসংস্থান সামান্য মাত্রায় বেড়েছিল—১৩.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছিল ১৫.৮ শতাংশ, কিন্তু পরবর্তী পর্বে, অর্থাৎ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই ক্ষেত্রটিতেও দেখা গিয়েছে ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা।

(৫) বিগত ১০ বছরে (২০০০ থেকে ২০১০) একদিকে যেমন দেশের অপ্রথাগত ক্ষেত্রভুক্ত কর্মী সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে বিপরীত-প্রবণতায় প্রথাগত ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষদের সংখ্যা কমেই চলেছে। ২০০০ সালে অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কর্মী সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৬২ মিলিয়ন, ২০১০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪২৭ মিলিয়ন। অন্যদিকে, এই একই সময়-পর্বে প্রথাগত ক্ষেত্রের কর্মী সংখ্যা ৩৫ মিলিয়ন থেকে কমে হয়েছে ৩৩ মিলিয়ন।

আলোচ্য সারণি বহির্ভূত আরও দু-একটি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ্য করা যেতে পারে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দপ্তরের (এনএসএসও) পর্যবেক্ষণ অনুসারে, দেশের মোট কর্মীবাহিনীর ৮০ শতাংশের উপর অপ্রথাগত শ্রমিক-কর্মচারীদেরই অনুপাত, তার মধ্যে আবার, 'নগরীয় ভারত'-এর তুলনায় 'গ্রামীণ ভারত'-এ এই হার তুলনামূলকভাবে বেশি। এই একই সূত্র থেকে আরও জানা গেছে—দেশের সমগ্র কর্মীবাহিনীর সবচেয়ে বড় অংশই হল স্ব-নিযুক্ত এবং এদের প্রায় পুরোটাই অপ্রথাগত ঘরানার অন্তর্ভুক্ত, পাশাপাশি নিয়মিত বা 'বেতনভোগী' পর্যায়ে

সারণি-২
২০০০-২০০৫ পর্বে ভারতের প্রথাগত ও অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কর্মরত পৃথকভাবে পুরুষ ও নারীর মোট সংখ্যা (মিলিয়নে)

ক্ষেত্র	লিঙ্গ	অপ্রথাগত কর্মী		প্রথাগত কর্মী		মোট	
		১৯৯৯-০০	২০০৪-০৫	১৯৯৯-০০	২০০৪-০৫	১৯৯৯-০০	২০০৪-০৫
গ্রামীণ	পুরুষ	১৮৬.১৭	২০৯.০১	১০.৫৭	১০.০৩	১৯৬.৭৪	২১৯.০৪
	নারী	১০১.৭১	১২১.৬০	২.৩১	২.৪৩	১০৪.০২	১২৪.০৩
	মোট	**২৮৭.৮৮**	**৩৩০.৬১**	**১২.৮৮**	**১২.৪৬**	**৩০০.৭৬**	**৩৪৩.০৭**
শহরভিত্তিক	পুরুষ	৫৮.৩৩	৭১.৬০	১৮.৭২	১৮.৮০	৭৭.০৫	৯০.৪০
	নারী	১৫.৫৩	২০.৪০	৩.৪৩	৩.৬০	১৮.৯৬	২৪.০০
	মোট	**৭৩.৮৬**	**৯২.০০**	**২২.১৫**	**২২.৪০**	**৯৬.০১**	**১১৪.৪০**
সমগ্র	পুরুষ	২৪৪.৫০	২৮০.৬১	২৯.২৮	২৮.৮৩	২৭৩.৭৮	৩০৯.৪৪
	নারী	১১৭.২৪	১৪২.০০	৫.৭৪	৬.০৩	১২২.৯৮	১৪৮.০৩
	মোট	**৩৬১.৭৪**	**৪২২.৬১**	**৩৫.০২**	**৩৪.৮৬**	**৩৯৬.৭৬**	**৪৫৭.৪৭**

সূত্র : এনএসএসও : ৫৫তম ও ৬১তম রাউন্ড

সারণি-২(ক)
উপরোক্ত দুই ক্ষেত্রে লিঙ্গানুপাতিক কর্মী-বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার (শতাংশে)

ক্ষেত্র	লিঙ্গ	অপ্রথাগত ক্ষেত্র	প্রথাগত ক্ষেত্র
গ্রামীণ	পুরুষ	২.৩৪	−১.০৫
	নারী	৩.৬৪	০.৯৯
	মোট	**২.৮১**	**−০.৬৭**
শহর ভিত্তিক	পুরুষ	৪.১৮	০.০৯
	নারী	৫.৬০	০.৯৭
	মোট	**৪.৪৯**	**০.২৩**
সমগ্র	পুরুষ	২.৭৯	−০.৩১
	নারী	৩.৯১	০.৯৮
	মোট	**৩.১৬**	**০.১০**

সূত্র : এনএসএসও

কর্মরত মানুষদের ৪০ শতাংশেরই বেশি অপ্রথাগত কর্মচুক্তির আওতায় রয়েছে।

অর্থনীতিবিদ নীলকণ্ঠ মিশ্র ও রবিশঙ্কর ২০১৩ সালে আলোচ্য বিষয়ের উপর একটি সমীক্ষা করেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণে, ভারতের 'অপ্রথাগত অর্থনীতি'র আওতায় রয়েছে মোট কর্মসংস্থানের ৯০ শতাংশ এবং সমগ্র জিডিপির ৫০ শতাংশ। তাঁরা এই অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, অ-কৃষিক্ষেত্রের প্রায় ৮৪ শতাংশই অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। সাব-সাহারান আফ্রিকা ছাড়া সারা বিশ্বে, অপ্রথাগত ক্ষেত্রে ভারতের মতো দুর্দশাগ্রস্ত আর কোনও দেশই নয়।

সারণি দুটিতে প্রথমেই যা নজর কাড়বে, তা হল— আলোচ্য সময়ে (২০০০ থেকে ২০০৫) অপ্রথাগত ক্ষেত্রে পুরুষ-কর্মী ও নারী-কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে এবং তা এখনও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। অথচ প্রথাগত ক্ষেত্রে, পুরুষ-নারী তথা মোট অবস্থা— এই পাঁচ বছরে প্রায় অপরিবর্তিত থেকেছে, হয়তো কিছুটা কমেছে। দ্বিতীয়ত, অপ্রথাগত ক্ষেত্রে, বার্ষিক শতাংশ বৃদ্ধির হারে যেটা উল্লেখযোগ্য, তা হল, গ্রাম ও শহর উভয় পটভূমিতেই, পুরুষদের তুলনায় নারী কর্মীদের বৃদ্ধিহার অনেকটাই বেশি। কিন্তু, প্রথাগত ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এর ঠিক বিপরীত প্রবণতা—বৃদ্ধির হার কোনও ক্ষেত্রে নামমাত্র, তার চেয়ে যা বেশি উদ্বেগজনক— এই হার কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঋণাত্মক বা নেতিবাচক। তৃতীয়ত, দেশের সমকালীন জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষ শ্রমিক বা কর্মীবাহিনীর সদস্য (workforce)। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাপেক্ষে এ-ও এক অতি-বিরল ঘটনা।

ভারতের অপ্রথাগত ক্ষেত্রের আলোচনায় আরও একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্ক কৌতূহল জাগা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের দেশের এই যে বিশাল অপ্রথাগত কর্মীবাহিনী, ঠিক কোথায়, কীরকম সংখ্যায় কাজ করে? সাধারণভাবে এটা অবশ্য প্রায় সকলেরই জানা, অপ্রথাগত শ্রমিক বা কর্মী মানে এক কথায় 'জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ', আর কাঠবিড়ালীর মতো তাদের শ্রমের কম-বেশি ভূমিকা রয়েছে 'আলপিন টু এলিফ্যান্ট' উৎপাদনের কর্মোদ্যোগে। কিন্তু এরকম ভাসাভাসা ধারণার পরিবর্তে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিক তথ্য-পরিসংখ্যান, যা প্রতিফলিত হয়েছে সারণি-৩-এ।

বিভিন্ন পেশা ও ক্ষেত্রের অপ্রথাগত কর্মীদের বিশদ হিসাব সারণি-৩ থেকে জানা যায় সমগ্র কর্মীবাহিনীর সর্বাধিক আনুপাতিক অংশ (৯৮.৮৯ শতাংশ) হল কৃষিতে কর্মরত অপ্রথাগত পুরুষ-নারী। আবার, দেশের মোট অপ্রথাগত কর্মীদের ৬১ শতাংশই কৃষির আওতায়, আর বাকি ১৪টি ক্ষেত্রের এদের অনুপাত ৩৯ শতাংশ। কৃষিতে যুক্ত এই পর্বতপ্রমাণ অপ্রথাগত বাহিনীর তুলনায় অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে তা নামমাত্রই। আবার, গৃহকর্ম (household) ও আনুষঙ্গিক কাজকর্মেও অপ্রথাগত কর্মী অনুপাতটি যথেষ্ট উদ্বেগজনক এবং সেই অনুপাত হল ৯৯.২৩ শতাংশ (২০০৪-০৫)।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা, এই প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা কৃষির তুলনায় নিতান্ত কম হলেও, সেখানেও অপ্রথাগত আনুষঙ্গিকতারই দাপট সর্বাত্মক। যেমন, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মরত মোট মানুষের মধ্যে অপ্রথাগত কর্মী বৈশিষ্ট্যের অনুপাত ৯০ শতাংশেরও বেশি, সেরকম কয়েকটি

সারণি-৩

ক্ষেত্র বা শিল্প উপক্ষেত্র	অপ্রথাগত কর্মী/শ্রমিকের মোটসংখ্যা (মিলিয়নে)		মোট কর্মীবাহিনীর সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট অপ্রথাগত কর্মীর অনুপাত (শতাংশে)		বৃদ্ধির হার (শতাংশে)
	১৯৯৯-০০	২০০৪-০৫	১৯৯৯-০০	২০০৪-০৫	
কৃষি	২৩৪.৭৯	২৫৬.০৭	৯৮.৭৯	৯৮.৮৯	১.৭৫
খনি	১.৫৬	১.৭৮	৭১.৭৫	৬৭.৩৯	২.৬৮
উৎপাদন-শিল্প	৩৬.৮৫	৪৯.৩০	৮৩.৬৫	৮৮.৩৮	৫.৯৯
বিদ্যুৎ	০.২১	০.২৪	১৮.৭৫	১৮.৭২	২.৭৪
পূর্ত/নির্মাণ শিল্প	১৬.৯০	২৫.৩২	৯৬.৪০	৯৭.৩৩	৮.৪২
ব্যবসা-বাণিজ্য	৩৫.৪১	৪২.৫৪	৯৬.৬৯	৯৮.১১	৩.৭৪
হোটেল-ব্যবসা	৪.৩৫	৫.৮০	৯৪.৩০	৯৫.০২	৫.৮৯
পরিবহণ	১১.৪৪	১৫.২৮	৭৮.৩০	৮২.৭০	৫.৯৫
আর্থিক কাজকর্ম	০.৬৩	১.২১	২৭.৮০	৩৯.২৪	১৪.১৫
গৃহ-নির্মাণ শিল্প	২.২৪	৩.৭৩	৮৩.৭৩	৮০.০৯	১০.৭৫
প্রশাসন	১.৬০	১.১৯	১৫.২৭	১৩.৪৬	−৫.৭৫
শিক্ষা	৩.২৪	৫.২৯	৩৮.২২	৪৬.২৮	১০.৩২
স্বাস্থ্য	১.৫০	২.১৮	৫২.৫১	৫৮.৮০	৭.৭৯
সমষ্টি প্রকল্প	৯.২৮	৭.৯৭	৯৫.১৫	৯৪.৯৯	−৩.০১
গৃহস্থ-কর্ম ও অন্যান্য	১.৭৪	৪.৭২	৯৩.৮৬	৯২.২৩	২২.০৮
মোট	**৩৬১.৭৪**	**৪২২.৬১**	**৯১.১৭**	**৯২.৩৮**	**৩.১৬**

সূত্র : এনএসএসও

ক্ষেত্র হল—ব্যবসা-বাণিজ্য (৯৮.১১ শতাংশ), পূর্ত-নির্মাণ শিল্প (৯৭.৩৩ শতাংশ), হোটেল-ব্যবসা (৯৫.০২ শতাংশ) ইত্যাদি।

ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে অপ্রথাগত কর্মীবাহিনীর, চূড়ান্ত প্রভাব ঠিক কীরকম? সম্ভবত, এক কথায় এর উত্তর হয় না। কারণ বিষয়টি জটিল। আপাতভাবে দেখলে মনে হবে, ক্ষেত্র যা-ই হোক না কেন, কর্মসংস্থান তো বাড়ছে—কাজেই অর্থনীতির নিরিখে এটা তো একটা ইতিবাচক প্রবণতা। এর উত্তরে বলতে হয়, যে কোনও ধরনের কর্মসংস্থানই ইতিবাচক লক্ষণ নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, 'কর্ম-নিযুক্তি'র নামে ভারতীয় কৃষিতে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের প্রয়োজন ব্যতিরেকেই গ্রামীণ মানুষদের যে মাত্রাতিরিক্ত চাপ (আজও যা ৫৫-৬০ শতাংশের কাছাকাছি), তাকে 'স্বাভাবিক কর্মসংস্থান' বলা যায় না, তার একটা বড় অংশই যে 'ছদ্ম-বেকারত্ব' (disguised unemployment), একথা প্রায় সকলেরই জানা। ভারতের জাতীয় অর্থনীতির পটভূমিতে অপ্রথাগত শ্রমিক- কর্মীবাহিনীর কর্মসংস্থানের বাড়বাড়ন্ত, সেটাও বহুলাংশেই পূর্বোক্ত কৃষির ছদ্ম-বেকারত্বের সঙ্গেই তুলনীয়।

আসলে, এই প্রবণতা হল দেশের দরিদ্র মানুষের 'অস্তিত্ব-রক্ষার সংগ্রাম' বা 'ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরে' বাঁচার আপ্রাণ প্রয়াস। দারিদ্রের সঙ্গে (incidence of poverty) অপ্রথাগত কর্মীবৃদ্ধির একটি সরাসরি সম্পর্ক (co-relation) বিভিন্ন রাজ্যভিত্তিক সমীক্ষায় লক্ষ করা গেছে। দেখা গেছে, যে রাজ্যগুলি অর্থনৈতিকভাবে যত বেশি পশ্চাৎপদ, সেই সব রাজ্যগুলিতেই অপ্রথাগত কর্মী শ্রমিকদের বেশি বেশি রমরমা। একারণেই, ভারতের দরিদ্র রাজ্যগুলিতে অপ্রথাগত কর্মীদের আনুপাতিক চাপ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জাতীয় গড়ের (৯২.৩৮ শতাংশ) চেয়ে বেশি; যেমন বিহার (৯৬.৪৬ শতাংশ), উত্তরপ্রদেশ (৯৫.৫৩ শতাংশ), মধ্যপ্রদেশ (৯৪.৯৩ শতাংশ), ওড়িশা (৯৪.৫৩ শতাংশ), অন্যদিকে তুলনামূলক সচ্ছল রাজ্যগুলিতে এই অনুপাত জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক কম—দৃষ্টান্ত হিসেবে কেরালা (৮১.২৭ শতাংশ), মহারাষ্ট্র (৮৯.৬১ শতাংশ), হরিয়ানা (৯০.২০ শতাংশ), তামিলনাড়ু (৮৯.৮৯ শতাংশ), এছাড়াও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসহ কয়েকটি রাজ্যে এই হার প্রশংসনীয়ভাবে আরও কম, মাত্র ৭৫.১৮ শতাংশ।

আর একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। তা হল—অপ্রথাগত শ্রমিক বা কর্মীরা যে শুধুমাত্র অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কাজ করে, এমনটা নয়। ঠিক তেমনিই প্রথাগত বা সংগঠিত ক্ষেত্র হলেই সেখানকার সমগ্র কর্মীবাহিনীই যে 'প্রথাগত' স্বীকৃতিবাহী হবে, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। সে কারণে, আজও ভারতের সামগ্রিক প্রথাগত ক্ষেত্রের প্রায় অর্ধেক কর্মীবাহিনীই (৪৫ শতাংশের কাছাকাছি) অপ্রথাগত শ্রমিক-কর্মচারী। এই প্রবণতা, জাতীয় অর্থনীতির প্রেক্ষিতে যে কতখানি নেতিবাচক, সেই বিষয়টি ধরা রয়েছে NCEUS-এর প্রাক্তন উপদেষ্টা ও অর্থনীতি-সমীক্ষক অজয় কুমার নাইকের এই প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণে, "....The concept of informal worker is based on the personal characteristic of the worker rather than enterprise. informal workers consist of 92.38 percent of total workers in India.... Around half of the formal sector workers are informal workers. This indicates that casualisation or the amount of contractual labour increases in the formal sector which is a matter of great concern for policy makers." অর্থাৎ, 'শ্রমের অনিয়ম' বা 'চুক্তি-শ্রম'এর পরিমাণ ও পরিধি ক্রমে বেড়ে চলেছে। ফলে ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশের মোট কর্মীবাহিনীর মাত্র ৭ শতাংশ হল প্রথাগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। তাই, সংখ্যার হিসেবেও এই ক্রমহ্রাসমানতা বর্তমান সময়েও অব্যাহত। ভারতের সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী সংখ্যা ১৯৯৯-২০০০ সালে ছিল ৩৩.৭ মিলিয়ন, ২০০৪-০৫ এবং ২০০৯-১০ সালে ক্রমশ কমতে কমতে সেই সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩.৭ মিলিয়ন এবং ৩০.৭৪ মিলিয়ন হয়।

যে কোনও দেশের অর্থনীতিতেই কর্মসংস্থান এক ইতিবাচক প্রবণতা, কিন্তু যে কোনও ধরনের কর্মসংস্থানই যে 'ইতিবাচক' নয়, ভারতের ক্রমোস্ফীত অপ্রথাগত কর্মসংস্থান-প্রবণতা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর ফলে, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কর্মসংস্থান-উৎকর্ষ তথা জীবন-উৎকর্ষেই (quality of life) যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, শুধু তাই নয়—জাতীয় অর্থনীতির ক্রমোন্নতির পথেও তা অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। তাই, দেশের স্বার্থে অপ্রথাগত শ্রমিক-কর্মীদের, যতদূর সম্ভব প্রথাগত তথা সংগঠিত ক্ষেত্রের মূল স্রোতের আওতায় নিয়ে আসা দরকার। জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ধরনের চটজলদি সমাধানের রাস্তা খুঁজে পাওয়া কঠিন। কৃষি, শিল্প বা অন্যান্য ক্ষেত্র—'শ্রম-নিবিড়তা'র দিন প্রায় শেষ। কিন্তু, এ-ও সত্য, এই সময়ে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন ক্ষেত্র ও উপক্ষেত্র বিকশিত ও প্রসারিত হয়ে চলেছে। অপ্রথাগত কর্মীদের 'অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি'কে এই সব ক্ষেত্রে যাতে সংগঠিত ও সদর্থকভাবে যুক্ত করা যায় তার জন্য উদ্‌ভাবনামূলক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের ভাবনা-চিন্তা করার আশুপ্রয়োজন রয়েছে দেশের সর্বস্তরেই।❑

ভারতের শহরে অপ্রথাগত ক্ষেত্র

দেশের জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে অবিরাম। আর প্রতিনিয়ত রুজি-রুটির সন্ধানে একের পর এক জনজোয়ার আছড়ে পড়ছে শহরের বুকে। ফলে জীবিকা অর্জনের লড়াইয়ের প্রতিযোগীদের সংখ্যার পাশাপাশি দারিদ্র ও বেকারত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে শহরাঞ্চলে। এই পরিস্থিতিতে "চাহিদা" মেটাতে কর্মসংস্থান "জোগানের" একমাত্র সূত্র হিসাবে অপ্রথাগত ক্ষেত্র কতটা উপযুক্ত ও কার্যকরী? জানাচ্ছেন **অরূপ মিত্র।**

সূচনা

জীবিকা অর্জনের উৎস হিসাবে শহরের অপ্রথাগত ক্ষেত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে গ্রাম থেকে আসা মানুষজন এবং শহরের বস্তিতে থাকা বহু দরিদ্র পরিবারের কাছে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই নিবন্ধে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের আকার এবং উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক ও অনুসারী ক্ষেত্রগত সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলি এর কার্যসম্পাদন এবং ফলাফলের ওপর কতটা প্রভাব ফেলেছে, তারও অনুসন্ধান রয়েছে এই লেখায়।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের পরিস্থিতি নিয়ে গত দু-তিন দশকে বেশ কিছু সমীক্ষা করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাবে দাস (২০১১) ও মিত্র-র (২০১৩) বইতে। কৃষি উৎপাদনশীলতা কমে আসায় যে উদ্বৃত্ত শ্রমিকের সৃষ্টি হল তাঁরা গ্রামের অকৃষিক্ষেত্রে কাজ পেলেন না। শহরের উচ্চ উৎপাদনশীল ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রেও জায়গা না হওয়ায় শেষমেশ তাঁদের ঠাঁই হল শহরের অপ্রথাগত ক্ষেত্রে। (Mitra 1994), একইসঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার শহরের শ্রমিকসংখ্যা আরও বাড়িয়ে তুলল। এই শ্রমশক্তির একটা বৃহৎ অংশই অদক্ষ অথবা সামান্য দক্ষ। অন্যদিকে আবার উন্নয়ন প্রক্রিয়া ক্রমশই আরও বেশি করে মূলধন ও দক্ষতানির্ভর হয়ে ওঠায় বহু শ্রমিক জীবিকা অর্জনের তাগিদে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের দারিদ্র।

তুলনামূলক আকার

অপ্রথাগত ক্ষেত্রে দেশের মোট শ্রমশক্তির একটা বড় অংশ নিয়োজিত। কৃষিকাজ ছাড়াও আরও নানা ধরনের কাজ এর আওতায় পড়ে। অপ্রথাগত ক্ষেত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল কম উৎপাদনশীলতা, কাজের মাত্রার ক্ষুদ্রতা, দুর্বল প্রযুক্তি, কম মূলধন—শ্রম অনুপাত, উপাদান ও পণ্যের অরক্ষিত বাজার প্রভৃতি। একটি সংস্থা প্রথাগত না অপ্রথাগত—কোন ক্ষেত্রে থাকবে, তা নির্ভর করে তার আয়ত্তে থাকা দক্ষতা ও শিক্ষার মানের ওপর। অদক্ষ শ্রমিককে কাজের জন্য এক মালিকানাধীন কারবার ও অন্যান্য ছোট সংস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়। তাঁদের মধ্যে অনেকে একই ক্ষেত্রেই থেকে যান। তাঁদের উপার্জন আর বাড়ে না। শিক্ষার মানোন্নয়ন, বাজার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, ঋণের সুবিধা, উন্নত প্রযুক্তি, সার্বিক অর্থনৈতিক চিত্র ও নীতি পরিবর্তনের জেরে কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়। এইভাবেই কোনও সংস্থা ধীরে ধীরে অপ্রথাগত থেকে প্রথাগত ক্ষেত্রে উন্নীত হয়। এর সঙ্গে অবশ্য এ বাবদ খরচের অঙ্কটাও মাথায় রাখতে হবে। যেমন ধরুন, প্রথাগত ক্ষেত্রে যদি নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি এবং শ্রম আইন খুব কড়া হয়, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা স্বেচ্ছায় অপ্রথাগত ক্ষেত্রেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। (Maiti and Mitra 2010), আবার অপ্রথাগত ক্ষেত্রে শ্রমের বাজারে যে নমনীয়তার সুযোগ পাওয়া যায়, তার সুবিধা নিতেও কোনও সংস্থা নিজেদের ছোট আকারেই রাখতে চাইতে পারে। এই ধরনের সংস্থাগুলি কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে অনুৎপাদনশীল নয়, বরং কারিগরি দিক থেকে দক্ষ এবং প্রতিযোগিতায় সক্ষম।

গ্রাম এবং শহর— দু'জায়গাতেই মোট কর্মসংস্থানের নিরিখে অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার বেশ উঁচু। কৃষিকাজে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের প্রাধান্য যে বেশি হবে, তা জানা কথা। কিন্তু অকৃষিক্ষেত্রেও যে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক অপ্রথাগত ক্ষেত্রের আওতায় থেকে জীবিকা অর্জন করেন, তা আমাদের বিস্মিত করে। আর একটি আশ্চর্যের বিষয় হল, মোট মহিলা শ্রমশক্তির তুলনায় অপ্রথাগত ক্ষেত্রে নিযুক্ত মহিলা শ্রমিকের হার পুরুষদের হারের তুলনায় কম। এর বিপরীতটাই প্রত্যাশিত ছিল।

তবে এই হিসেব বাস্তবের প্রতিফলন নয়। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা NSS (2009-10)-এর দেওয়া সংজ্ঞায় একমালিকী ও অংশীদারি কারবারকে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বাদ দেওয়া হয়েছে গৃহস্থালিকে। তাই গৃহস্থালির কাজে নিযুক্তদের হিসেবের মধ্যে ধরা হয়নি। এই সংখ্যা কিন্তু বিপুল, এর ফলে সারণি-১ অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের যে তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবের থেকে অনেকটাই কম। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল,

অপ্রথাগত ক্ষেত্রের কর্মসংস্থানের হিসাবে প্রথাগত ক্ষেত্রের চুক্তিবদ্ধ ও অনিয়মিত শ্রমিকদের ধরা হয়েছে। এই সীমাবদ্ধতাগুলি সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রথামুক্ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার অস্বাভাবিক বেশি, বিশেষত অকৃষিক্ষেত্রে।

সারণি-১
অসংগঠিত ক্ষেত্রের তুলনামূলক আকার : সর্বভারতীয় (২০০৯-১০)

ক্ষেত্র	কৃষি			অকৃষি		
	পুরুষ	মহিলা	ব্যক্তি	পুরুষ	মহিলা	ব্যক্তি
গ্রামীণ	৯০.৬	৯৫	৯৩.৪	৭৩	৬৪.১	৭১.৩
শহর	৮৮.৩	৯৭.৭	৯২.৫	৬৮.৩	৬০.১	৬৬.৯

সূত্র : NSS Employment—Unemployment Data, 2009-10.

নতুন প্রবণতা

কর্মসংস্থান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধি, ফলাফল মূল্যায়নের দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। অপ্রথাগত উৎপাদন ক্ষেত্রের বেশ কিছু শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক। তবে বস্ত্র, চর্ম, অধাতব খনিজ, মৌলিক ধাতুর মতো কিছু শিল্পে ইতিবাচক বিকাশ হারও দেখা গেছে।

এই তথ্যের প্রেক্ষাপটে ২০০৯-১০ সালে দিল্লিতে আমরা একটি গুণগত সমীক্ষা করি। বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পের ভালো ফলাফলের দিকে লক্ষ রেখে এই ক্ষেত্রের শ্রমিকদের পরিস্থিতি জানার চেষ্টা করা হয়। দিল্লির সুন্দর নগরী এলাকায় করা সমীক্ষায় দেখা যায়, এই ক্ষেত্রের শ্রমিকরা মূলত তিন ধরনের কাজে নিযুক্ত। দর্জির কাজ ও এমব্রয়ডারি, অলংকার এবং মোড়কজাতকরণ। শ্রমিকরা ঠিকাদারদের কাছ থেকে কাজের বরাত পান। উৎপাদিত দ্রব্য তাঁদেরকেই দেন। এরপর ঠিকাদাররা তা বিভিন্ন দোকানে বিক্রি করেন। কিছু পণ্যে নির্দিষ্ট সংস্থার ছাপ থাকলেও বহু পণ্য, উৎপাদক সংস্থার পরিচয় ছাড়াই বিক্রি হয়। ঠিকাদাররাই শ্রমিকদের কাঁচামাল কিনে দেন এবং তাঁদের কাছ থেকে উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ করেন। কাজের অভাব না থাকলেও শ্রমিকদের যে মজুরি দেওয়া হয়, তা অত্যন্ত কম। এমনকী, খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, তাঁদের প্রকৃত মজুরি ক্রমশ কমেছে। তবে প্রচুর কাজ থাকায় এই অবনমনের প্রভাব তাঁদের জীবনাযাত্রার মানের ওপর পড়েনি। কিন্তু একই পরিমাণ প্রকৃত মজুরি উপার্জন করতে শ্রমিককে এখন অনেক বেশি খাটতে হচ্ছে। শ্রমিকরা তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী সরাসরি দোকানে বিক্রির ব্যবস্থা করে উঠতে না পারায় সেই সুযোগে মুনাফা লুঠছে মধ্যস্বত্বভোগীরা। শ্রমিকরা যাতে উৎপাদিত পণ্য সরাসরি দোকানে বিক্রি করতে পারেন, সেজন্য সরকার ও নাগরিক সমাজের এগিয়ে আসা উচিত।

উৎপাদক সংস্থার পরিচয়সহ যেসব পণ্য বিক্রি হয়, তাদের মধ্যে যে সংস্থাগুলি উন্নত গুণমান বজায় রাখতে পারে, তাদের কাজের অভাব হয় না। কিন্তু তাতেও কম মজুরির সমস্যার সমাধান হয়নি। আসলে এটা সম্পূর্ণভাবেই ক্রেতা—নিয়ন্ত্রিত বাজার। ঠিকাদাররাই পণ্যের দাম ঠিক করে। এ নিয়ে কোনও দরাদরি চলে না। এখানকার মূলমন্ত্র হল, 'নাও, অথবা ছেড়ে দাও'। এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু সংগঠন ঠিকাদারদের তুলনায় অনেক বেশি মজুরি শ্রমিকদের দেয়। কিন্তু ঠিকাদাররা এদের থেকে ঢের বেশি কাজের বরাত দেওয়ায় শ্রমিকরা বাধ্য হয় ঠিকাদারদের কাজই করতে।

শ্রমিকদের কোনওরকম ঘরোয়া বা আনুষ্ঠানিক সংগঠন না থাকায় দর কষাকষির ক্ষমতা তাঁদের নেই। তাই মজুরি বৃদ্ধির সংগঠিত কোনও দাবি পেশ করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদিকে ঠিকাদারদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ায় তারা কিছুতেই মজুরি বাড়াতে চায় না। কাঁচামালের সরবরাহ একচেটিয়াভাবে ঠিকাদারদের হাতে থাকায়, ঋণ বা বিপণনে সহায়তা নিয়ে স্বাধীন ব্যবসা করার কথাও ভাবতে পারেন না শ্রমিকরা।

বাজারে সুনাম আছে, এমন কিছু সংস্থা প্রায়ই রপ্তানির বরাত পায়। তখন তারা শ্রমিকদের দিয়ে সেই পণ্য তৈরি করায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও মধ্যস্বত্বভোগীদের উপস্থিতি এবং শ্রমের অতিরিক্ত জোগানের ফলে

সারণি-২
অসংগঠিত উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ও GVA-র বিকাশ
(২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)

	OAME		ESTABLISHMENT		ALL	
শিল্প	**শ্রমিক**	GVA	**শ্রমিক**	GVA	**শ্রমিক**	GVA
খাদ্যদ্রব্য পানীয় ও তামাক	–৬.৭৭	২.১২	–৩.৩৯	–১.২৯	–৫.৯৪	০.৩৫
বস্ত্র ও চর্ম	২.৪৮	১৫.১৪	০.৪৬	৯.৮৪	১.৭৯	১২.০৭
কাগজ	–১৩.৩৫	–৪.০৪	১৫.৩৩	২৩.৪৫	–০.৬৪	১৭.২৯
রাসায়নিক	–১৭.৩৬	–৪.৭০	–২.০৪	৪.৫৯	–১০.৯৯	২.৯৫
অধাতব খনিজ	–৪.৯১	২.০১	১১.২৭	৯.০৩	৩.৯৭	৭.৬৭
মৌলিক ধাতু	১৩.৩৪	১৯.০৬	–২.৩০	–১২.৯২	২.৫২	–৯.১০
ধাতু	–৩.৬৯	৯.৬৫	৪.৭৭	১.৪৭	১.৮২	২.৫৪
যন্ত্রপাতি	–২৬.১৯	–১৪.৪৪	–৮.৬৫	–৫.৭০	–১২.৬৪	–৬.৬০
পরিবহণ যন্ত্রাংশ	–৫.৬৪	১৫.৬৩	–৭.৭০	৪.২০	–৭.৫২	৪.৭০
কাঠসহ অন্যান্য উৎপাদন	–১.৩২	১২.৭৯	৪.৪৩	৭.৭৭	০.৮৯	৯.৪৭
সব শিল্প	–২.৪৫	৯.৫৮	১.৮৫	৫.২৫	–০.৮৬	৬.৭২

সূত্র : NSS, GVA কোটি টাকায়, ২০০৪-০৫-এর মূল্যমানে।

শ্রমিকদের কাছে এর সুফল পৌঁছোয় না। এই সব ক্ষেত্রে পণ্যের গুণমানের ওপর কঠোর দৃষ্টি থাকায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি একই শ্রমিকদের দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে রেখে দিতে চায়। অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী, এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের বেশি মজুরি পাওয়া উচিত। কিন্তু অপ্রথাগত ক্ষেত্রে এমন নিদর্শন প্রায় মেলে না বললেই চলে। একমাত্র যে সুবিধা শ্রমিকদের কাছে পৌঁছোয়, তা হল কাজের নিশ্চয়তা। কাজের অনিশ্চয়তার জন্য কুখ্যাত অপ্রথাগত ক্ষেত্রের কিছু অংশে এই নিয়মিত কাজের সুযোগ পাওয়াটাই শ্রমিকদের লাভ। দীর্ঘকালীন মেয়াদে এর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা করা যায়। নিয়মিত কাজের সুযোগে শ্রমিকরা বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন। তাঁদের দক্ষতা বাড়বে, ধীরে ধীরে বিকশিত হবে নিজস্ব উদ্যোগ স্থাপনের সক্ষমতা এবং সার্বিকভাবে প্রথামুক্ত ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা বাড়বে। তবে এই ইতিবাচক পরিবর্তনের কিছুটা স্তিমিত হয়ে যেতে পারে প্রথাগত ক্ষেত্রের ঘরোয়াকরণ প্রক্রিয়ার জন্য। ঘটনাচক্রে এখন প্রথাগত ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তরে বিশেষত নিচুতলায় (শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি অফিসগুলিতে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী) এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে।

অপ্রথাগত উৎপাদনক্ষেত্রের যে সাম্প্রতিক পরিবর্তন নজরে আসছে তা বেশ উল্লেখযোগ্য। এই ক্ষেত্রের অনেক ছোট ছোট সংস্থা (বিশেষত পোশাক, চর্ম ও অলংকার শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সংস্থা) এখন প্রথাগত ক্ষেত্রের বৃহৎ কোনও সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত। এই বৃহৎ সংস্থাগুলিই কাঁচামাল প্রভৃতির জোগান দেয়। অনেকেই মনে করছেন, এই সংযুক্তিসাধনের ফলে ছোট সংস্থাগুলির ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা অনেকটা কমবে। ঋণ সহায়তা বা বিপণন নিয়ে তাদের আর ভাবতে হচ্ছে না। বরং কাঁচামাল এবং কাজের বরাত দোরগোড়ায় এসে পৌঁছোচ্ছে। আশা করা যায়, বিকাশের সুফল এইভাবে বৃহৎ সংস্থাগুলির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে ছোট সংস্থাগুলির কাছে এসেও পৌঁছোবে। প্রকাশিত হবে বিশ্বায়নের দরিদ্রবান্ধব চেহারা। তবে, আমাদের সুন্দর নগরী এলাকার সমীক্ষা কিন্তু সাধারণ এই আশার বিপরীত ফলাফলই তুলে ধরেছে।

উপসংহার

গ্রাম এবং শহর—দু'জায়গাতেই শ্রমিকদের একটা বড় অংশ অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কর্মরত। তবে আশার কথা হল, শহরের আকার বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রথামুক্ত ক্ষেত্রের চরিত্রও বদলাচ্ছে। যেসব শহরের বিকাশ সম্ভাবনা বেশি, সেখানে এই বদলটা বিশেষভাবে চোখে পড়ে, এমন শহরে একজন ব্যক্তির প্রকৃত আয় বেশি হয়। অর্থাৎ অপ্রথাগত ক্ষেত্রও এখন আর স্থবির নয়। অর্থনৈতিক বিকাশের বিস্তৃত পরিসরে উন্নত জীবিকা অর্জনের উৎস হয়ে ওঠার সম্ভাবনা এই ক্ষেত্রেও দেখা দিচ্ছে।

অপ্রথাগত ক্ষেত্রের সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলি বোঝাতে আমাদের সমীক্ষার কিছু পর্যবেক্ষণ উদ্ধৃত করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। চুক্তি প্রথা এবং অনুসারীকরণ প্রক্রিয়া এখন অপ্রথাগত ক্ষেত্রের কাজ ও ফলাফলের ওপর ইতিবাচক প্রভাব যেমন ফেলছে, তেমনি ক্ষতি হচ্ছে কল্যাণমূলক দিকটির। অপ্রথাগত উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১ সময়কালের মধ্যে ঋণাত্মক, সম্ভবত প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে খরচ কমানোর লক্ষ্যে এই ক্ষেত্রে ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। ভারতীয় উৎপাদন সংস্থাগুলি রপ্তানির বাজারে এখনও তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেনি। পণ্যের উপযুক্ত গুণমান না থাকায় অপ্রথাগত ক্ষেত্রেরও একই দশা। বিশ্বায়নের যে সুবিধা চীনা সংস্থাগুলি ভোগ করছে, ভারতের কাছে তা এখনও স্বপ্ন। আধুনিকীকরণের অভাবে পণ্য বৈচিত্র আসেনি, উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদনেও এখনও ভারত অগ্রণী ভূমিকা নিতে ব্যর্থ।

বিকাশের চালিকাশক্তি হিসাবে শিল্প পুনরুজ্জীবনের যে প্রয়াস কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি শুরু করেছে, অপ্রথাগত উৎপাদন ক্ষেত্রের বিকাশ না হলে এবং কর্মসংস্থান না বাড়লে, তা সফল হবে না। অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল, মূলধনের অভাব। এর ফলে শ্রম উৎপাদনশীলতার বিকাশ এবং আয়—দুই-ই ব্যাহত হয়। এমনকী পণ্য বিপণনের জন্যও প্রথামুক্ত ক্ষেত্র ঠিকাদারদের ওপর নির্ভরশীল। এর ফলে শ্রমিকদের আয় ব্যাপকভাবে কমে যায়। তাই বর্তমানে অপ্রথাগত ক্ষেত্র সংক্রান্ত একটি সার্বিক নীতি প্রণয়ন করা একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছে। এতে নিম্নস্তরে কর্মরত শ্রমিকরা বিশেষ উপকৃত হবেন।❑

[লেখক দিল্লির 'ইস্টিটিউট অব ইকোনমিক গ্রোথ'-এ অর্থনীতির অধ্যাপক।
email:arup@ iegindia.org]

WBCS-2012 Gr. C/D INTERVIEW

গ্রুপ-'বি' ইন্টারভিউ শেষ হল গত ৫ই সেপ্টেম্বর। এবার 'সি' এবং 'ডি' গ্রুপের পালা। এ বছর 'এ' এবং 'বি' গ্রুপের ইন্টারভিউগুলি ছিল একটু অন্য ধরনের। কনসেপ্ট বেসড নয়, বরং ফ্যাক্ট বেসড। ইংরাজি হোমোনিম, ভয়েস বা ন্যারেশন চেঞ্জ, ওয়ান লাইনার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে প্রচুর প্রশ্ন করা হয়েছে। এ ধরনের ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে প্রস্তুতির অ্যাপ্রোচ ভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। নতুবা ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে সমূহ সমস্যায় পড়তে হবে।

আপনি কি জানতে চান ??

- এ বছর বায়োডাটা থেকে কি কি প্রশ্ন করা হচ্ছে?
- এ বারের ইন্টারভিউ বোর্ড কেমন-ফ্রেন্ডলি না স্ট্রেসফুল?
- বাংলায় উত্তর দিতে দেওয়া হচ্ছে কি না?
- কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে কি ধরনের প্রশ্ন করা হচ্ছে?
- গ্র্যাজুয়েশন বা অপশনাল থেকে প্রশ্ন করা হচ্ছে কি না?
- হবি থেকে কোনও প্রশ্ন করা হচ্ছে কি না?
- কাজের অভিজ্ঞতা থেকে প্রশ্ন করা হচ্ছে কি না?
- বোর্ড, প্রার্থীর কাছ থেকে কি ধরনের উত্তর আশা করছে!

মেনস-২০১৪ এর মক টেস্ট

মেনসের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী ১০৫টিরও বেশি মক টেস্ট নেওয়া হবে। টেস্টগুলি শুরু হয়েছে সবে। সঙ্গে পাবেন সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এবং এনভায়রনমেন্টের সম্পূর্ণ স্টাডি ম্যাট একদম বিনামূলে।

'Vission-IV'

মেনসের চতুর্থ পত্রের জন্য শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে সামিম সরকার সম্পাদিত দেবাশীষ ঘোষের 'সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এন্ড এনভায়রণমেন্ট' বইটি।

WBCS MAINS CLUB

যারা একবার মেনস পরীক্ষায় বসেছে তারা মাত্র চারশো টাকার বিনিময়ে এই ক্লাবের সদস্যপদ পেতে পারে। এই ক্লাবের সদস্যরা পাবেন কম্পালসরি পত্রগুলির সাজেশন, কিছু নোটস এবং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, এনভায়রনমেন্ট ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সম্পূর্ণ স্টাডি ম্যাট। তাছাড়া পাওয়া যাবে কয়েকটি নির্বাচিত মকটেস্টে বসার সুযোগ। এবারেই সাফল্য লাভের উদ্দেশে আয়োজিত স্পেশাল ক্লাসে যোগদান করার সুযোগও পাওয়া যাবে।

WBCS -2015 সাফল্যের জন্য চাই স্পেশালাইজড গাইডেন্স

গ্র্যাজুয়েশন বা মাস্টার্স করার পর চাকরি প্রার্থীরা চাকরি পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করে থাকে। এই পড়াশোনা কিন্তু স্কুল-কলেজ স্তরের পড়াশোনার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। চাকরি পরীক্ষার প্রস্তুতির অ্যাপ্রোচ বা দৃষ্টিভঙ্গীটা সম্পূর্ণ পৃথক হওয়া প্রয়োজন, নতুবা সাফল্য অধরা থাকবে কিংবা আসতে বিলম্ব করবে। বর্তমানে স্কুল সার্ভিস এবং অন্যান্য রাজ্য স্তরের চাকরি পরীক্ষার অনিশ্চয়তা বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে ডব্লুবিসিএস-এর প্রতি আকর্ষিত করছে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মেধার চাকরি প্রার্থীদের কাছে ডব্লুবিসিএস-ই হল এখন একমাত্র অবলম্বন।

নতুন ব্যাচ শুরু হবে অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে

বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে ডব্লুবিসিএস-ই হল একমাত্র পরীক্ষা যেটি প্রতি বছর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া ফল প্রকাশের দীর্ঘসূত্রিতা ডব্লুবিসিএস-এ আর থাকছে না, এক বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে সম্পূর্ণ নিয়োগ পদ্ধতি। সুতরাং গ্র্যাজুয়েশনের পর চার বছর ধরে মাস্টার্স– বিএড করে স্কুল সার্ভিসের অপেক্ষায় না থেকে ডব্লুবিসিএস-এর প্রস্তুতিতে নেমে পড়া শুধু ভালোই নয়, সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। ডব্লুবিসিএস-এর প্রস্তুতি নিলে মিসলেনিয়াস, ক্লার্কশিপ, ব্যাঙ্ক, সাব ইন্সপেক্টর— পুলিশ/ফুড প্রভৃতি পরীক্ষাগুলিতে সাফল্য পাওয়া যায় অনায়াসে। ডব্লুবিসিএস-এর সিলেবাসে সম্প্রতি সরলীকরণ ঘটেছে, MCQ প্রশ্নের প্রবেশ ঘটেছে মেনসেও। সিলেবাসের এরূপ পুনর্বিন্যাসের ফলে ডব্লুবিসিএস-এর পাশাপাশি সিজিএল, রেল, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কেন্দ্রীয়স্তরের পরীক্ষাগুলিতেও সাফল্য পাওয়া যাবে একই প্রস্তুতিতে। অপশনালের বোঝাও লাঘব হয়েছে অনেকটা। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে ডব্লুবিসিএস-এর ক্ষেত্রে 'ফিল গুড' ফ্যাক্টর কাজ করছে। আর যারা এই পরীক্ষাকেই টার্গেট করছে তাদের সামনে রয়েছে 'Win-Win Situation'।

ডব্লুবিসিএস প্রস্তুতির প্রতিটি স্তরের জন্য **অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন** যে উৎকৃষ্টতম গাইডেন্স প্রদান করছে এখানকার চমকপ্রদ সাফল্যেই তার প্রমাণ মিলছে। **এই প্রতিষ্ঠানের একটি মাত্র ব্রাঞ্চ থেকে ডব্লুবিসিএস-এর ২০১১-র চূড়ান্ত তালিকায় সফল হয়েছে ১৩৫ জন এবং মিসলেনিয়াস ২০১১-তে ৫০ জন**। সাফল্যের শতকরা হারে এটি পশ্চিমবঙ্গের এক নম্বর সংস্থা।

এরকম অকল্পনীয় সাফল্যের পিছনে দুটি ফ্যাক্টর কাজ করছে। এক, কোর্সটি কনসিভ, ডিজাইন করা থেকে শুরু করে প্ল্যানিং-স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেশন—সম্পূর্ণ কাজটি অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন ডব্লুবিসিএস অফিসারদের একটি ডেডিকেটেড টিম। বেশির ভাগ ক্লাশই নেন তারা। দুই, এখানে শুধুমাত্র ডব্লুবিসিএস পড়ানো হয়। সেই অর্থে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন হল ডব্লুবিসিএস স্পেশালাইজড্ সংস্থা। বর্তমান যুগ হল স্পেশালাইজেসনের যুগ। তাহলে ডব্লুবিসিএস গাইডেন্সের জন্য স্পেশালাইজড সংস্থা নয় কেন?

Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6, College Street (College Square), Kolkata-700073

✆ 9830770440
✆ 9674478644

Website: www.academicassociation.in ▪ Centre: Uluberia-9051392240 • Birati-9674555451 • Darjeeling-9832041123

কলসেন্টারের কর্ম নিরাপত্তা

নতুন যুগের নব প্রজন্মের জন্য, নতুন ধরনের বহু কাজ সম্পর্কে আজ আমরা শুনি। কোনও কোনওটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে কারণ আমাদেরই নিকটজনেরা সে সব ক্ষেত্রে নিযুক্ত। আবার অনেকের এ সব সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই। তাদের মতে ঝকঝকে অফিস, ফিটফাট কর্মীদের টরটরে ইংরাজি; কতরকম আধুনিক যন্ত্রপাতির এ বোতাম-সে বোতাম টিপে টিপে কাজ; এই সব বাতানুকূল অফিসের কাজ-কর্ম-বেতন-পরিবেশ ও শর্তাবলি—এসব কি কর্মীদের অনুকূলে। অতি দীর্ঘ সময় ধরে অত্যধিক কাজের চাপ দীর্ঘদিন ধরে নিতে হলে, বা কর্মস্থলে কোনও আপত্তিজনক ঘটনা ঘটলে, কর্মীরা কি কোথাও অভিযোগ জানাতে পারেন? না কি কাজ ছাড়াই তাদের একমাত্র পথ—আপাতদৃষ্টিতে প্রথাগত ক্ষেত্রভুক্ত অথচ আদতে অপ্রথাগত ক্ষেত্র সদৃশ—কোন শ্রেণিতে ফেলা উচিত কলসেন্টারগুলিকে? লিখছেন **বাবু পি. রমেশ।**

অপ্রথাগত ক্ষেত্রের কর্মীদের কোনও নিরাপত্তা নেই, নেই মালিক ও কর্মীর মধ্যে কোনও রকম চুক্তি। এদের মজুরিও যেমন কম, তেমনি কাজও করতে হয় অনেক বেশি সময় ধরে; কর্মীদের নানা ধরনের ঝুঁকির মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হয়; ন্যূনতম মৌলিক শ্রম অধিকার-এর সুবিধা এরা ভোগ করে না। এক কথায়, শ্রমিক ও মালিক সংক্রান্ত কোনও আইনের আওতায় তারা পড়ে না। অপ্রথাগত ক্ষেত্রে এর কোনওটাই ভোগ করে না শ্রমিকরা। তবে দুটি ক্ষেত্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের এই সুস্পষ্ট ফারাক সত্ত্বেও সব সময় সব ধরনের কাজকে কোন শ্রেণিতে ফেলা উচিত, তা নিয়ে একটু ধাঁধা লেগেই থাকে। যেমন অংসগঠিত ক্ষেত্রভুক্ত উদ্যোগ সংক্রান্ত জাতীয় কমিশন (NCEUS)-এর মতে—"প্রথাগত ক্ষেত্রে যেমন অপ্রথাগত ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিয়োগ হয়ে থাকে।" তেমনি "অপ্রথাগত ক্ষেত্রেও কোনও কোনও সময়ে প্রথাগত ক্ষেত্রের নিয়ম মেনে নিয়োগ হয়।" ফলে প্রথাগত ক্ষেত্রে এমন 'কাজ বা চাকরি' আমরা দেখি যাতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এর উলটোটাও ঘটতে দেখা যায়। অতএব প্রথাগত বা অপ্রথাগত নিয়োগ সম্পর্কে ধারণাটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। তা না হলে একের সঙ্গে অপর ক্ষেত্রের জড়িয়ে, মিশে থাকার ব্যাপারটা আমাদের কাছে কখনওই পরিষ্কার হবে না। কোন কাজটায় প্রথাগত ক্ষেত্রের নিয়ম মানা হচ্ছে, আর কোন কাজটায় অপ্রথাগত ক্ষেত্রের বঞ্চনাই বেশি, সে সম্পর্কে বুঝতে হলে এই ক্ষেত্র দুটি সম্পর্কে ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এমন একটি চাকরি সম্পর্কে আলোচনা করব যা আপাতদৃষ্টিতে প্রথাগত ক্ষেত্রভুক্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। আজকালকার যুগের তরুণ-তরুণীরা অনেকেই এই চাকরিতে বহাল—কলসেন্টার-এর চাকরি।

পরিবেষা ক্ষেত্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ এই 'কলসেন্টার'গুলি। যে সব সংস্থার সঙ্গে কলসেন্টারগুলি যুক্ত যেহেতু সেগুলি সব সংগঠিত ক্ষেত্রভুক্ত, ঝাঁ-চকচকে আধুনিক প্রযুক্তির সমস্ত সুবিধাযুক্ত বিরাট বিরাট অফিসবাড়ির অংশবিশেষ এবং আকর্ষণীয় এ চাকরির বেতন এবং অন্যান্য 'প্যাকেজ' যেহেতু যথেষ্ট লোভনীয় তাই একে কখনওই অপ্রথাগত ক্ষেত্রভুক্ত বলে মনে না হতে পারে। কিন্তু খুব কাছ থেকে দেখলে বোঝা যাবে এ চাকরিতেও নিরাপত্তার অভাব যথেষ্ট। এই প্রবন্ধে কলসেন্টার এবং বড় বড় সংস্থায় 'আউট-সোর্সড' চাকরির বাড়বাড়ন্ত, তার কারণ ও প্রবণতাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ভারতে আউটসোর্সিং-এর সূচনা ও বাড়বাড়ন্ত

আশির দশকে, বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঢেউ উঠেছে, তখন থেকেই আউটসোর্সিং-এর প্রক্রিয়া বাড়তে থাকে। তবে আউটসোর্সিং এর ধারণাটি আগেও ছিল এবং তা কাজেও লাগানো হত। বড় বড় বাণিজ্য ও শিল্প সংস্থা তাদের তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি পূর্ব নির্ধারিত ছোটখাট সংস্থাগুলিকে দায়িত্ব দিয়ে করিয়ে নিতে আরম্ভ করে। যে সব অঞ্চলে কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সহজে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়, সে সমস্ত অঞ্চলের সংস্থাগুলিকে দিয়েই এসব কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। বড় বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে এই সমস্ত ছোট ছোট সংস্থার যোগাযোগ স্থাপন করা হত প্রযুক্তির সাহায্যে। প্রথম প্রথম এ কাজ উন্নত রাষ্ট্রের গ্রাম অথবা শহরতলি অঞ্চলের মানুষ দিয়েই করানো হত কারণ সেখানে মজুরির হার শহরের তুলনায় কম। অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত শিল্পপতিরা খরচ বাঁচিয়ে বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য দেশের গণ্ডির বাইরে যেতেন না।

নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সামনে চাকরির এক নতুন ক্ষেত্র খুলে যেতে দেখলাম আমরা—তথ্যপ্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি

সংক্রান্ত পরিষেবা ও ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আউটসোর্সিং। বর্তমানে ভারত এই পরিষেবা ক্ষেত্রে এক নম্বর স্থান অধিকার করে এবং এই ক্ষেত্রটি বিশ্বের সব থেকে দ্রুত বেড়ে ওঠা ক্ষেত্রগুলির অন্যতম। 'ন্যাসকম'-এর হিসাবমতো ১৯৯৮ সালে দেশের মোট জিডিপিতে এই বিশেষ ধরনের পরিষেবার হিস্সা ছিল ১.২ শতাংশ। ২০১২-তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭.৫ শতাংশে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩-১৪ জানাচ্ছে যে, ২০১৩ সালে টোটাল গ্লোবাল সোর্সিং মার্কেটের ৫৫ শতাংশ (ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত পরিষেবা ও আর অ্যান্ড ডি ক্ষেত্র ছাড়া) আসে ভারত থেকে। ২০১২ সালে এই হার ছিল ৫২ শতাংশ। সমীক্ষা এও জানায় যে ২০১৩-১৪ সালে আইটি বিজনেস প্রসেস ম্যানেজমেন্ট (বিপিএম) ক্ষেত্র (হার্ডওয়্যার বাদে) ১০.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যার আর্থিক মূল্য ১০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত জাতীয় নীতির অনুমান আইটি ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের থেকে আয়ের পরিমাণ ২০১১-১২ সালের ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০২০ সাল নাগাদ ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে। এছাড়া এক্ষেত্রে রপ্তানির পরিমাণও ২০১১-১২ সালের ৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০২০ সালে হবে ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এমনটাই অনুমান করা হচ্ছে।

ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বৃদ্ধিকে মোটামুটিভাবে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে (১৯৯০ সালের মাঝামাঝি থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত) আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়োগ করা হত এবং তাতে ভারতীয় কর্মীরা ছিলেন অন্যতম কর্মী। পরে, অর্থাৎ (২০০৫ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত) ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের দ্রুত প্রসারের ফলে বহু কর্মী দেশি সংস্থাগুলিতেই কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন। ২০০৯ সাল পর্যন্ত ভারতেই কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে ৪,৫০,০০০ জনের। এক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ বাড়ছে ২০১২ সালে আইটি-বিপিও ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হারে ২০.৭ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটে বলে 'ন্যাসকম' জানাচ্ছে।

কলসেন্টারের কথা

তথ্যপ্রযুক্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হারে এই অকল্পনীয় বৃদ্ধি গত কয়েক বছরে ঘটে গেল, তার মধ্যে সব থেকে বেশি চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি ঘটেছে 'কলসেন্টার'গুলিতে। যদিও এক্ষেত্রে হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন, ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডেস্কটপ প্রিন্টিং, আর্থিক ও আইনি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আউটসোর্সিং, ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স ইত্যাদির মতো বহু ধরনের কাজ রয়েছে, তবু 'কলসেন্টার'-এর নিয়োগের হার ছিল সব থেকে বেশি। জিডিপিতে কলসেন্টার-এর অবদানও কম নয়।

কলসেন্টার-এর কাজের সঙ্গে আমরা সবাই অল্পবিস্তর পরিচিত। ফোনের মাধ্যমে মার্কেটিং, ক্রেতাদের সঙ্গে পণ্যের কেনাবেচা, তার যত্ন ও মেরামত সংক্রান্ত কথোপকথন ইত্যাদি তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে ক্লায়েন্টদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিসংখ্যান সংকলন বেতন সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ প্রস্তুত করার মতো অন্যান্য কাজও। আমাদের ধারণা কলসেন্টার-এর কর্মীরা কথোপকথনের মাধ্যমেই তাঁদের কাজ করেন। তা কিন্তু সব সময় নয়। ইন্টারনেট এবং ই-মেল-এর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনও করা হয় এ ধরনের কাজে।

এছাড়াও যেটা জানা দরকার, তা হল কলসেন্টারগুলি শুধুমাত্র একজন ক্লায়েন্ট-এর প্রয়োজন পূরণ করে না, একাধিক সংস্থার জন্য একইসঙ্গে কাজ করে 'নন-ক্যাপটিভ' কলসেন্টারগুলি। আকার, কাজের ধরন, কাজের সময়, ক্লায়েন্টের চাহিদা, কর্মীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, কমপেনসেশন প্যাকেজ অনুযায়ী কলসেন্টারগুলির বৈচিত্র বাড়ে।

দেশি ও আন্তর্জাতিক কলসেন্টার

আগেই বলেছি প্রথম দিকে কল সেন্টারগুলি আন্তর্জাতিক আউট-সোর্সড সার্ভিস-এর অঙ্গ হিসেবে প্রসার লাভ করে। এগুলি ছিল মূলত টেলিফোন ভিত্তিক কাজ এবং ইংরাজি ভাষাতেই কথাবার্তা বলতে হয়। কিন্তু এখন দেশেই কলসেন্টার-এর রমরমা। এক্ষেত্রে কাজের ধরনেও বৈচিত্র আছে এবং যোগাযোগের মাধ্যম হিন্দি, ইংরাজি এবং কোনও কোনও আঞ্চলিক ভাষা। তবে আন্তর্জাতিক ও দেশি কলসেন্টার কর্মীদের ক্ষেত্রে এছাড়াও অনেক তফাত। সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত কলসেন্টার কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা তুলনামূলকভাবে ভালো, তাদের উপার্জন বেশি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের কর্মীরা সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণিভুক্ত অথচ দেশের কলসেন্টার কর্মীরা অসচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়ে, তাদের শিক্ষার মানও তেমন ভালো নয়, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা গ্রামাঞ্চলের ছেলে-মেয়ে। আন্তর্জাতিক ও দেশি কলসেন্টার কর্মীদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ফারাকটা যখন এতটাই বেশি, তখন এদের কর্ম নিরাপত্তার বিষয়টিও পৃথকভাবে আলোচনা করা ভালো।

আন্তর্জাতিক কলসেন্টারে নিরাপত্তার অভাব

আন্তর্জাতিক কলসেন্টার কর্মীদের বেতন বেশি হলেও বা তাদের কাজের চোখ ধাঁধানো পরিবেশ সত্ত্বেও, এই ক্ষেত্রে কাজের নিরাপত্তা অত্যন্ত কম। এঁরা চুক্তিবদ্ধভাবে কাজ করেন; এদের কাজ প্রজেক্টভিত্তিক; এই ধরনের প্রজেক্টগুলি বিপিও বা বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে পাওয়া, নিজস্ব কোম্পানির প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী সৃষ্ট কাজ নয় (যা দেশি কলসেন্টার-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। ফলে প্রজেক্ট-এর কাজ সম্পন্ন হলে অনেক ক্ষেত্রেই কর্মহীন হয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে।

আন্তর্জাতিক উৎপাদন শৃঙ্খল বা গ্লোবাল প্রোডাকশন চেনগুলির নির্দিষ্ট সময়, কাজের চাহিদা এবং অর্থ ব্যয়ের কাঠামোর মধ্যে থেকেই কলসেন্টারগুলিকে কাজ করতে হয়। ফলে ন্যূনতম কর্মী নিয়োগ করে তাদের দিয়ে যথাসম্ভব কাজ করিয়ে নেওয়া এদের বৈশিষ্ট্য। কর্মীদের অত্যধিক কাজের চাপ থাকে বলে অনেক সময়ে এদের 'সাইবার কুলি' বলা হয়। কোম্পানির নিজস্ব চাহিদা ও নিয়ম মেনে, কাজের কোনও নির্দিষ্ট সময়ের তোয়াক্কা না করে এদের বহাল করা হয়। ফলে এরা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে,

আবার অনেক সময়ে অসুস্থও হয়ে পড়ে। কর্মী অধিকার বলে কোনও কিছু এক্ষেত্রে নেই। কর্মী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার স্বাধীনতা তাদের নেই। সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপক কৌশলের সাহায্যে কর্মীদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে তারা 'একক ব্যক্তি' হিসেবে কাজ করে, সহকর্মীদের সঙ্গে বেশি মেলামেশার বা সামাজিকতা বজায় রাখার অভ্যাস গড়ে না তোলে। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি এখানে পরিবর্তিত এবং সে নীতি অনুযায়ী কর্মীদের ওপর পরোক্ষভাবে একটা নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল সব সময়ই অদৃশ্যভাবে কাজ করে। মোটের ওপর, প্রথম পর্যায়ে (নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ২০০৫ পর্যন্ত) ভারতের কলসেন্টারগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষ কর্মী নিয়োগ করা হলে এই নতুন ধরনের কাজগুলিতে নিরাপত্তার অভাব ছিল ভীষণভাবে।

দেশি কলসেন্টার

এ পর্যায়ের প্রথম দিকে কর্মী নিয়োগের মান ছিল উন্নত এবং কাজও হত ভালো কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে এর অবনতি ঘটে। আন্তর্জাতিক কলসেন্টারগুলির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে দেশের কলসেন্টারে কর্মীদের যোগ্যতা ও দক্ষতা, সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করবার ক্ষমতা, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী ও অন্যান্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদির অবস্থা ও মান অত্যন্ত খারাপ। ঠিক তেমনি কাজের পরিমণ্ডলও খুব ভালো নয়; বেতন পর্যাপ্ত নয়; কাজের শর্ত কর্মীদের অনুকূল নয়; দক্ষতার চাহিদা বা কদর নেই এবং নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বেশ কড়া।

দেশের কলসেন্টারগুলিতে পরিকাঠামোর অভাব, প্রযুক্তিগতভাবেও এগুলি আধুনিক নয়। অল্প পরিসরে সুপারভাইজারের কড়া নজরদারিতে সেই প্রাচীনকালের পরিমণ্ডলে কাজ করে দেশি কলসেন্টার কর্মীরা। অনেক বেশি সময় ধরে, প্রায় স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার কঠোর নিয়ন্ত্রণে কাজ করাই এখানকার প্রচলিত ধারা। এক চরম শোষণ চলে কলসেন্টারের কর্মীদের ওপর। কারণ কোনও জোট বাঁধার নিয়ম এদের নেই। এদের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক পদক্ষেপের চূড়ান্ত অভাব এই বিশেষ ক্ষেত্রের একটি ত্রুটি।

উপসংহার

আমরা উপরের আলোচনা থেকে যে সিদ্ধান্তে আসতে পারি তা হল, কলসেন্টারে নিয়োগ আপাতদৃষ্টিতে প্রথাগত ক্ষেত্রের মতো বলে মনে হলেও এক্ষেত্রে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য এমন আছে যা একে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের সমগোত্রীয় করে তোলে। কলসেন্টার-এর কর্মীদের কল্যাণসাধনের জন্য তাই উপযুক্ত নীতি ও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত দরকার। কলসেন্টার-এর মতো এ যুগের আরও অন্যান্য কাজ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জেনে সে সব কাজের পরিবেশ, কর্মীদের নিরাপত্তা বোধ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।❑

[লেখক ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যান্ড ট্রান্সডিসিপ্লিনারি স্টাডিজ'-এ সহযোগী অধ্যাপক।
email: babu@ignou.ac.in]

WBCS ই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয়

প্রিলির জন্য

- কোন্ কোন্ ZONE থেকে প্রশ্ন আসছে দেখে, তা পড়ো।
- সবচেয়ে জোর দাও সহজ প্রশ্নে। সঙ্গে কনসেপ্টচুয়াল প্রশ্ন থাকুক। ২০১৪ -র মতো সমস্যা হবে না।

মেইন -এর জন্য

- অ্যানালাইজ করে পড়ো - সুবিধা হবে। যেমন - শ্রমিক আন্দোলন ও কংগ্রেসের সম্পর্ক।
- নতুন সিলেবাস বলে চিন্তা কোরো না। অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স পড়ো, যেমন - নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার, ওশান ফার্মিং।
- প্রস্তুতির জন্য একই প্যাটার্নের প্রশ্ন খুঁজে দেখে নাও, কনফিডেন্ট থাকবে।

প্রিলি - মেন - অপশনালের জন্য ফোন করেই দেখ না।

C/o Devid

5 টিচার্স গ্রুপ • 9593411432 • দমদম - নবদ্বীপ - বর্ধমান

অপ্রথাগত ক্ষেত্রের আর্থসামাজিক সমস্যা

সংগঠনের পরিসরে সুনিশ্চিতভাবে কর্মরত মানুষের তুলনায় সামাজিক সুরক্ষার ছত্রচ্ছায়ায় 'অপ্রথাগত' ক্ষেত্রের রোজগারের মানুষের সংখ্যা ঢের বেশি। কর্মনিশ্চয়তা ও সামাজিক সুরক্ষার গণ্ডির মধ্যে এই মানুষগুলিকে আনতে হবে। না হলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। এই 'অপ্রথাগত' কর্মীবাহিনীকে কীভাবে চিহ্নিত করা যায় জানাচ্ছেন **ড. অভিজিৎ নন্দী।**

বিগত শতাব্দীর সাতের দশকের শুরু থেকেই আফ্রিকা মহাদেশের বেশ কয়েকটি দেশে খাদ্যসংকট তীব্র আকার নেয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ কাজহীন মানুষগুলির খাদ্য ও কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন সমীক্ষা চালায়। ওই সময়ের প্রকাশিত রিপোর্ট থেকেই 'ইনফরমাল' বা অপ্রথাগত 'সেক্টর' কথাটি বিভিন্ন দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সংগঠনগুলিতে আলোচিত হতে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের অস্তিত্ব নগর সভ্যতা শুরু হওয়ার আগে থেকেই চালু আছে। বিধিবহির্ভূত অপ্রথাগত ও অসংগঠিত এই সব ক্ষেত্র সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় নিত্যদ্রব্য ও পরিষেবাগুলি সরবরাহ করলেও পরিকল্পিত অর্থনীতিতে জাতীয় আয়-ব্যয়ের পরিকাঠামোর বাইরেই ছিল। শ্রম-সংখ্যাতত্ত্ববিদদের ১৫তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (১৯৯৩) এই বিষয়গুলিতে যুক্ত শ্রমিকদের বিধিসম্মতভাবে আর্থিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলের আওতায় আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। রাষ্ট্রসংঘের আর্থিক ও সামাজিক সংস্থা প্রতিটি দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী জাতীয় আয় নির্ধারণের পদ্ধতি-প্রকরণে এই ক্ষেত্রগুলিকে যুক্ত করার আবেদন জানায়। আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের গতিধারা এক এক দেশে এক এক রকমভাবে অভিযোজিত হওয়ার জন্য 'ইনফরমাল সেক্টর'-এর সঠিক সংজ্ঞা ও এর অনুক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত হয়নি। প্রকৃতি ও কার্যকারিতার দিক থেকে অধিকাংশ কাজেই অসংগঠিত (unorganised) পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। সামগ্রিক বিচারে অসংগঠিত ক্ষেত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: বিধিসংগত ও বিধিবহির্ভূত বা অপ্রথাগত। আমাদের দেশের নিরিখে বিধিবহির্ভূত বা অপ্রথাগত শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যাই বেশি, যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থায় কায়িক শ্রমটাই মূলধন আকারে দেখা যায়। ফলত বার্ষিক শিল্প সমীক্ষাতে অনেক বিষয়কেই অসংগঠিত ক্ষেত্রে ধরা হয় না। পরিস্থিতির বাস্তবতা বিচার করেই জাতীয় নমুনা সমীক্ষাতে একটি নির্দেশিকা হাজির করা হয়েছে। সরকারি ব্যবস্থাপনার বাইরে যাঁরা পারিবারিক সম্পর্ক, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বকে সাংগঠনিক ভিত্তি করে নিজস্ব কারবার চালান তাঁরাই অসংগঠিত ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত। তবে মনে রাখা দরকার সরকারি ও অসরকারি উভয় সাংগঠনিক কাঠামোতেই অপ্রথাগতভাবে কাজ হয়ে আসছে। কারণ প্রচলিত আইনগুলির কার্যকারিতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না। এজন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রমিকসংখ্যা ও অন্তর্ভুক্তির প্রকৃতিকে নিয়ে হিসাব করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ দেশে কর্মক্ষম শ্রমিকের জোগানের তুলনায় চাহিদা কম থাকার জন্য কর্মসংস্থানের বিকল্প পথ হিসাবে অপ্রথাগত নিয়োগ প্রাধান্য পায়। সংখ্যাগত দিক থেকে নয়জন বা তার কম সংখ্যক মানুষ যদি ব্যক্তি উদ্যোগে কোনও কারবার পরিচালিত করেন তবে সমবায় বা অন্যান্য কোম্পানি আইনে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা থাকলেও তা কঠিনভাবে প্রয়োগ করার আইনানুগ বাধ্যবাধকতা থাকে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির অনুমোদন নিয়েই গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলি পরিচালিত হতে থাকে কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে।

সমীক্ষালব্ধ ফলগুলি থেকে এটা পরিষ্কার যে আমাদের দেশে অসংগঠিত ও অপ্রথাগত ক্ষেত্রগুলিতে মোট কর্মীসংখ্যা প্রায় ৫০ কোটি। যা প্রায় মোট কর্মীবাহিনীর ৯৫ শতাংশ। এর সঙ্গে প্রতি বছর প্রায় ১৩ লক্ষ নতুন কর্মী যুক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের থেকেও কর্মীসংখ্যার বৃদ্ধির হার বেশি। মূল কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই—(১) সংগঠিত ক্ষেত্রগুলি কমে আসা, যন্ত্রপাতির অধিক ব্যবহার ও কম সময়ের জন্য চুক্তি ও পরবর্তী সময়গুলিতে কোনও রকম চুক্তি ছাড়াই কাজ করানো; (২) চিরাচরিত পেশা ও বাসস্থান থেকে দূরে যেতে বাধ্য হওয়া; (৩) প্রকৃত মজুরি কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে বৃহৎ মালিকানার উন্নত প্রযুক্তির পণ্য সামগ্রীর উপস্থিতি; (৪) ন্যূনতম মজুরি আইনের শিথিলতা; ইত্যাদি। দেশের অভ্যন্তরেও উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির তারতম্য থাকার ফলে মজুরি আইন প্রণয়নে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। শ্রমশক্তির দক্ষতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে ভাবার সময় এসেছে। শ্রমমন্ত্রক অসংগঠিত শ্রমিকদের মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করেছে—(১) পেশা কেন্দ্রিক, (২) কাজের প্রকৃতি কেন্দ্রিক, (৩) শ্রম-ক্লান্ত কেন্দ্রিক ও (৪) পরিষেবা কেন্দ্রিক।

পেশা কেন্দ্রিক : এখানে যেগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে তা হল—ছোট ও প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন খেতমজুর, ভাগচাষি,

মৎস্যজীবী ও পশুপালন, বিড়ি শ্রমিক, কৃষি ও অন্যান্য শিল্প দ্রব্যাদির প্যাকেজিং, নির্মাণশিল্পে যুক্ত শ্রমিক, তাঁত ও চর্ম শিল্পে যুক্ত শ্রমিক, ইট ও পাথরকুচি, কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য প্রস্তুতি ও ডাল-তেল ইত্যাদি মিলে যুক্ত মানুষজন।

কাজের প্রকৃতি কেন্দ্রিক : কী শর্তে শ্রমিক যুক্ত আছে কাজের সঙ্গে, এটাই বিবেচ্য। সাধারণত স্থায়ী কৃষি শ্রমিক, স্থায়ী পারিবারিক শ্রমিক, চুক্তিবদ্ধ ও সাধারণ দিনমজুর, স্থানান্তরকামী দিনমজুর ইত্যাদি।

শ্রম-ক্লান্ত কেন্দ্রিক : এই অংশের কাজ প্রকৃত অর্থেই অপ্রথাগত এবং ক্লান্তিকর কায়িক শ্রমে যুক্ত। গাছের পাতা সংগ্রহ, জ্বালানির জন্য উপকরণ, ঝাড়ুদার, গাড়িতে দ্রব্যের ওঠানো ও নামানো—ও অন্যান্য মুটে মজদুরের কাজ।

পরিষেবা কেন্দ্রিক : গৃহ ও গৃহ পরিষেবা, ফল-ফুল ও সবজি বিক্রেতা, সংবাদপত্র বিক্রেতা, রাস্তাঘাটে খাবার ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রেতা ইত্যাদি বিষয়গুলির সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক।

উপরিউক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রম ও শ্রমের মূল্যের কোনও সম্পর্ক নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজের সময় নির্দিষ্ট না থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যাও দেখা দেয়।

শ্রম মন্ত্রকের বিভাজনকে মাথায় রেখে বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত ৫টি অনুক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থা ও আগামী পরিকল্পনা :

(১) কৃষি ও কৃষি সহযোগী বিষয় : কৃষি, মৎস্য, পশুপালন ও উদ্যানভিত্তিক ফসলের চাষ মূলত ব্যক্তি উদ্যোগেই পরিচালিত হয়ে আসছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শুধুমাত্র গবেষণা ও গবেষণাজাত ফলগুলি প্রাথমিক কার্যকারিতা দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চা, কফি ও অন্যান্য দু-একটি বাগিচা ফসল রপ্তানিযোগ্য হওয়ার জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই (১৯৫১)এর সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা বিধিবদ্ধ ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কারণ উৎপাদনে ধারাবাহিকতা রাখা রপ্তানির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অন্যান্য বাগিচা ফসলগুলি কিন্তু ব্যক্তি উদ্যোগেই চলতে থাকে। অসংগঠিত ও অপ্রথাগত শ্রমিক সংখ্যার প্রায় ৬০-৬৫ শতাংশই এই অনুক্ষেত্রগুলিতে যুক্ত। দেশ ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে ন্যূনতম মজুরির কথা বলা থাকলেও চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে এর তারতম্য ঘটে। জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে ১০০ দিনের কাজ চালু হওয়ায় কৃষি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রগুলিতে মজুরির হার বেড়েছে। তবে এই প্রকল্পে যে সম্পদ তৈরি হওয়ার কথা যা এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে পরোক্ষ সহযোগিতা করতে পারে তা আশানুরূপ নয়। কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদগুলির কার্যকারিতাকে যুক্ত করার জন্য আরও বেশি পরিকল্পনা ও তদারকির দরকার আছে। ফলত কর্মসংস্থান প্রকল্পটি সাময়িক সুবিধা দিলেও দীর্ঘমেয়াদি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

(২) পেশাগত প্রচলিত কৃষি ও অকৃষি জাত নির্মাণ শিল্প : ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফল আমাদের দেশে পৌঁছানোর আগে কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেশের গ্রামীণ মানুষজন নিজেরাই তৈরি করতেন। সময়ের নিরিখে তা পেশায় রূপান্তরিত হয়। বংশানুক্রমিকভাবে চলতে থাকে। যন্ত্রের বিকাশে কাজ হারালেও ওই শিল্পগুলির পূর্ণ অবলুপ্তি এখনও ঘটেনি। মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে চলেছে। যদিও বর্তমান সময়ে তাঁরা তাঁদের পেশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে অবসর সময়গুলিতে কৃষি ও অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। লৌহজাত দ্রব্য, মাটি থেকে তৈরি দ্রব্যাদি, কাঠ ও বাঁশজাত দ্রব্য, সূতা থেকে কাপড় তৈরি, অন্যান্য ধাতব দ্রব্য থেকে গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, বাড়ি-ঘর তৈরি ইত্যাদি বিষয়গুলিতে যুক্ত মানুষজন গ্রামীণ ও শহরতলিতে পেশা হিসাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

দ্রুত নগরায়ণের জন্য শহরাঞ্চলে বাড়ি ঘর তৈরি করতে ইট, বালি ও পাথরের জোগানের জন্য বড় অংশের শ্রমিক যুক্ত রয়েছেন। গৃহ নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন তাঁদের মজুরি হার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। বর্তমানে অপ্রথাগত শ্রমিক সংখ্যার প্রায় ১০ ভাগই এই শিল্পগুলিতে যুক্ত।

(৩) স্থানীয় বাজার ও ছোট-মাঝারি ও খুচরো বিক্রেতা : উদার অর্থনীতির একটি প্রধান বিষয়ই হল বাজার ব্যবস্থার পূর্ণ সংস্কার। আমাদের দেশে পরিকাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আর্থিক মহলে দীর্ঘদিন থেকেই আলোচিত হয়ে আসছে। কিন্তু সেখানে উদার অর্থনীতি কেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা নতুন মাত্রা নিয়েছে। কৃষিজাত দ্রব্য, গ্রামীণ ও শহরতলির অকৃষিজাত নির্মিত দ্রব্য বাজারজাত করার জন্য ছোট-মাঝারি ও খুচরো বিক্রেতারা যুক্ত আছেন। এর সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলি একাধারে প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা। আয় খুব বেশি না হলেও রুটি-রুজির জন্য সাধারণ মানের আয় করতে পারেন। খুচরো বিক্রির বাজারগুলিতে বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ একটি বড় অংশের মানুষকে আশঙ্কিত করছে তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। গোটা দেশে তাই বিতর্কও তৈরি হচ্ছে।

পদ্ধতি প্রকরণ ঠিক না করে অধিক মূলধনের বৃহৎ পুঁজি বর্তমানে যুক্ত শ্রমিকের ১২-১৫ শতাংশের বেশি কাজে লাগাতে পারবেন না। প্রায় ৮০-৮৫ শতাংশ মানুষ তাঁরা তাঁদের প্রস্তুত সামগ্রীও আর তৈরি করতে পারবেন না বাজারজাত না হওয়ার জন্য। বিশ্বায়নের প্রদর্শিত পথে চলতে গিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী আইন প্রণয়নে অসুবিধা হচ্ছে।

(৪) খনি, রাস্তাঘাট ও পরিবহণ, জল ও বিদ্যুৎ হোটেল ও অন্যান্য খাদ্য প্রস্তুতকারী সংস্থা : এই বিষয়গুলিতে যুক্ত শ্রমিকদের আয় প্রকৃত অর্থেই অপ্রথাগত। কাজের ক্ষেত্রগুলিও ঝুঁকিপূর্ণ। প্রয়োজনমাফিক সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকার জন্য অধিকাংশ সময়ে শ্রমিকমৃত্যু ঘটে থাকে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ এই বিষয়গুলিতে যুক্ত শ্রমিকের আয়, বাসস্থান, পেশাগত দক্ষতা ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আবেদন জানিয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের শ্রম আইন অনেক সময়েই জটিলতা সৃষ্টি করে। কাজের সময়

শ্রমের মূল্য ও সুসংহত আইন প্রণয়নের দরকার আছে।

(৫) গৃহ ও অন্যান্য নিত্য পরিষেবা : গৃহ কর্ম ও আনুষঙ্গিক কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা সার্বিক নিরূপণ এখনও হয়নি। অপ্রথাগত ক্ষেত্রের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ এই পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হলেও সামগ্রিকভাবে আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার যে পরিমণ্ডল তার বাইরেই অবস্থান করছে। শেষ আদমশুমারির পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে এ বিষয় সম্পর্কে আমরা আরও বেশি অবহিত হতে পারব। এই ক্ষেত্রে যাঁরা পরিষেবা দিয়ে থাকেন তাঁদের একটি বড় অংশই ১৮ বছরের নীচে কিশোর-কিশোরী ও মহিলারা। আয়, কাজের সময় ও নিরাপত্তা ইত্যাদির মতো বিষয় খুবই অস্বচ্ছ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বারবার আলোচিত হলেও পরিস্থিতির কোনও বদল নেই বললেই চলে। এমনকী বিধিবদ্ধ সংস্থাতেও অলিখিতভাবে তাদের যুক্ত করার ধারা অব্যাহত আছে। দারিদ্র, পারিবারিক সমস্যা, জাত-পাত সমস্যা ও শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় না রাখতে পারার জন্যই শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। বিগত দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, এদের শিক্ষার জন্য স্কুল পরিচালিত হলেও পারিবারিক আয় খুবই কম থাকার জন্য তা ফলপ্রসূ হয়নি। বৃত্তিমূলক পরিকাঠামো গঠন করে আয়ের ব্যবস্থা ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

আগামীদিনে যে বিষয়গুলি ভাবা দরকার

গবেষণালব্ধ ফল থেকে এটা পরিষ্কার যে, গ্রামাঞ্চলে অপ্রথাগত শ্রমিক সংখ্যা শহরের থেকেও বর্তমান সময়ে কমছে। কিন্তু শিল্প সংস্থাগুলিতে অপ্রথাগত শ্রমিকের হার বেড়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্রের পরিমাণও বাড়ছে। বর্তমান আর্থিক ও সামাজিক পরিকাঠামোতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে পরিকল্পনায় আনা দরকার।

(১) শ্রম আইনে কাজের সময়কে ৮ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ রাখা। এতে সামাজিক বিষয়গুলি শ্রমিকদের শিক্ষা ও দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে; (২) শহর ও গ্রামে কাজের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে নিবদ্ধভুক্ত করা জরুরি। 'শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করে কাজ ও চুক্তির বিবরণ, কাজের দক্ষতা ও নিয়োগকর্তা ও নিয়োগিত উভয় তরফের অভিজ্ঞতা তথ্য আকারে সংরক্ষণ করা দরকার। কাজ না পাওয়া পরিবারগুলিও যাতে কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে স্থায়ী কিছু প্রকল্পে কাজ করতে পারেন তারও ব্যবস্থা থাকা দরকার; (৩) গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের চিরাচরিত পেশায় যুক্ত শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রচলিত শিল্পকে সময়ানুযায়ী করা; (৪) প্রতিটি অপ্রথাগত অনুক্ষেত্রকে জাতীয় উৎপাদন ও আয় ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা; (৫) প্রচলিত শ্রম আইনগুলিকে এক সুসংবদ্ধ রূপ দেওয়া; (৬) শিশু শ্রমিকদের বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যুক্ত করে আয়ের ব্যবস্থা করা; (৭) মহিলাদের জন্য কাজের সময় নির্ধারণ করা ও কর্মরত মহিলাদের শিশুদের দেখভালের ব্যবস্থা যাতে থাকে তা দেখা দরকার।❑

[লেখক বিভাগীয় প্রধান, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া।]

'Only Optional'
'WBCS' and 'IAS'
Subject - Anthropology

প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিচ্ছেন বিশিষ্ট শিক্ষক উপল মান্না।

Upal Manna, M.Sc. Gold Medalist in 'Anthropology'

প্রাক্তন শিক্ষক, Haldia Govt. College

প্রাক্তন শিক্ষক, Maharishi Corporate Development Programme (Maharishi Institute)

Opptional হিসেবে Anthropology নেওয়ার সুবিধে ঃ-

১) মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রিক একটি বিষয়।

২) মানুষের বিবর্তন ও জৈবিক বৈচিত্রের কথা।

৩) উপজাতিদের কাহিনি।

তাই এই বিষয়টি পড়া, বোঝা ও মনে রাখা অনেক সহজ এবং অনেকটা নম্বর পেতে সাহায্য করে।

সঠিক প্রশিক্ষণের জন্য যোগাযোগ - মোবাইল ঃ- 9231921650 / 9007917562

নীতি রচয়িতাদের কাছে 'অপ্রথাগত' ক্ষেত্রের নতুন ব্যাখ্যা

অপ্রথাগত ক্ষেত্র—কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা হয় না এর। একে শুধু অর্থনীতির সঙ্গে জড়ালে চলবে না, বরং এক বৃহত্তর সামাজিক ঘটনা হিসাবে দেখতে হবে যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ কীথ হার্ট পশ্চিমের শিল্পকেন্দ্রিক, পুঁজিবাদী দেশগুলির উদাহরণ দেখে সুদূর আফ্রিকার ঘানার শহরাঞ্চলের পথবিক্রেতা বা অন্যান্য ঠিকে মজুরদের কাজকর্মকে যখন 'অপ্রথাগত' অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার পর থেকে বহু জল গড়িয়েছে। এরপর বহু ধরনের বিচিত্রমুখী কাজ ঢুকে গেছে এর আওতায়। বিশেষ করে ভারতের মতো বৃহৎ দেশে অপ্রথাগত কাজকর্মের বৈচিত্র বলে শেষ করা যায় না। সেইসঙ্গে প্রথাগত উদ্যোগে নানারকম 'অপ্রথাগত' লেনদেনে জড়িয়ে পড়ছে। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে তৈরি হচ্ছে ধোঁয়াশা। তার ওপর পরিচর্যামূলক বা গৃহস্থালির মতো পারিশ্রমিকবিহীন কাজে যারা নিযুক্ত তাদের কি দেওয়া উচিত অপ্রথাগত কর্মীর স্বীকৃতি? যে দেশের ৯০ শতাংশ কর্মীর গায়েই 'অপ্রথাগত তকমা' রাজনৈতিক রক্ষণশীলতা কাটিয়ে তাদের কতটা সুরাহা দেওয়া যাবে? আলোচনায় **সুপ্রিয় রাউত।**

গত এক দশক ধরে শিক্ষাবিদ ও নীতি রচয়িতাদের কাছে সমানভাবে নতুন করে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে অপ্রথাগত অর্থনীতি (বিশেষ করে ১৯৭০-এর দশকের পর এই বিষয়ের ওপর আগ্রহটা বিশেষভাবে চোখে পড়ছে)। যা কিছু অপ্রথাগত তা নিয়ে যে এই নতুন করে আগ্রহ তার পুরোভাগে রয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন, আইএলও) এবং ভারত। এদিকে ১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিকে অপ্রথাগত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আইএলও-এর প্রাথমিক আগ্রহ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে ২০০০ সালের প্রথম দশকের প্রথম পর্বে এক সাবধানি পদক্ষেপে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, ভারত সরকার এই সমস্যার প্রতি মনোযোগ দেয় অনেক দেরিতে। মাত্র ২০০৪ সালে অসংগঠিত ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলির জন্য একটি জাতীয় কমিশন (ন্যাশনাল কমিশন ফর এন্টারপ্রাইজেস ইন দ্য আনঅর্গানাইজেড সেক্টর) গঠন করা হয়।

দেরি করে শুরু হলেও দেশের অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের জন্য সংসদ একটি সামাজিক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করেছে। দেশের অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের দুর্দশা মোচন ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই 'অসংগঠিত শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষা আইন ২০০৮'-এর লক্ষ্য। ইতিমধ্যে আইএলও অপ্রথাগত থেকে প্রথাগত অর্থনীতিতে পর্যান্তরের এক নীতি রচনার (খুব সম্ভবত এক নথি তৈরি) প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

বিশ্বজুড়ে (যারা বেশির ভাগই দক্ষিণের বাসিন্দা) সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকের সঙ্গে জড়িত আইএলও-এর এই উদ্যোগটি নিয়ে ভাবা দরকার। ভারতের ক্ষেত্রে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল ৯০ শতাংশেরও বেশি কর্মীর প্রত্যেককে অপ্রথাগত থেকে প্রথাগত ক্ষেত্রে যাওয়ার ব্যাপারে প্রেক্ষাপট এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে।

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার আগে বুঝে নেওয়া দরকার 'অপ্রথাগত' বলতে ঠিক কী বোঝায়? এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে 'অপ্রথাগত' এই ধারণাটির তত্ত্বগত এবং নীতি-সম্পর্কিত কার্যকারিতা বিশ্লেষণের পাশাপাশি কর্মীদের প্রেক্ষাপট থেকে এই ধারণাটি একটু সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করছি। 'অপ্রথাগত' এই সীমারেখার মধ্যে আমি পারিশ্রমিকবিহীন কাজকে সামাজিকভাবে মূল্যবান কাজের স্বীকৃতি দিয়ে একে অপ্রথাগত কাজের একটি শ্রেণি বলে গণ্য করার প্রস্তাব করছি। যাইহোক, নীতিগত ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের প্রতিটি শ্রেণির ওপর আমাদের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন এবং নীতি-রচনার প্রক্রিয়ায় কর্মীদের স্বার্থকেই সবচেয়ে প্রাধান্য দেওয়া দরকার।

প্রথাগত গঠন এবং অপ্রথাগত ক্ষেত্রের ধারণা

ঘানা-তে ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ কীথ হার্টের সমীক্ষা থেকে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের ধারণাটিকে বেশ চটজলদিই গ্রহণ করেছে (বলা ভালো জনপ্রিয় করে তুলেছে) আইএলও। ব্রিটেন (ইউকে) থেকে ঘানায় এসেছিলেন হার্ট। ব্রিটেন যেখানে সমস্ত শিল্প আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের অধীনে উন্নততর আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে বাঁধা থাকে সেখানে ঘানার মতো দেশে যে ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হয় তা হার্ট-এর কাছে বেশ অদ্ভুত ঠেকেছিল। ঘানার শহরাঞ্চলে পথ-বিক্রেতা, বা অন্যান্য ঠিকে মজুরদের কাজকর্মকে তিনি যখন 'অপ্রথাগত' আখ্যা দিয়েছিলেন তখন তাঁর অভিজ্ঞতায় ব্রিটেন এবং অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী দেশগুলির উদাহরণই কাজ করছিল। তাঁর

মতে, ঘানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেহেতু ব্রিটেনের শিল্পের মডেলের নির্দিষ্ট গঠনের সঙ্গে খাপ খায় না তাই সেই সমস্ত কর্মকাণ্ড 'অপ্রথাগত' (হার্ট ২০০৬; ২১-২৩)।

এইভাবেই একটা গঠনের মতবাদ থেকেই জন্ম নিয়েছে 'অপ্রথাগত'—এই ধারণা যদিও এখানে 'গঠন' বলতে এক ধরনের বিশেষ গঠনের কথাই বলা হয়েছে। যে বিশেষ ধরনের গঠনের ভিত্তিতে 'অপ্রথাগত' ধারণাটি গড়ে উঠেছে তা কিন্তু শুধুমাত্র একটা আঙ্গিক বা মডেল মাত্র। এই মডেল হল—সুস্পষ্টভাবে শনাক্তকরণযোগ্য নিয়োগকারী ও কর্মচারীর সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নির্দিষ্ট কর্মস্থল, তথা অধিকার ও কর্তব্যভিত্তিক এবং সরকারি তত্ত্বাবধানে চলা এবং একটি সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ সময়ে গঠিত এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মডেল। তখনকার এবং এখনকার গুরুত্বপূর্ণ অনেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই সেই সমস্ত সংগঠিত কাজের মডেলের সঙ্গে খাপ খেত না এবং এখনও খাপ খায় না। ওই মডেলে আজকের বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মীর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে না (আগেও ঘটত না)। তাহলে কি আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোব যে 'অপ্রথাগত' ধারণাটি কোনও মতাদর্শগত এবং নীতি-সংক্রান্ত কোনও উদ্দেশ্য পূরণ করে না?

এই ধারণার মধ্যে নিহিত এক পূর্ব পক্ষপাতদুষ্টতা এবং নেতিবাচক (যেমন প্রথাগত নয়) আভাস সত্ত্বেও এই অপ্রথাগত ধারণাটিকে শিক্ষা বা নীতি সংক্রান্ত পরিসর থেকে বাদ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। 'অপ্রথাগত' ধারণাটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণ করে। এর প্রথম এবং প্রধান কার্যকর উদ্দেশ্যটি যুক্ত রয়েছে এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নেতিবাচক ধারণার সঙ্গেই। তত্ত্বগতভাবে যখন কোনও বিষয়কে প্রথাগত নয়, বা অস্বাভাবিক বলে তকমা দিয়ে দেওয়া হয় তখন তার মধ্যে একটা অদ্ভুত চালিকাশক্তি চলে আসে। ভারতের শ্রমিক শ্রেণির ৯০ শতাংশই অপ্রথাগত ক্ষেত্রে নিযুক্ত এই বিবৃতিই যেন একটা 'বিপদ ঘণ্টি'র মতো শোনায়। এই সব তত্ত্ব বা আলংকারিক কথাবার্তা অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে। এক্ষেত্রে 'অপ্রথাগত' ধারণাটি ভীষণভাবেই উপযোগী। দ্বিতীয়ত, অপ্রথাগত ধারণাটি আবার সুবিধাপ্রাপ্ত এবং নিরাপত্তাহীন শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্যও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তৃতীয়ত, এই ধারণা একটা আদর্শের কথা তুলে ধরে—ঠিক কী ধরনের গঠন বা আঙ্গিকের পথে আমাদের যাত্রা করতে হবে (যদি সেই গঠনটিকেই নিয়েও নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে হয় তাহলেও)। চতুর্থত, শিক্ষা-গবেষণা সংক্রান্ত আলোচনাও প্রতিবাদী আন্দোলন স্তরে এটি এগিয়ে চলার একটা ভাষা জোগায়। আর, সর্বোপরি অপ্রথাগত ধারণাটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে নীতি সংক্রান্ত কর্মসূচি তৈরিতে সাহায্য করে।

যাই হোক না কেন, কোনও নীতির নির্ধারক হিসাবে 'অপ্রথাগত' ধারণাটিকে গ্রহণ করার সবচেয়ে বড় সমস্যা এখানেই যে এই ধারণা যতটা প্রকাশ করে তার চেয়েও বেশি ধোঁয়াশায় ঢেকে রাখে। অপ্রথাগত কাজকর্ম যে কত ধরনের এবং কত বিচিত্র হতে পারে তা আমাদের ধারণারও বাইরে! বিশেষ করে ভারতের মতো বৃহৎ দেশে অপ্রথাগত কাজকর্মের বৈচিত্র্যের শেষ নেই। তার সঙ্গে ভারতের প্রথাগত উদ্যোগগুলিও অপ্রথাগত লেনদেন ও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ায় 'অপ্রথাগত' ধারণাটির মধ্যে নানান ধরনের অপ্রথাগত কাজকর্মকে ঐক্যবদ্ধ করা আরও জটিল হয়ে পড়েছে। নীতি সংক্রান্ত স্বার্থে 'অপ্রথাগত' ধারণাটির ধোঁয়াশা কাটানো প্রয়োজন এবং এই ধরনের কাজকর্মের বৈচিত্র্য বা অসমসত্ত্ব চরিত্রকে স্বীকার করে নেওয়া দরকার। এই অসমসত্ত্ব চরিত্র বা বৈচিত্র্যের স্বীকৃতির জন্য 'অপ্রথাগত' ধারণাটি যথাযথ নয়।

অপ্রথাগত ধারণাটি নিয়ে দ্বিতীয় সমস্যাটির সূত্রপাত এই শব্দ বা পরিভাষাটির অর্থোদ্ধার করা নিয়ে; যখন 'অপ্রথাগত' এই পরিভাষাটি ব্যবহার করা হবে তখন একজন তার কী অর্থ উদ্ধার করবে? এটা কি কোনও ক্ষেত্র; অর্থনীতি নাকি কর্মসংস্থান? বহুদিন ধরে একটি ক্ষেত্র অর্থাৎ অপ্রথাগত উদ্যোগের ধারণা নিয়েই আইএলও-এর চিন্তাভাবনা পরিচালিত হয়েছে। তার পরবর্তী সময়ে আইএলও অপ্রথাগত অর্থনীতি এবং অপ্রথাগত কর্মসংস্থানের মাপকাঠিগুলি বেঁধে দিয়েছে। অর্থনীতির অপ্রথাগত অংশের উৎপাদনশীলতা নির্ধারণ করা তথা দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর অবদান পরিমাপ করার লক্ষ্যে যখন অপ্রথাগত অর্থনীতির ধারণাটিকে প্রথাগত অর্থনীতির পাশে বসানো হয়েছে, তখন দেখা গেছে অপ্রথাগত কর্মসংস্থানের ধারণা অর্থনীতির প্রথাগত-অপ্রথাগত—দুটি ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রথাগত বা অপ্রথাগত অর্থনীতিতে (বা ক্ষেত্র) তাদের নিয়োগ নির্বিশেষে শ্রমিকরা যে বিচিত্রমুখী কাজকর্ম (অপ্রথাগত) করছেন সে সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়ার জন্যই অপ্রথাগত কর্মসংস্থানের মতের প্রচলন হয়। ভারতে, নীতি সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে একথা বলা দরকার যে আমরা যদি আমাদের সংবিধান ও তার মূলনীতির প্রতি নিষ্ঠাবান থাকতে চাই তাহলে অপ্রথাগত শ্রমিক এবং তাদের কাজের পরিবেশ ও শর্তের ওপর বিশ্লেষণী মনোযোগ দিতে হবে। নীতিগত উদ্যোগে শ্রমিকদের সামগ্রিক কল্যাণ—তাদের কাজের পরিবেশ, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, শিক্ষা এবং আয় (অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে) ইত্যাদি বিষয়গুলির সুরাহা থাকা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অপ্রথাগত কর্মসংস্থানের ধারণা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে ঠিক একইসঙ্গে অপ্রথাগত কর্মসংস্থানের ধারণার মধ্যে কিছু নিয়ন্ত্রণও রয়েছে। এই ধারণার মধ্যে একটা কথাই রয়েছে যে বিভিন্ন ধরনের 'অর্থনৈতিক' কর্মকাণ্ড যেগুলো কিনা প্রথাগত নয়—এখানে জোর দেওয়া হচ্ছে, 'অর্থনৈতিক' শব্দটির ওপর। 'অপ্রথাগত' এটি যে শুধু অর্থনীতির সমস্যা নয় বৃহত্তর সামাজেরও সমস্যা এই প্রকৃত সত্যটা এই ধরনের বোঝাপড়ার ফলে আমরা ভুলে যাচ্ছি।

অপ্রথাগত : অর্থনীতির বাইরে একটি সামাজিক সমস্যা

একটি বিশেষ আঙ্গিকের বিপরীত প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে অপ্রথাগত ধারণাটি জন্ম নিয়েছে—আর সেই বিশেষ গঠন বা আঙ্গিকটি শিল্প বিপ্লবের ফসল যা শিল্পের ওপর আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে এবং যা অবশ্যই লাভজনক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা বলে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই, 'অপ্রথাগত' ধারণাটিও এরপর উৎপাদনশীল বা (লাভজনক) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল। যেভাবেই হোক, শ্রমিকদের (অপ্রথাগত) কাজকর্ম যদি আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়, তবে সেই কাজকর্মকে যে সবসময় অর্থনৈতিকই হতে হবে তার কোনও মানে নেই। অর্থনৈতিক নয় এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মও রয়েছে এর মধ্যে—যেমন পরিচর্যার কাজ, গ্রাসাচ্ছাদনের কৃষিকাজ, (কিছু বিশেষ) গৃহস্থালির কাজ এবং বিনা মূল্যের পারিবারিক শ্রম। উপরোক্ত কাজগুলিকে অপ্রথাগত কাজ বলা যায় কিনা তা নিয়ে একটা বিতর্ক থাকলেও প্রধান প্রধান নীতিগত উদ্যোগগুলিতে সাধারণত এই কাজগুলিকে অপ্রথাগত কর্মসংস্থান বলে গণ্য করা হয় না।

অন্য কোনও ভালো শব্দ না থাকায় এবং বোঝার সুবিধার্থে পূর্ববর্তী অংশে আমাকেও অপ্রথাগত শ্রমিকরা কোন কোন ধরনের কাজে যুক্ত তা তুলে ধরতে অপ্রথাগত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শব্দবন্ধটি ব্যবহার করতে হয়েছিল। কিন্তু অবশ্যই অপ্রথাগত ধারণাটি শুধুমাত্র অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা বৃহত্তর সামাজিক এক ঘটনা, যার মধ্যে অর্থনীতিও রয়েছে। তবে আবার অর্থনীতির ধারণার মধ্যে সমাজের ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত না করার ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, অনেক বৃহত্তর একটি ক্ষেত্র (বাজারসহ) এবং বাজার তার একটি অংশ (পোলানয়ি, ২০০১ : ৬০, ৭১-৭৯; হার্ট এবং হান, ২০০৯)। অর্থনীতি বা বাজারই যদি সংশ্লিষ্ট সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত বিষয়ের একমাত্র নির্ধারক হয়ে ওঠে তাহলে আসলে নীতি সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ বেশ সংকীর্ণ হয়ে যায় (স্টিগটিসটজ্ ২০০১)।

অর্থনীতিকে শুধুমাত্র মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়ার বিচারের মাপকাঠি হিসাবে না দেখে একে যদি সমাজের একটি অংশ বলে গণ্য করা হয় তাহলে বিশ্লেষণগতভাবে তা আরও বেশি উপযোগী হবে এবং নীতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও বৃহত্তর পরিসর পাওয়া যাবে (পোলানয়ি, ২০০১:৭৪, ১১৬, প্যারি, ২০০৯)।

আমরা যদি এই ধরনের একটি বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারি তাহলে পরিচর্যামূলক কাজ এবং পারিশ্রমিকবিহীন গৃহস্থালির কাজকে কেন গুরুত্বপূর্ণ অপ্রথাগত কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন তা বোঝাটা সহজ হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে দুটি প্রশ্ন আছে যার উত্তর পাওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, কেন বিনা পারিশ্রমিকের এই কাজগুলিকে অপ্রথাগত তকমা দেওয়া হবে? এবং দ্বিতীয়ত, এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে কেন 'কাজ' বলে স্বীকার করা হবে? হার্ট যখন 'অপ্রথাগত' এই পরিভাষাটি সৃষ্টি করেছিলেন তখন এই ধরনের কর্মীদের কথা তাঁর মাথায় ছিল কি না তা অনুমান করা খুব শক্ত। তিনি অপ্রথাগত বলতে একটি বিশেষ আঙ্গিক বা গঠনের বিপরীত ধরনকে বুঝেছিলেন। সেই বিশেষ আঙ্গিক যদি অনুপস্থিত তবে কোন কাজকে অপ্রথাগত আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই অর্থে, এমন যুক্তি দেওয়া যেতেই পারে যে পারিশ্রমিকবিহীন যে সমস্ত কাজের বর্তমানে কোনও স্বীকৃতি নেই সেগুলি অন্য শ্রেণির অপ্রথাগত কাজ।

বিনা পারিশ্রমিকের সমস্ত কাজকে 'অপ্রথাগত' ধারণাটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার যদিও প্রয়োজন নেই, তবুও, তা করলে এই কাজের প্রতিও যে বিশেষ নীতিগত গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন তা বুঝতে সুবিধা হবে। তবে প্রথাগত কাজের ক্ষেত্রে যে ধরনের নীতিগত গুরুত্ব প্রয়োজন হয়, এক্ষেত্রে সেই ধরনের বা সমতুল্য গুরুত্ব নাও হতে পারে। পারিশ্রমিকবিহীন কাজকে যদি 'অপ্রথাগত' শ্রেণিভুক্ত করাও হয় তবুও এই সমস্ত কাজের বিশেষ ধরনের কথা ভুললে চলবে না এবং সেই মতো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নীতি প্রণয়ন করতে হবে। 'অপ্রথাগত' শ্রেণিটি শুধুমাত্র একটি সর্বব্যাপী ধারণা যার মধ্যে প্রথাগত নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোর বাইরে থাকা সামাজিকভাবে মূল্যবান কাজগুলিকে একত্রিত করা যেতে পারে।

এবারেই ঠিক পরের প্রশ্নটা চলে আসে—পারিশ্রমিকবিহীন কর্মকাণ্ডকে কেন 'কাজ' বলে স্বীকার করতে হবে? পরিচর্যামূলক কাজ বা গৃহস্থালির কাজের মতো বিনা পারিশ্রমিকের কাজ অবশ্যই সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখছে; একে প্রত্যক্ষ আর্থিক অবদান হিসাবে পরিমাপ করা যাবে না এবং তা করার প্রয়োজনও নেই। সমাজকে টিকিয়ে রাখতে এবং সমাজের ক্রমোন্নতিতে এই বিনা পারিশ্রমিকের কাজের অনেক অবদান রয়েছে। যদি সমাজের অন্তর্নিহিত অর্থই হয় একাত্মতা এবং সহমর্মিতা তাহলে বিনা পারিশ্রমিকের অবদানকারীরা যাতে স্বীকৃতি পান তা নিশ্চিত করা সমাজেরই দায়িত্ব। পারিশ্রমিকবিহীন কাজের এই স্বীকৃতি এইভাবে সমাজ এবং সামাজিক অবদানকারীদের বোঝাপড়াভিত্তিক।

বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করা কর্মীরা সামাজিকভাবে মূল্যবান যে অবদান রাখছেন তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমাদের রাষ্ট্রকে একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে। আলাইন সুপিয়ট এবং তাঁর সহকর্মীর প্রস্তাবমতো কর্মীরা যে বাধ্যতামূলকভাবে এই ধরনের বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেন কাজের সেই বাধ্যতামূলক চরিত্রকেই স্বীকৃতিদানের অন্যতম ভিত্তি করা যেতে পারে (সুপিয়ট, ২০০১)। সুপিয়ট এবং অন্যান্যদের মতে, যদি কোনও কর্মকাণ্ড বাধ্যতামূলক দায়িত্বের অঙ্গ হিসাবে পালন করতে হয় তবে তাকে 'কাজ'-এর স্বীকৃতি দিতে হবে। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এই দৃষ্টিভঙ্গি সমানভাবে কার্যকর। তবে এই ধরনের কাজকে কীভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং এই ধরনের কাজে নিযুক্ত মানুষের স্বার্থ কীভাবে রক্ষা করা হবে তা অবশ্য নীতি প্রণেতাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

অপ্রথাগত কাজ এবং পারিশ্রমিকের প্রশ্ন

অপ্রথাগত অর্থনৈতিক কাজকর্ম এবং অর্থনৈতিক নয় এমন অপ্রথাগত কাজকর্মকে আমরা স্বীকৃতি দিই বা না দিই, 'কাজ' হিসাবে এগুলি একটি মতাদর্শগত চ্যালেঞ্জ। আর তাই রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জও বটে। মতাদর্শগতভাবে এই দুই শ্রেণির কাজই সামাজিকভাবে মূল্যবান। তাই সামাজিকভাবে উৎপাদনশীল বা অর্থনৈতিকভাবে অবদানমূলক কাজের সঙ্গে সামাজিকভাবে মূল্যবান কাজকে মিশিয়ে না ফেলার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। পারিশ্রমিকবিহীন অপ্রথাগত কাজের এই

শ্রেণিটিকে স্বীকৃতিদানের মতাদর্শগত প্রশ্নটির মীমাংসা হলে বাস্তবে এই ধরনের কাজের স্বীকৃতিদানের কয়েকটি প্রস্তাবের মুখোমুখি আমাদের হতে হবে।

এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে রয়েছে পরিচর্যা ও গৃহস্থালির কাজের জন্য পারিশ্রমিকের দাবি থেকে শুরু করে অন্যান্য অর্থনৈতিক এবং কর্মসংস্থানের প্রশ্ন নির্বিশেষে সমস্ত পরিবারের আয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি। তবে এর পালটা যুক্তি হিসাবে বলা যায় শুধুমাত্র আর্থিক মজুরি বা পারিশ্রমিক মজুরিবিহীন অপ্রথাগত কাজকে স্বীকৃতিদানের ভিত্তি হতে পারে না। পারিশ্রমিক বা মজুরিবিহীন অপ্রথাগত কাজগুলিকে স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে বাস্তবে অর্থনৈতিক ছাড়া অন্য পন্থাও থাকতে পারে। বিভিন্ন ধরনের অপ্রথাগত কাজকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে এগোনোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার ধারণা তৈরি করার সময় কর্মীদের অভিজ্ঞতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সবার আগে মাথায় রাখতে হবে। কর্মীদের নিজেদের অভিজ্ঞতা তাদের কাজের ধরন ও সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে নীতি প্রণেতাদের কাছে মূল্যবান দলিল হয়ে উঠতে পারে। আবার অন্যদিকে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিশা দেখাতে পারে। অপ্রথাগত কর্মীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ভালোভাবে বুঝলে বিভিন্ন শ্রেণির অপ্রথাগত কর্মীদের স্বীকৃতিদান তথা তাদের কল্যাণ সাধনের নানান পন্থা বেরিয়ে আসবে। এর মধ্যে অর্থনৈতিক নয় এমন পন্থাও রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিকভাবে মূল্যবান (অপ্রথাগত) কাজের স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে নীতি-প্রণয়নের নিম্নলিখিত পন্থাটিই হবে এ ব্যাপারে উপযুক্ত সূচনা।

অপ্রথাগত ক্ষেত্র এবং সরকারিনীতি

মতাদর্শগত সমস্যা এবং রাজনৈতিক রক্ষণশীলতা যদি অতিক্রম করা যায় তাহলে আমাদের নীতি প্রণেতাদের কাছে অন্যতম প্রধান কাজ হবে অপ্রথাগত কর্মীদের নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে আনা। তাদের নিজস্ব নীতি নিয়ম চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে অপ্রথাগত কর্মীদের অংশগ্রহণ করা উচিত। কর্মীদের সামাজিক আলোচনা প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে হবে। কাজের শ্রেণি এবং কর্মীরা যে কাজে নিযুক্ত তার ধরনের উপর নির্ভর করে এই সামাজিক আলোচনা প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে অংশগ্রহণের জন্য কর্মীদের কাছে সবচেয়ে বেশি এবং ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়।

সামাজিক আলোচনা প্রক্রিয়ায় অপ্রথাগত কর্মীদের যুক্ত করে আরও একটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা প্রয়োজন। আমি আগেও আলোচনা করেছি যে, অপ্রথাগত কাজ ধারণাটি শুধুমাত্র একটি সামগ্রিক মতবাদ; বাস্তবে এর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির কর্মীরা এমন ধরনের কাজে নিযুক্ত যার সঙ্গে সেই প্রথাগত আঙ্গিক বা গঠনের কোনও মিল নেই, যে আঙ্গিকের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে 'অপ্রথাগত' ধারণাটি গড়ে উঠেছিল। প্রতিটি বিশেষ শ্রেণির কাজ ও কর্মীদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলি বোঝার জন্য প্রতিটি শ্রেণিকে একদম নতুন ও বিশেষ ঘটনা হিসাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। অপ্রথাগত কাজের বিচিত্র ধরনের ফলে নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিকেন্দ্রীকরণ জরুরি। আমাদের সংবিধানের আইনি ক্ষমতার ভারসাম্যের যে বিধান আছে সেই অনুযায়ী আমাদের শাসনব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীভূত নীতি প্রণয়নের ধারণা (আইনি বা প্রশাসনিক) নতুন নয়।

এই নিবন্ধে, 'অপ্রথাগত' ধারণাটির বিশ্লেষণ করে আমি দেখিয়েছি যে, এই ধারণাটি সর্বব্যাপী বা সামগ্রিক অর্থে কার্যকরী। বিভিন্ন শ্রেণির অপ্রথাগত কর্মীদের দুর্দশা লাঘব করার জন্য 'অপ্রথাগত' এই সর্বব্যাপী তকমাটির ধোঁয়াশা কাটিয়ে কাজের প্রতিটি শ্রেণিকেই নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ চ্যালেঞ্জ হিসাবে ধরতে হবে। আর এক্ষেত্রে সামাজিক আলোচনা প্রক্রিয়া ওই বিশেষ গোষ্ঠীর অপ্রথাগত কর্মীদের যুক্ত করতে হবে যাতে কর্মীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার খাতিরেই পরিচালন প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে উঠতে পারে। আমাদের সংবিধানের মহৎ আদর্শ ঠিক এই ধরনের পরিচালন ব্যবস্থার কথাই বলে।❑

[লেখক কানাডার 'ইন্টারইউনিভার্সিটি রিসার্চ সেন্টার অন গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ওয়ার্ক'-এ গবেষক। email : supriyonujs@ gmail.com]

ভারতের অপ্রথাগত ক্ষেত্র

প্রথাবহির্ভূত বা অপ্রথাগত ক্ষেত্রের নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এদেশে এই ক্ষেত্রের আজ বাড়বাড়ন্ত। কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কর্মহীনতা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে দেশি, বিশেষ করে বিদেশি শিল্প সংস্থাগুলির প্রসার এবং তাঁদের মধ্যে কম খরচে, নিরাপত্তা দান ও দায়-দায়িত্বের ভারবিহীন শ্রমিক নিয়োগের প্রবণতা থাকার দরুন এই ক্ষেত্রটি ক্রমশই ফুলে ফেঁপে উঠছে। প্রথাগত এই ক্ষেত্রের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এই নিবন্ধে **অনিন্দ্য ভুক্ত।**

এর জন্য কোনও তত্ত্বকথার প্রয়োজন নেই। চর্মচক্ষেই সব চাক্ষুষ করা যাচ্ছে। গ্রামগুলি আর সেই গ্রাম থাকছে না, শহরগুলি হয়ে উঠছে বিপণন কেন্দ্র। ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা সাঙ্গ করে কিছুদিন চাকরি-বাকরির বৃথা চেষ্টা করার পর রাস্তার ধারে একটা করে গুমটি খুলে বসে পড়ছে। কেউ চিরাচরিত পান-বিড়ি-গুটখার দোকান, কেউ বা মোবাইল রিচার্জের আধুনিক গুমটি। স্বনিযুক্ত, স্বশাসিত। অর্থনীতির সংজ্ঞা অনুযায়ী এরা প্রথাবিরুদ্ধ বা অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী। এরা শ্রমিক না মালিক তা নিয়ে বিতর্ক আছে। অতএব কর্মী বলাই ভালো।

এই সব কর্মীর সংখ্যা এদেশে অগণিত। সেই সংখ্যাটা ক্রমশ বাড়ছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দপ্তর (ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অফিস)-এর বিভিন্ন রিপোর্টেও সেকথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভারতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের কোনও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দপ্তর বা ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং-এর মতো সংস্থায় যারা কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে, প্রত্যেকেই নিজেদের প্রয়োজনমাফিক একটি সংস্থা তৈরি করে তথ্য সংগ্রহ করে (নায়ক, ২০০৯)। অথচ ১৯৯৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ লেবার অর্গানাইজেশন-এর পঞ্চদশ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (আইএলও), অপ্রথাগত ক্ষেত্রের পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুসরণের কথা বলেছিল। রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যান কমিশন (ইউনাইটেড নেশনস স্ট্যাটিসটিক্যাল কমিশন) এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইউনাইটেড নেশনস ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল) এই সংজ্ঞাকে অনুমোদন দেয় এবং ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রসংঘ বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য যে 'সিস্টেম অফ ন্যাশনাল অ্যাকাউন্ট'-এর সুপারিশ করে তার অন্তর্ভুক্ত করে।

কিন্তু এর পরেও ভারতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা গড়ে না ওঠায় 'ন্যাশনাল কমিশন ফর এন্টারপ্রাইজেস ইন দ্য আনঅর্গানাইজড সেক্টর' একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করে। এই টাস্ক ফোর্স অপ্রথাগত ক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা অনুযায়ীই ভারতের অপ্রথাগত ক্ষেত্রটি চিহ্নিত করার চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিক সংজ্ঞায় অপ্রথাগত ক্ষেত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল এই ক্ষেত্রে নিযুক্তির সংখ্যাটি খুব কম হবে, এরা কোনও আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ হবে না, এরা খুব নিয়মমাফিক হিসেবপত্র রক্ষা করবে না ইত্যাদি। এগুলির কথা মাথায় রেখে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের যে সংজ্ঞাটির উল্লেখ করা হয় সেই সংজ্ঞানুযায়ী—ব্যক্তি বা পারিবারিক মালিকানাভিত্তিক, অবিধিবদ্ধ সেই সমস্ত সংস্থাকেই অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে যাদের কর্মী সংখ্যা দশের কম। এই মালিকানা একক বা অংশীদারিযুক্ত হতে পারে এবং এই সব সংস্থা উৎপাদন ও বাণিজ্য, উভয় প্রকার কাজেই লিপ্ত থাকতে পারে। বিধিবদ্ধ না হওয়ায় এরা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বা সংগঠিত বাজারে ব্যবসা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, এমনকী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোনও প্রশিক্ষণ কর্মশালাতে যোগদানের সুযোগও এরা পায় না।

তবে ভারতে এই সংজ্ঞা ব্যবহারের একটি অসুবিধেও আছে। এই সংজ্ঞা কৃষি ও অ-কৃষি উভয় ক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য হবার কথা। কিন্তু ভারতের কৃষিক্ষেত্রে 'সংস্থা'র ধারণাটিই নেই। ফলে কৃষিক্ষেত্রে যে বিপুল সংখ্যক অপ্রথাগত কর্মী কাজ করে তাদের তাহলে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের আওতা থেকে বাদ দিতে হয়। এই অসুবিধা এড়ানোর জন্য কৃষিক্ষেত্রের প্রতিটি খামারকেই, তা তার জোতের আয়তন যাই হোক না কেন, অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বাগিচাশস্যের (যেমন চা, কফি) খামারগুলিকে বাদ রাখার কথা বলা হয়েছে। কারণ এই ধরনের খামারগুলি যেমন আকারে বড় তেমনি এগুলি আইন (প্ল্যানটেশন লেবার অ্যাক্ট, ১৯৫১) দ্বারা বিধিবদ্ধও বটে।

অপ্রথাগত ক্ষেত্রের ধারণাটির সঙ্গে অপ্রথাগত শ্রমের ধারণাটির প্রভেদ আছে। প্রথাগত শ্রম বলতে বোঝানো হয় সেই সমস্ত শ্রমিককে যারা শ্রমের আইনগত অধিকার ভোগ করে এবং নানাবিধ সামাজিক সুরক্ষা ভোগ করে কিন্তু এই বৃত্তের বাইরে যারা আছে তারা তাহলে নিশ্চয়ই অপ্রথাগত শ্রমের উদাহরণ। যেমন যারা লোকের বাড়িতে

ভৃত্যের কাজ করে বা বাগানের মালির কাজ করে তারা সবরকম সুরক্ষা বৃত্তের বাইরে। এরা আবার কৃষি বা অ-কৃষি কোনও ক্ষেত্রেই কোনওরকম 'সংস্থা'র সঙ্গে যুক্ত নয়। এই রকম উদাহরণ আরও আছে। এই কারণেই অপ্রথাগত ক্ষেত্রের সংজ্ঞার পাশাপাশি 'ন্যাশনাল কমিশন ফর এন্টারপ্রাইজেস ইন দ্য আনঅর্গানাইজড সেক্টর' অপ্রথাগত শ্রমের ধারণাটির পৃথক সংজ্ঞা তৈরি করেছেন। এই সংজ্ঞানুযায়ী যারা গৃহস্থ ক্ষেত্রে কাজ করে তারা, অপ্রথাগত ক্ষেত্রের প্রথাগত কর্মী ব্যতীত অন্যান্য কর্মী এবং প্রথাগত ক্ষেত্রে কাজ করেও যারা শ্রমের আইনগত অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত তারা, অপ্রথাগত শ্রমিক। অর্থাৎ অপ্রথাগত শ্রমের অস্তিত্ব যেমন অপ্রথাগত ক্ষেত্র ছাড়া প্রথাগত ক্ষেত্রের মধ্যেও পাওয়া যাবে, তেমনই প্রথাগত ক্ষেত্রের মধ্যেও আছে অপ্রথাগত শ্রম। বস্তুত ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রথাগত ক্ষেত্রের মধ্যে অপ্রথাগত শ্রমের পরিমাণের ক্রমাগত বৃদ্ধিই ইঙ্গিত দিচ্ছে কোন পথে বর্তমানে কর্মহীনতার সমস্যাটির সমাধান হচ্ছে।

ভারতের শ্রমবাহিনীর মোট যে আয়তন এমনিতেই তার অধিকাংশ বলতে গেলে প্রায় সবটাই অপ্রথাগত শ্রম। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দপ্তরের ৬১তম সমীক্ষার তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ২০০৪-০৫ সালে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৪৫.৭৫ কোটি, যার মধ্যে অপ্রথাগত ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা ৩৯.৫০ কোটি। এর পরেও প্রথাগত ক্ষেত্রটিতে কিন্তু অপ্রথাগত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। ক্যাজুয়াল লেবার, কন্ট্রাকচ্যুয়াল লেবার ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত হয়ে অপ্রথাগত শ্রমিকের দল ভিড় বাড়াচ্ছে প্রথাগত ক্ষেত্রটিতে। ২০০৪-০৫ সালের একই সমীক্ষার তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে অপ্রথাগত ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা ৩৯.৫ কোটি হলেও অর্থনীতিতে মোট অপ্রথাগত শ্রমিকের সংখ্যা ৪২.২৬ কোটি। অর্থাৎ মোট শ্রমবাহিনীর সাপেক্ষে অপ্রথাগত ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা ৮৬ শতাংশের মতো হলেও অপ্রথাগত শ্রমিকের সংখ্যা ৯২ শতাংশের মতো, যার অর্থ আবার বাড়তি এই ৬ শতাংশের মতো শ্রমিক এসেছে প্রথাগত ক্ষেত্র থেকে। এরাই সেই তথাকথিত ক্যাজুয়াল বা কন্ট্রাকচ্যুয়াল লেবারের দল।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই যে ঘটনা ঘটছে, যাকে সাময়িকীকরণ (ক্যাজুয়ালাইজেশন) বলা হচ্ছে, স্পষ্টতই সেটি শ্রমের জোগান বাড়ার ফলশ্রুতি। শ্রমের জোগান বাড়ছে তার প্রথম কারণ তো অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ ভারতের জনভিত্তিটি স্বাভাবিকভাবেই বড়। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যত কমই হোক না কেন প্রতি বছর জনসংখ্যার মোট পরিমাণটি অনেকটাই বাড়ে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই বাড়ছে শ্রমবাহিনীর আয়তনও। এছাড়া শ্রমবাহিনীর আয়তন বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ শ্রমবাহিনীতে মহিলা কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি। আগে মেয়েরা এদেশে কাজের জগতে তেমন আসত না, এখন যতটা আসছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার একটি হিসেব বলছে ২০০০ সালের পর থেকে কেবল মহিলা কর্মীর সংখ্যাই বেড়েছে ২.৫৯ কোটি। প্রসঙ্গক্রমে তৃতীয় আরেকটি কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারত বর্তমানে বার্ধক্যের সমস্যায় ভুগছে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'এজিং'। সব দেশকেই কোনও না কোনও সময় এই সমস্যায় পড়তে হয়। সেই সময় জনসংখ্যার একটা বড় অংশ বার্ধ্যকে পৌঁছে যায়। মোট জনসংখ্যায় কর্মক্ষম মানুষের অনুপাত কমে যায়। এই মুহূর্তে এমন ঘটনায় ভারতের সুবিধাই হবার কথা ছিল, কেননা এর ফলে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা কমে। কিন্তু সুবিধার পরিবর্তে এই ঘটনা শ্রমের সাময়িকীকরণের প্রবণতা আরও বাড়িয়ে তুলছে। একটি হিসাব বলছে সাম্প্রতিকালে প্রতিদিন ১৩০০০ ভারতীয় ষাটে পৌঁছেছে। এদের মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ তাদের বার্ধক্যের জন্য সঞ্চয় রাখে (জ্যাকব ২০১১)। ফলে বাকিরা বাধ্য হয়ে সাময়িক কাজের জগতে ঢুকছে।

কারা অপ্রথাগত শ্রমিক

ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রক চারভাবে অপ্রথাগত শ্রমিকের হিসেব করার কথা বলেছেন। প্রথমত জীবিকার দিক থেকে দেখতে গেলে এরা হল : ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, ভাগচাষি, জেলে, বিড়ি শ্রমিক, হাঁস-মুরগি চাষ করে যারা, নির্মাণ ক্ষেত্রে কাজ করে যারা, মুচি, তাঁতি, মিস্ত্রি, ইটভাটা, পাথরখাদান, কাঠচেরাই কল তেলকল প্রভৃতিতে কাজ করে এমন শ্রমিক ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, কাজের প্রকৃতির দিক থেকে দেখতে গেলে এরা হল : কৃষি শ্রমিক, বাঁধা মজুর, পরিযায়ী শ্রমিক, বিভিন্ন ধরনের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ও সাময়িক কর্মী প্রভৃতি। তৃতীয়ত, বিশেষভাবে দুর্দশাগ্রস্ত শ্রেণির মধ্যে যারা পড়ে, যেমন মুটে, ধাঙড়, গোরু বা ঘোড়ার গাড়ির চালক, যারা হোটেল বা বারে মদ পরিবেশন করে, যারা গাড়িতে মাল ওঠানো নামানোর কাজ করে ইত্যাদি। চতুর্থত, পরিষেবা প্রদানের প্রকৃতির দিক থেকে দেখতে গেলে এরা হল : গৃহভৃত্য, নাপিত, আনাজবিক্রেতা, খবরের কাগজ বিক্রেতা, ধাইয়ের কাজ করে যারা প্রভৃতি।

সারণি-১
প্রথাগত ও অপ্রথাগত কর্মীর শ্রেণি বিন্যাস

(দশ লক্ষের হিসাবে)

ক্ষেত্র	লিঙ্গ	অপ্রথাগত কর্মী		প্রথাগত কর্মী		মোট	
		১৯৯৯-০০	২০০৪-০৫	১৯৯৯-০০	২০০৪-০৫	১৯৯৯-০০	২০০৪-০৫
	পুরুষ	১৮৬.১৭	২০৯.০১	১০.৫৭	১০.০৩	১৯৬.৭৪	২১৯.০৪
	নারী	১০১.৭১	১২১.৬০	২.৩১	২.৪৩	১০৪.০২	১২৪.০৩
	মোট	**২৮৭.৮৭**	**৩৩০.৬২**	**১২.৮৮**	**১২.৪৫**	**৩০০.৭৫**	**৩৪৩.০৭**
	পুরুষ	৫৮.৩৩	৭১.৬০	১৮.৭২	১৮.৮০	৭৭.০৫	৯০.৪০
	নারী	১৫.৫৩	২০.৪০	৩.৪৩	৩.৬০	১৮.৯৬	২৪.০০
	মোট	**৭৩.৮৭**	**৯১.৯৯**	**২২.১৪**	**২২.৪০**	**৯৬.০১**	**১১৪.৪০**
	পুরুষ	২৪৪.৫০	২৮০.৬১	২৯.২৮	২৮.৮৩	২৭৩.৭৮	৩০৯.৪৪
	নারী	১১৭.২৪	১৪২.০০	৫.৭৪	৬.০৩	১২২.৯৮	১৪৮.০৩
	মোট	**৩৬১.৭৪**	**৪২২.৬১**	**৩৫.০২**	**৩৪.৮৫**	**৩৯৬.৭৬**	**৪৫৭.৪৬**

উৎস : জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দপ্তরের ৫৫তম (১৯৯৯-০০) ও ৬১তম (২০০৪-০৫) সমীক্ষা

অর্থনৈতিকবিদদের একটা বড় অংশের মতে শ্রমের সাময়িকীকরণের মাধ্যমে অপ্রথাগত শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ বাজার অর্থনীতির প্রবর্তন ও প্রসার। এদেশে বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের পর একদিকে যেমন শ্রমের সচলতা বেড়েছে অন্যদিকে তেমনি বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছে এবং সেই সূত্রে ভারতের মাটিতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির অনুপ্রবেশ বেড়েছে। এই সব বিদেশি কোম্পানি একটিই জিনিস বোঝে, মুনাফা। ফলে তারা চায় সস্তার শ্রম, এমন শ্রম যার সামাজিক সুরক্ষা বা ভবিষ্যতের দায়, কোনওটিই তাদের নিতে হবে না। ফলে সাময়িক শ্রম, চুক্তিবদ্ধ শ্রমের পরিমাণ বাড়ছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে এই ব্যাপারে আরও সুবিধা করে দিচ্ছে অধিকতর সংখ্যায় মহিলা শ্রমিকের কাজের জগতে প্রবেশ। আমাদের দেশের সামাজিক কাঠামোর কারণে মহিলাদের স্বাভাবিক পছন্দটা থাকে সাময়িক কাজের দিকে, কারণ তাতে বাইরের কাজ আর ঘরের কাজ দুটোই একসঙ্গে সামলানো যায়। ফলে স্বাভাবিক কারণেই প্রথাগত ক্ষেত্রেও অপ্রথাগত শ্রমের পরিমাণ বাড়ছে।

বাজার অর্থনীতির প্রসার ঘটলে সে তো সস্তার শ্রমের খোঁজ করবেই। তাকেই আটকে রাখার দায়িত্ব শ্রমিক সংগঠনগুলির। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলিও আস্তে আস্তে তার ধার ও ভার হারিয়ে ফেলছে। এর একটা বড় কারণ দুর্নীতি, শ্রমিক নেতারা মালিকপক্ষের কাছে নিজেদের বিক্রি করে দিচ্ছেন। ফলে দর কষাকষির বৈঠকে তাদের গলার জোর হারিয়ে যাচ্ছে। নেতাদের এই অবস্থা দেখে সাধারণ কর্মীরা সংগঠন ব্যাপারটার উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলছে। ফলে কার্যত কোনও প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়ে মালিকপক্ষের তরফে অবাধে চলছে সাময়িক নিয়োগ, চুক্তি নিয়োগ। আর কোনও সংস্থায় স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা যত কমছে তত কমছে শ্রমিক সংখ্যাগুলির লড়াইয়ের সামর্থ্য। অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটা চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে।

ভয় হয় ঠিক এই জায়গাটিতেই। ভয় হয় কাজের এই সাময়িকীকরণ কি আমাদের এক নতুন সামাজিক বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দিচ্ছে? সাময়িকীকরণের এই ঘটনা বেশি ঘটছে নগর-অর্থনীতিতে। শিল্প ও পরিষেবার জগতে। অপ্রথাগত শ্রমের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি কৃষিক্ষেত্রটিতে। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে সাময়িকীকরণের প্রবণতাটি তুলনামূলকভাবে কম। নগর অর্থনীতিতে এমনিতেই আয় বৈষম্যের মাত্রাটি বেশি। ফলে এক ধরনের সামাজিক অস্থিরতা সেখানে কাজ করেই। সাময়িকীকরণ এই বৈষম্যে আরেকটি নতুন মাত্রা যোগ করছে। যোগ্যতা, দক্ষতা এক হওয়া সত্ত্বেও একদল শ্রমিক প্রথাগত কাজের বৃত্তে থাকার জন্য যে সব সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে অন্যরা তা পাচ্ছে না স্রেফ অপ্রথাগত ক্ষেত্রের সদস্য হবার জন্য। বলাবাহুল্য এই ঘটনা যে ক্ষোভের সঞ্চয় করছে তা একদিন অন্য এক সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্ম দেবে।❑

তথ্য সূত্র :

১. জ্যাকব, টমি (২০১১); দি আনঅর্গানাইজড সেক্টর ইন ইন্ডিয়া; www.india.org

২. নায়ক, অজয়া কুমার (২০০৯); ইনফর্মাল সেক্টর অ্যান্ড ইনফর্মাল ওয়ার্কার ইন ইন্ডিয়া; www.iariw.org

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

বিশ্বজুড়ে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের একটি চালচিত্র

অপ্রথাগত ক্ষেত্র—শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলিই নয় আজ উন্নত দুনিয়াতেও কর্মসংস্থানের একটা বড় উৎস। তাই নীতিপ্রণেতা ও গবেষকদের কাছে এই ক্ষেত্র আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুও বটে। তবে উন্নয়নশীল দুনিয়ায় দরিদ্র মানুষের কাছে এই ক্ষেত্র যেমন 'অস্তিত্বের প্রশ্ন', উন্নত বিশ্বে অবশ্যই তা নয়। ১৯৭০-এর দশকের উন্মেষপর্ব থেকে পার হয়ে, আশি, নব্বইয়ের দশক অতিক্রম করে অপ্রথাগত ক্ষেত্র এখন রীতিমতো বর্ধিষ্ণু এক ক্ষেত্র। সেই সঙ্গে এই ধরনের উদ্যোগগুলি লাভজনক বটে। শুধু কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেই নয় বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নয়নশীল দেশগুলির জিডিপি-তে এই ক্ষেত্রের অবদানও বাড়ছে। প্রথাগত গ্রাসাচ্ছাদনমূলক কর্মকাণ্ড থেকে আজকে লাভজনক উদ্যোগ অপ্রথাগত উদ্যোগের দীর্ঘযাত্রা পথের আলোচনা এই নিবন্ধে। লিখছেন **অসীমা মজুমদার।**

গত শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বিভিন্ন সমীক্ষা ও গবেষণা থেকেই অপ্রথাগত ক্ষেত্রের ধারণার তত্ত্বগত ভিত্তি গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত সমীক্ষা ও গবেষণায় 'দ্বৈতবাদ' বা 'দ্বৈত অর্থনীতির' উপস্থিতিকে উন্নয়নশীল দেশগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে জোর দেওয়া হয়েছে। যাঁরা এই জোর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লিউইস, ফেই-র‍্যানিস এবং হ্যারিস-টোডারো। একদিকে লিউইস এবং ফেই-র‍্যানিস উন্নয়নশীল অর্থনীতিকে গ্রামীণ এবং নাগরিক—এই দুটি ক্ষেত্রে ভাগ করেছেন। আবার অন্যদিকে, হ্যারিস-টোডারো নাগরিক ক্ষেত্রের মধ্যেও এই বিভাজন দেখেছেন। অতীতে দ্বৈতবাদের তত্ত্ব নিয়ে ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে আবার নতুন করে আগ্রহের সূচনা হয় যখন এটা দেখা যায় যে, আধুনিক নাগরিক অর্থনীতি বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির নাগরিক অর্থনীতিতেও এই তত্ত্ব প্রয়োগ করা যাবে। কারণ এই সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিকের ভিড়ে ইত্যাদি কারণে আধুনিক ক্ষেত্রে নতুন কর্মপ্রার্থীদের স্থান দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেনিয়া, কলম্বিয়া, শ্রীলংকা, ফিলিপিন্সের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আন্তর্জাতিক শ্রমসংগঠনের (ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন, আইএলও) কর্মসংস্থান মিশনে দেখা যায় যে এই দেশগুলিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটা বড় অংশই প্রথাগত নিয়ামক ব্যবস্থার বাইরে সম্পাদিত হচ্ছে। কেনিয়া মিশনে এই ধরনের প্রথম মিশন যেখানে শুধু যে প্রচলিত ক্ষেত্রের অস্তিত্ব বা এর টিকে থাকার বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তাই নয়, বরং পরিসর সম্প্রসারিত করে এর মধ্যে লাভজনক উদ্যোগের পাশাপাশি প্রান্তিক গৌণ কাজকর্মকেও স্থান দেওয়া হয়েছে (আইএলও ২০০২)। এই মিশনে ক্ষুদ্রায়তন এবং অনথিভুক্ত কাজের পরিধি বোঝানোর জন্য 'প্রচলিত ক্ষেত্রে'র বদলে 'অপ্রথাগত ক্ষেত্র' পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান শ্রমিক শ্রেণির জন্য আয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে একদিকে কৃষি ও অন্যান্য গ্রামীণ কর্মকাণ্ড এবং অন্যদিকে শিল্প ও পরিষেবার মতো অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যর্থতাকেই অপ্রথাগত অস্তিত্বের প্রধান কারণ হিসাবে মনে করা হয়।

ঘানার আক্রায় শহরাঞ্চলের শ্রমিকদের কাজকর্মের ওপর চালানো গবেষণায় এই ধরনের একটা বিভাজনের আভাস দেওয়ার জন্যই কীথ হার্ট প্রথম 'অপ্রথাগত ক্ষেত্র' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। হার্ট যেভাবে 'প্রথাগত ক্ষেত্র' শব্দটি ব্যবহার করেছেন—তা মোটামুটিভাবে আধুনিক নাগরিক ক্ষেত্র এবং 'অপ্রথাগত ক্ষেত্রের' সমার্থক যাকে নগরের প্রচলিত ক্ষেত্রের সম্প্রসারিত ব্যাখ্যা হিসাবে দেখা যেতে পারে। দুই ক্ষেত্রেই আগে যে শ্রেণি বিভাজন ছিল এখনকার শ্রেণিবিভাজন তার থেকে আলাদা এবং সেটি সম্পূর্ণভাবেই আধুনিক এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি যেটি প্রচলিত গ্রামীণ অর্থনীতির আধুনিক শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হওয়ার সূচক হিসাবেও কাজ করে। এই সমস্ত গবেষণায় প্রথাগত এবং অপ্রথাগত ক্ষেত্রের মধ্যে দ্বৈতবাদের বিশ্লেষণ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নাগরিক অপ্রথাগত ক্ষেত্রের বিশ্লেষণ আলাদা গুরুত্ব পেয়েছে। এইভাবেই অপ্রথাগত ক্ষেত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়—যেমন ১৯৭০-এর দশক—উন্মেষ পর্ব যখন অপ্রথাগত ক্ষেত্রের ধারণার মনে অঙ্কুরোদগম; ১৯৮০-র দশক প্রসারণের দশক যখন এই ধারণা ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকের দ্বারা গৃহীত হয় এবং সেইসঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়; ১৯৯০-এর দশক সরকারিভাবে রূপদানের পর্ব যখন অপ্রথাগত ক্ষেত্রের ধারণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সরকারি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়; ২০০০ সাল এবং ভবিষ্যতের সম্প্রসারণের বছরগুলি যখন গবেষণার ক্ষেত্রে অপ্রথাগত ক্ষেত্র নতুন করে এবং আরও বেশি করে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল।

উন্নয়নশীল বিশ্ব এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি থেকে বাজার অর্থনীতির পথে যাত্রা শুরু করা দেশগুলিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের দ্রুত বিকাশ ঘটেছে। এই দেশগুলিতে দরিদ্র শ্রেণির আয় ও কর্মসংস্থানের উৎস হিসাবে এই ক্ষেত্রের গুরুত্ব নিয়ে বিশেষ বিতর্কের অবকাশ নেই। গবেষণার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব প্রসঙ্গে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আইএলও-এর আন্তর্জাতিক শ্রম

সম্মেলন বিষয়ক প্রতিবেদনে। যেখানে বলা হয়েছে 'সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশেষত উন্নয়নশীল ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি থেকে বাজার অর্থনীতির পথে পা বাড়ানো দেশগুলিতে—যে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা হয়েছে মূলত অপ্রথাগত অর্থনীতিতে; কারণ, প্রথাগত অর্থনীতিতে বেশিরভাগ মানুষই চাকরির সুযোগ পান না বা কোনও ব্যবসা শুরু করতে পারেন না'। (আইএলও-২০০২)

এই সমস্ত দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অস্তিত্বকে একটা অস্থায়ীপর্ব বলে মনে করা হলেও উন্নয়ন প্রক্রিয়া জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষেত্র টিকে যায় এবং সম্প্রসারিত হয়। ধীরে ধীরে উন্নয়নশীল দেশগুলির বিপুল উদ্বৃত্ত শ্রমের যে সমস্যা তার সমাধানের চাবিকাঠি হয়ে ওঠে এই ক্ষেত্র। এরও পর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কাঠামোগত বিন্যাস কর্মসূচি (স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম) চালু হওয়ার পর প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা তথা ব্যয় সাশ্রয়ের খাতিরে সরকারি বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই তাদের নিয়োগের পরিসর সংকুচিত করে দেয়। এর ফলে এই সমস্ত অর্থনীতিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের টিকে থাকা, সম্প্রসারণ এবং স্থায়িত্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাথমিকভাবে এই ধারণাটিকে নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা শুরু হয়েছিল। পরে উন্নত দেশগুলোতেও অপ্রথাগত সম্পর্কিত গবেষণায় আগ্রহ বাড়ে। যদি বর্তমানে উন্নত দেশগুলিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অস্তিত্ব থাকলেও এই সমস্ত উদ্যোগের ধরন বা প্রকৃতিতে কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই ক্ষেত্রকে দরিদ্র শ্রেণির জন্য অস্তিত্বের প্রশ্ন বলা যেতে পারে যেখানে মানুষের সামনে বিকল্প কর্মসংস্থানের কোনও পথ নেই। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলিতে মানুষ এই ধরনের উদ্যোগগুলিতে প্রবেশ করে অন্য লক্ষ্য নিয়ে। কারণ এই ধরনের উদ্যোগের প্রথাগত ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক বেশি স্বশাসন, নমনীয় পরিবেশ ও স্বাধীনতা পাওয়া যায়। মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কর্মকাণ্ড হওয়ার দরুন উন্নত দেশগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্র শ্রম নিবিড়, স্বল্প আয়মূলক এবং সেই সঙ্গে স্বল্প পুঁজিসম্পন্ন। তবে অপ্রথাগত ক্ষেত্র সম্পর্কিত সাম্প্রতিক সমীক্ষাগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের একটা বড় অংশই এমন অনেক কর্মকুশল এবং সেগুলি লাভে চলছে (ইউসিএইচএস, ২০০৬)। তবে এই তথ্য কতটা ঠিক তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে মোট কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেই শুধু অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অবদান বাড়ছে তা নয়, বরং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-তে এই ক্ষেত্রের অবদান বেড়ে চলেছে। যেমন কিনা কৃষি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রের জিডিপি-তে অপ্রথাগত উদ্যোগের গড় অংশ উত্তর আফ্রিকায় ২৭ শতাংশ থেকে সাহারা-পার্শ্ববর্তী আফ্রিকায় ৪১ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। আবার লাতিন আমেরিকায় জিডিপিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অবদান যেখানে ২৯ শতাংশ সেখানে এশিয়ার এই অঙ্কটা ৪১ শতাংশ। কম্বোডিয়ায় কৃষি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রের জিডিপিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অবদান প্রায় ৮০ শতাংশ। এই সমস্ত হিসাব থেকে একটা কথা পরিষ্কার যে কৃষি বহির্ভূত জিডিপিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অবদান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের বিকাশের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণায় নীতি প্রণেতা ও গবেষকদের আগ্রহ বাড়ছে। বিশেষত যেভাবে এই দেশগুলিতে অদক্ষ শ্রমিক ও স্থানীয় সম্পদ নিয়ে এই ক্ষেত্র বিকশিত হচ্ছে তা দেখেই এই আগ্রহ। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উৎপাদন ও আয়ের পথ সৃষ্টিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্র যে বড় ভূমিকা পালন করেছে তাতে এই ক্ষেত্রকে এই সমস্ত দেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলেই বিবেচনা করা হচ্ছে।

সেই প্রথাগত গ্রাসাচ্ছাদনমূলক কর্মকাণ্ড থেকে আজকের লাভজনক উদ্যোগ—অপ্রথাগত ক্ষেত্রের এই দীর্ঘ যাত্রাপথে এর সংজ্ঞা প্রকৃতির মধ্যে অনেক বৈচিত্র ও অসমসত্ত্বর ধারণা এসেছে। সংজ্ঞা, এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি, কর্মকাণ্ড এবং বিষয়ের বৈচিত্র বা অসমসত্ত্ব প্রকৃতির ফলে গবেষক ও নীতি প্রণেতারা এর অন্তর্নিহিত ধারণাকে এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন যাতে এর একাধিক অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে। দেশ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ভেদে এই ক্ষেত্র আলাদা আলাদা হতে পরে, এমনকী একই শহরে বিভিন্ন অংশে এই ক্ষেত্রের রূপভেদ থাকতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক সামাজিক পরিষদ (ইউএসইসিওএসওসি) দ্বারা গৃহীত আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী 'অপ্রথাগত ক্ষেত্র' শব্দটি যে বিষয়গুলি নির্দেশ করে সেগুলি হল (ক) সমস্ত বেসরকারি এবং নিগমবদ্ধ নয় (অপ্রথাগত উদ্যোগ) এমন উদ্যোগসমূহ বা বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন ও বিক্রয়ে নিযুক্ত পরিবার; এবং (খ) পূর্ব নির্ধারিত নিম্নসীমা কম কর্মীসংখ্যা সম্পন্ন উদ্যোগ সমূহ (এনসিইইউএস ২০০৬)।

গ্রামাঞ্চলে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছেন মূলত ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, ভাগচাষি, পশুপালন, পোলট্রি ও মৎস্যচাষে নিযুক্ত ব্যক্তি, গ্রামীণ কারিগর ও শিল্পী, অরণ্যে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত কর্মী, তাড়ি প্রস্তুত কারক প্রমুখ ব্যক্তি অন্যদিকে; শহরাঞ্চলে অপ্রথাগত ক্ষেত্র গঠিত হয়েছে মূলত নির্মাণ, কাঠের কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে নিযুক্ত দৈহিক পরিশ্রমকারী শ্রমিক তথা পথ বিক্রেতা, হকার, মাথায় করে মালবহনকারী, পোশাক প্রস্তুতকারী ইত্যাদি নিয়ে। আইএলও-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী অপ্রথাগত ক্ষেত্র হল কঠোর পরিশ্রমী দরিদ্রদের কর্মকাণ্ড যারা কোনও সরকারি কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্বীকৃত, নথিভুক্ত, সুরক্ষিত বা নিয়ন্ত্রিত নয়। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে— যেমন এই কাজে যোগ দেওয়া সহজ, দেশীয় সহায়-সম্পদের ওপরই নির্ভর করে গড়ে ওঠে এই সমস্ত উদ্যোগ, উদ্যোগের ওপর থাকে পারিবারিক মালিকানা, সীমাবদ্ধ স্থানে পরিচালিত হয় এই উদ্যোগ, শ্রম নিবিড় এই উদ্যোগ অন্যের কাছ থেকে গৃহীত প্রযুক্তি এবং প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা তথা অনিয়ন্ত্রিত ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বাইরে থেকে দক্ষতা কাজে লাগিয়ে পারিচালিত হয় (আইএলও ১৯৭২)। 'অপ্রথাগত কর্মী' বলতে তাদেরই বোঝায় যাদের কর্মনিযুক্তির

শর্ত কোনও শ্রম আইন, সামাজিক সুরক্ষা এবং বিশেষ বিশেষ কর্মসংস্থানমূলক সুযোগ-সুবিধার আওতাধীন নয়। 'অপ্রথাগত অর্থনীতি' কথাটির মধ্যে দুটি বিষয় রয়েছে যথা 'অপ্রথাগত কর্মী' এবং 'অপ্রথাগত ক্ষেত্র' (আইএলও ২০০২)। ডি মোটো (১৯৮৪) তাঁর 'আদার পাথ' (অন্য পথ)-এ দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং নিয়ন্ত্রণে নতুন উদ্যোগের বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আর এই কারণেই—যাদের কাছে বৈধ আর্থিক স্বার্থ পূরণের জন্য চালু আইন পালনের মূল্য লাভে অঙ্কের চেয়ে অনেক চড়া হয়ে যায় তাদের কাছে একটা বড় আশ্রয় অপ্রথাগত ক্ষেত্র। স্নেইডার (২০০৪) আরও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের সংজ্ঞায় বলেছেন—এই ক্ষেত্র সমস্ত বাজারভিত্তিক পণ্য ও পরিষেবার আইনি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত সেগুলিকে বিভিন্ন কারণে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আড়াল করা হয়। এই বিভিন্ন কারণের মধ্যে রয়েছে আয়কর, মূল্যমুক্ত বা অন্যান্য কর ফাঁকি, সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলে অর্থ প্রদান এড়িয়ে যাওয়া কিছু আইনি মাপকাঠি যেমন শ্রম সংক্রান্ত মাপকাঠি, ন্যূনতম মজুরি, সর্বাধিক কাজের সময়, নিরাপত্তার মান ইত্যাদি এড়ানো এবং সর্বোপরি বিশেষ কিছু প্রশাসনিক নিয়মকানুন এড়িয়ে চলার তাগিদ। এই সংজ্ঞার মধ্যে যে ধারণা নিহিত রয়েছে তা অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অধীনে সম্পাদিত কাজকর্মকে একটা আইনি মর্যাদা যেমন দেয় তেমনই একই সঙ্গে কিছু অদ্ভুত শ্রম বাজার সম্পর্কিত মাপকাঠির অনুপস্থিতিকেও স্বীকৃত দেয়। এই সমস্ত উদ্যোগ মূলত তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড যেমন, কাজকর্ম পরিচালনার অনুমতি, ব্যবসার নাম, ব্যবসার চত্বরের নিবন্ধীকরণ ইত্যাদির জন্যই নিজেদের নথিভুক্তি করিয়ে থাকে।

অপ্রথাগত অর্থনীতি পর্যবেক্ষণের আওতার বাইরে থাকার অর্থনীতির (নন-অবজার্ভড ইকোনমি, এনওই) একটি অংশ (ওইসিডি ২০০২)। ১৯৯৩ সালের এসএনএ (সিস্টেম অফ ন্যাশনাল অ্যাকাউন্ট) এনওই-কে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলা, বেআইনি, অপ্রথাগত ক্ষেত্র, নিজেদের চূড়ান্ত ভোগ ব্যবহারের জন্য পারিবারিক উৎপাদন বা কর্মকাণ্ড বলে শ্রেণিবিভক্ত করেছে যেগুলি মৌলিক তথ্য সংগ্রহ কর্মসূচির ঘাটতির দরুন হিসেবের বাইরে রয়ে গেছে। ১৫তম আইসিএলএস (ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন লেবার স্ট্যাটিসটিক্স)-এর প্রস্তাব অনুযায়ী অপ্রথাগত ক্ষেত্রের সংজ্ঞা হল: সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও উপার্জনের প্রাথমিক লক্ষ্য নিয়ে পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদনে নিয়োজিত ইউনিটগুলিকে নিয়েই মোটামুটিভবে এই ক্ষেত্র গঠিত যা কিনা এই ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য। এই ইউনিটগুলি সাধারণত কোনও সংস্থার নিম্নস্তরে পরিচালিত হয় যেখানে উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রম ও মূলধনের কোনও পার্থক্য থাকে না বা প্রায় থাকে না এবং এগুলির ইউনিটগুলির আয়তনও হয় ক্ষুদ্র। শ্রম সম্পর্কের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক গ্যারান্টিসহ চুক্তিমাফিক ব্যবস্থাপনার বদলে ঠিকা নিয়োগ, আত্মীয়তা, ব্যক্তিগত পরিচয় বা সামাজিক সম্পর্ক এখানে প্রাধান্য পায়। (ওইসিডি ২০০২)।

অপ্রথাগত ক্ষেত্রের মধ্যে যে সমস্ত কাজকর্ম অন্তর্ভুক্ত করা হবে সেগুলি তথা সেগুলির অর্থনৈতিক দিক এবং সেগুলির বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয় তথ্যে একটা সমসত্ত্বচরিত্র আনার লক্ষ্যেই এই সম্মেলনের আয়োজন। এই লক্ষ্যে আরও কিছু মাপকাঠি যোগ করা হয়েছে; যথা—১) বাজারজাত করার জন্য সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের কোনও উৎপাদন থাকতে হবে; এভাবে যে অপ্রথাগত ইউনিটগুলি শুধুমাত্র নিজস্ব চূড়ান্ত ভোগব্যবহারের জন্য পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকে সেগুলিকে এই পরিসর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং সেইসঙ্গে বাদ দেওয়া হয়েছে প্রজননমূলক ও পরিচর্যামূলক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত (আইএলও ২০০২) মজুরিবিহীন গৃহস্থালির কাজ ও পরিচর্যামূলক কাজকর্মকে।

২) সংশ্লিষ্ট উদ্যোগকে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক শর্তও পূরণ করতে হবে—যেমন ধারাবাহিকভাবে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যার সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের আয়তন পূর্ব নির্দিষ্ট আয়তনের কম হতে হবে। কোনও জাতীয় আইন যেমন কারখানা বা বাণিজ্যিক আইন, কর বা সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন, পেশাদার গোষ্ঠীর নিয়ামক আইন সমূহ বা আইন সমূহ বা জাতীয় আইনসভা প্রণীত কোনও আইন বা বিধি নিয়মের আওতায় উদ্যোগটি যেন নথিভুক্ত না হয়।

৩) সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের কর্মীরা যেন কর্মসংস্থান ও শিক্ষানবিশি সংক্রান্ত কোনও চুক্তির আওতায় নথিভুক্ত না হন। কারণ তাহলে নিয়োগকর্তাকে প্রাসঙ্গিক কর বা কর্মীর তরফে সামাজিক সুরক্ষা তহবিলে অর্থ জমা দিতে হবে অথবা এই ধরনের চুক্তির ফলে কর্মনিযুক্তির বিষয়টি নির্দিষ্ট শ্রম আইনের আওতায় চলে আসতে পারে। অপ্রথাগত ক্ষেত্রের উৎপাদন ইউনিটগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এগুলি পুরোপুরি পারিবারিক উদ্যোগ এবং এগুলির হিসাবনিকাশেরও ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। উৎপাদন ইউনিটগুলির নামে কোনও স্থায়ী বা অন্যান্য সম্পদ নেই, বরং তা মালিকদের নামে। এই কারণেই ইউনিটগুলি নিজস্ব দায়িত্বে অন্য ইউনিটগুলির সঙ্গে কোনও লেনদেন, চুক্তি করতে পারে না বা কোনও আর্থিক দায়ও নিতে পারে না।

মালিককে নিজের ঝুঁকি ও দায়িত্বে প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ করতে হয় এবং উৎপাদনের জন্য গৃহীত কোনও ঋণ বা আর্থিক দায়ের জন্য তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ থাকতে হয়। উৎপাদন ব্যয়কে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পারিবারিক ব্যয় থেকে আলাদা করা যায় না। অনুরূপভাবে, বাড়িঘর বা যানের মতো মূলধনি দ্রব্য একইসঙ্গে ব্যবসায়িক এবং পারিবারিক কাজে ব্যবহৃত হয়। দুটো উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই কৃষিকর্ম হয় আবার কোনও ক্ষেত্রে কৃষিজ পণ্য বাজারেও বিক্রি করা হয়। এই কারণেই আইসিএলএস কৃষিকাজকে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের পরিসরের বাইরে রাখার সুপারিশ করেছে। যদিও বৃহৎ অপ্রথাগত ক্ষেত্র বিশিষ্ট বেশিরভাগ দেশেই কৃষিরও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে (ইউএনওইএসসিডব্লিএ ২০০৮)। আসলে এই মাপকাঠি বা শর্তগুলি একটা সার্বিক কাঠামো রচনা করে যার মধ্যে কোনও একটি দেশের সাপেক্ষে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের প্রকৃত

সংজ্ঞা তৈরি করা উচিত। সব দেশের ক্ষেত্রেই যে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের সংজ্ঞা এক এবং অভিন্ন হবে তার কোনও মানে নেই। এই মাপকাঠি বা শর্তগুলিকে মিলিয়ে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। জাতীয় আইনগুলির মধ্যে প্রভেদ থাকতে পারে, কর্মীসংখ্যার সীমা এবং কীভাবে তা গণনা করা হবে তার পদ্ধতির মধ্যে ফারাক থাকতে পারে।

অপ্রথাগত ক্ষেত্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ তথা নির্দিষ্ট মাপকাঠি অনুযায়ী বিচারের জন্য ১৫তম শ্রম সম্মেলনের প্রস্তাবে দেশগুলির ক্ষেত্রে যথেষ্ট নমনীয়তা রাখা হয়েছে। তবে এই নমনীয়তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রকে কিছুটা সংকুচিত করে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত মোটামুটি সর্বজনমান্য অভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমন্বিত জাতীয় সংজ্ঞাগুলিভিত্তিক একটা সীমিত সংজ্ঞা দরকার। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৯৭ সালে ভারত সরকারের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের সভাপতিত্বে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের পরিসংখ্যান বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগোষ্ঠী 'দিল্লি গ্রুপ' গঠিত হয়। রাষ্ট্র সংঘের স্ট্যাটিসটিক্যাল ডিভিশন (ইউএনএসডি)-কে প্রতিবেদন পেশকারী অন্যতম 'সিটিগ্রুপ' হিসাবে গঠিত এই গোষ্ঠী তখন থেকেই নির্দিষ্ট মাপকাঠি অনুযায়ী অপ্রথাগত ক্ষেত্রের বিচারের জন্য অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান, সদস্য দেশগুলি দ্বারা অনুসৃত সমীক্ষা ও গবেষণা পদ্ধতি তথা সংজ্ঞা সহ তথ্য সংগ্রহের নথি প্রস্তুতকরণ, অপ্রথাগত ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের মান ও তুলনামূলক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত আলাপ-আলোচনার আয়োজন করে চলেছে। আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী বেঁধে দেওয়া কাঠামোর ভিত্তিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের যে জাতীয় সংজ্ঞাগুলি উঠে এসেছে তার মধ্যে এক সংগতি সাধনের চেষ্টা করেছে 'দিল্লি গ্রুপ'। এই গোষ্ঠীর তৃতীয় বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়েছে এবং নিম্নলিখিত সুপারিশটি গৃহীত হয়েছে।

যেহেতু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, তাই বর্তমানে অপ্রথাগত অর্থনীতির জাতীয় সংজ্ঞাগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ সংগতি সাধন সম্ভব নয়। তাই জাতীয় স্তরে ব্যবহৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির অপ্রথাগত অর্থনীতি সম্পর্কিত তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অপ্রথাগত অর্থনীতিতে বিভিন্ন তথ্যের আরও ভালো তুলনামূলক বিচারের জন্য এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে অপ্রথাগত অর্থনীতির অন্তর্গত অংশ হিসাবে এই তথ্যগুলিকে ছড়িয়ে দিতে হবে, যেগুলিকে অভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। তবে অপ্রথাগত অর্থনীতির অন্তর্গত এই অংশ নির্ধারণের জন্য এই গোষ্ঠী যে সুপারিশ গ্রহণ করেছে তার আওতায় অপ্রথাগত ক্ষেত্রের একটা ক্ষুদ্র অংশই আসে, এই গোষ্ঠী স্বীকার করে নিয়েছে যে এর পরিসর সম্প্রসারিত করার জন্য ভবিষ্যতে প্রচেষ্টা জারি রাখতে হবে। (ওইসিডি ২০০২)। এই গোষ্ঠীর পরামর্শ অনুযায়ী একইসঙ্গে তিনটি অত্যাবশ্যক মাপকাঠি ও কিছু অতিরিক্ত মাপকাঠি প্রয়োগ করতে হবে: যেমন পাঁচজনের কম মজুরি প্রাপ্ত কর্মীসংখ্যা সহ উৎপাদন ইউনিট, এবং নথিভুক্ত নয় এমন উৎপাদন ইউনিট। এর মধ্যে যে পরিবারগুলি পারিশ্রমিক দিয়ে পরিচারক/পরিচারিকা নিয়োগ করছে সেগুলিকে এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এই ভাবেই অপ্রথাগত ক্ষেত্রের এক সর্বাত্মক সংজ্ঞায় পৌঁছনো গেছে।

অপ্রথাগত ক্ষেত্রের পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে দেশগুলিকে সঠিক দিশা দেখানোর জন্য একটি কারিগরি নির্দেশিকা তৈরি করতে 'দিল্লি গ্রুপ' একটি অগ্রণী সংস্থা হয়ে উঠেছে। এর আগে অপ্রথাগত ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান সংগ্রহের ওপর বিশেষ মনোযোগই দেওয়া হয়নি। কিন্তু এই বিষয়টির গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গত চার দশকে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের ওপর যথেষ্ট গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ তো হয়েইছে এবং সেইসঙ্গে এবং অপ্রথাগত ক্ষেত্রের ধারণাটিও উন্নততর হয়েছে। ২০০৫ সালে দিল্লি গ্রুপ এবং আইএলও সহযোগিতার ভিত্তিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা তৈরিতে রাজি হয় যেখানে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের বাইরের অপ্রথাগত কর্মসংস্থানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও অপ্রথাগত ক্ষেত্র সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য হাতে পাওয়া যায়নি। এর ক্ষেত্রে কোনও সর্বজনীন সংজ্ঞা না থাকা এবং এই বিষয়টির বিপুল বৈচিত্র বা অসমসত্ত্ব প্রকৃতিই এর জন্য দায়ী। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ। এমনকী এই ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যের মধ্যেও ব্যাপক বৈচিত্র। ফলে তথ্য সংগ্রহের কাজ হয়ে পড়ে ভীষণ জটিল। অপ্রথাগত ক্ষেত্রের পরিসংখ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ উন্নয়ন বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে ভীষণভাবে জরুরি। কারণ ওই দেশগুলিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রকে উপার্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলে ধরা হয়।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের উদ্যোগ ও অংসগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক সম্পর্কিত তথ্যের প্রধান ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করা এবং সেই সঙ্গে স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট মাপকাঠিভিত্তিক ধারণা, সংজ্ঞা, আওতা, তুলনামূলক বিচার পদ্ধতির ভিত্তিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের জন্য পরিসংখ্যানগত তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার সুপারিশ করতে ভারতে জাতীয় পরিসংখ্যান কমিশন (এনএসসি) ২০১০ সালে অংসগঠিত ক্ষেত্রের পরিসংখ্যান বিষয়ক এক কমিটি গঠন করে। এই কমিটির মত অনুযায়ী, ভারতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের উদ্যোগ ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে অনেক ত্রুটি রয়েছে। এর মূল কারণ হল, আইএলও-এর কাঠামো অনুযায়ী কার্যকরণ তথ্য ব্যবস্থার জন্য যে প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা, ধারণা এবং আওতা সম্পর্কিত মত রয়েছে তা থেকে এদেশের চালু তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার বিচ্যুতি। অর্থনীতির এই অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশের কার্যকারিতা আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য এই ঘাটতিগুলো অবিলম্বে পূরণ করতে হবে, এবং সেই সঙ্গে এই ক্ষেত্র সম্পর্কিত পর্যাপ্ত, তুলনামূলক এবং একইসঙ্গে এই ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান তৈরি করতে হবে। এই পরিসংখ্যান ভবিষ্যতে অপ্রথাগত সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও তা রূপায়ণে অনেক সাহায্য করবে।❑

[লেখক আসামের উত্তর গুয়াহাটি কলেজে সহকারী অধ্যাপক।
email: ashimamajumdar011@gmail.com]

অপ্রথাগত ক্ষেত্রের বাড়বাড়ন্ত দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে তুলছে

কোনও রকম আইনকানুন না মেনে রাস্তার ধারে যে অসংখ্য খুচরো দোকান আমরা গজিয়ে উঠতে দেখি—যাদের কর্মী ও মালিক বলতে একজন বা একই পরিবারের মানুষ; যাদের ব্যবসা করবার ট্রেড লাইসেন্সটুকুও নেই—এমন বহু ব্যবসায়ী আমাদের চারপাশে নিত্য গজিয়ে উঠছে। এটা সাধারণত অনুন্নত দেশগুলিতেই দেখা যায় বেশি এবং এদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকার কারণ কর্মসংস্থানের অভাব। এরা বেশিরভাগই শিক্ষিত বেকার অথচ কোনও বিশেষ ধরনের কাজের দক্ষতা এদের নেই। নিতান্ত বাঁচার তাগিদে এদের বাড়বাড়ন্ত। এদের নিয়ে বেশ কিছু সমীক্ষার ভিত্তিতে এদের সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতির বিষয়টি কীভাবে জড়িত, তা বিশ্লেষণ করে দেখছেন **তপনকুমার ভট্টাচার্য।**

বড় রাস্তার পাশ দিয়ে সার সার দোকান আর এই সব দোকানে বিক্রি হয় রকমারি পণ্য। কেবলমাত্র খুচরো বিক্রিই নয়, পরিষেবা এবং পণ্য উৎপাদনের কাজও চলে রাস্তা-পাশের এই সব দোকান এবং সংস্থাগুলিতে। যেমন সস্তার হোটেল, চুল কাটার সেলুন, কামারশালা, মোবাইল এবং ঘড়ি সারাইয়ের দোকান, ছাতা তৈরি, ঘুড়ি তৈরি এবং এ ধরনের অসংখ্য কাজ কারবার যা বোধ হয় গুনে শেষ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ দেশের অর্থনীতিতে ট্রেডিং, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সার্ভিস এই যে তিনটি ক্ষেত্রের কার্যকলাপ চলেছে এবং যার প্রভাবে দেশের অর্থনীতির গতি নিয়ন্ত্রিত হয় তারই সংক্ষিপ্তসার কোলাজ যেন রাস্তাপাড়ের এই সব সংস্থা। বেশিরভাগই গুমটি ঘর এবং কয়েকটির ইটের গাঁথনির উপর অ্যাসবেস্টস অথবা টালি বা টিনের ছাউনি। এই সব ব্যবসা বেশিরভাগই গড়ে উঠেছে দখল করা সরকারি জমির উপর এবং সরকার যখন তখন এদের হটিয়েও দিতে পারে। কিন্তু জীবিকার তাগিদে ঝুঁকি নিয়েই এঁরা ব্যবসা চালিয়ে যান এবং অনেকে তো চালিয়ে যান পুরুষানুক্রমে। তবে মাঝেমধ্যে যে উচ্ছেদও হতে হয় না তা নয়। কেবলমাত্র স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠা এই সব ব্যবসাকেন্দ্রই নয়, ব্যবসা চলছে ভ্রাম্যমাণ যানে। ঠেলাগাড়ি বা ভ্যানে পসরা সাজিয়ে হকাররা পণ্য বিক্রি করছেন। তাছাড়া ফুটপাথে খালি আকাশের নীচেও ব্যবসা চলছে রমরমিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ এবং কম বেশি সারা দেশ জুড়েই চলছে এ ধরনের ব্যবসা। কলকাতা শহরের কয়েকটি এলাকায় তো ফুটপাথ ছাড়িয়ে ব্যবসা রাস্তায় নেমে এসেছে এবং রাস্তারও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দখল হয়ে গিয়েছে।

এই যে সব নিয়মকানুন বা আইনের তোয়াক্কা না করে অসংখ্য ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে এগুলিকে বলা হয় অপ্রথাগত বা বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্র বা ইনফর্মাল সেক্টর। অর্থাৎ বলা যেতে পারে বেআইনি ভাবেই এই সব ইনফর্মাল ব্যবসা কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছে। তবে সংজ্ঞার এই সরলীকরণ সব সময় প্রযোজ্যও নয় এবং এ ব্যাপারে পরে আলোচনাও করা হয়েছে।

আইনিভাবে ব্যবসা করতে হলে তো অনেক কিছুরই প্রয়োজন। প্রথমেই যে জিনিসটার প্রয়োজন তা হল ট্রেড লাইসেন্স আর এই লাইসেন্স দেবার কর্তৃত্বে রয়েছে স্থানীয় প্রশাসন, অর্থাৎ পঞ্চায়েত বা পৌরসভা বা পৌর নিগম। কিন্তু ট্রেড লাইসেন্স পেতে হলে ব্যবসাকেন্দ্রটি নিজের নামে হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা সে নামটি মালিকানা ভিত্তিতে বা ভাড়ার ভিত্তিতে বা লিজের ভিত্তিতে, যে ভাবেই হোক না কেন। কিন্তু দখল করা সরকারি জমির উপর গড়ে ওঠা ব্যবসাকেন্দ্রে আইনসংগতভাবে নিজের নাম ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় ট্রেড লাইসেন্স পাওয়াও সম্ভব হয় না। তবে নিজের জমিতে বা নিজের বসত বাড়িতেই গড়ে তোলা ছোট ব্যবসার সংখ্যাও কম নয়। গরিব মানুষটি তাঁর নিজের বাড়ির খোলা বারন্দাটিতেই মুদিখানার দোকান বানিয়ে তোলেন, অথবা কোনও নিম্নবিত্ত মহিলা নিজের বাড়িতেই গড়ে তোলেন তাঁর সেলাইয়ের ব্যবসা অথবা খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণের শিল্প, যেমন বড়ি, পাঁপড়, জ্যাম, জেলি এই সব। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিও আইনসংগতভাবে গড়ে ওঠা কোনও ছাদের নীচেই কাজকর্ম চালান। কিন্তু নিজস্ব আস্তানায় গড়ে ওঠা এই সব উদ্যোগও অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হিসেবেই ধরা হয়।

সংজ্ঞা : অপ্রথাগত ক্ষেত্র

এই অপ্রথাগত বা প্রথাবহির্ভুত ক্ষেত্রের উপস্থিতি কেবলমাত্র আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশেই রয়েছে এদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি। অথচ দেশের নীতি নির্ধারকদের কাছে দীর্ঘদিন যাবৎ এরা উপেক্ষিতই থেকে গেছে এবং ব্যবহারযোগ্য সংজ্ঞার অভাবে দেশের জাতীয় আয়ের হিসাবনিকাশের সময় এরা অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় দেশের জাতীয় আয়ের সঠিক চিত্রটিও ফুঠে ওঠেনি। এ ব্যাপারে প্রথম এগিয়ে আসেন নৃতত্ত্ববিদ কীথ হার্ট এবং ১৯৭১ সালে ঘানায় এক বক্তৃতায় বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন। অপ্রথাগত ক্ষেত্রের

সংজ্ঞা হিসেবে তিনি স্বনিযুক্ত ছোট উদ্যোগের কথা বলেন। অন্যদিকে প্রথাগত ক্ষেত্র বলতে তিনি সেই সব ক্ষেত্রের কথা বলেন যেগুলি মজুরি দিয়ে কর্মচারী নিযুক্ত করে। পরবর্তীকালে অবশ্য এই সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা প্রতিপন্ন হয়েছে এবং নতুন নতুন সংজ্ঞার উদ্ভবও হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে হার্টের সংজ্ঞার পরেই বিষয়টি আলোচনায় গতি পায় এবং অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। দেশের জাতীয় আয়ের হিসাব নিরূপণের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে আন্তর্জাতিক স্তরে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় {System of National Account (SNA) 1993} সেখানে বলা হয়, নিজস্ব কর্মসংস্থান এবং আয়ের তাগিদে যে সমস্ত ছোট ছোট উদ্যোগপতি পণ্য এবং পরিষেবা উৎপাদন করেন তাঁরাই অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই সব ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা থাকে খুবই কম, নিযুক্ত করা হয় অস্থায়ী হিসেবে এবং মালিকের চেনাজানা লোকজন বা আত্মীয়স্বজনের মধ্য থেকেই এঁরা নিযুক্ত হন। নিযুক্তি এবং কাজের ব্যাপারে মালিক এবং কর্মীদের মধ্যে কোনও চুক্তি সম্পাদিত হয় না, সামাজিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই এখানে মালিক এবং কর্মচারীর সম্পর্ক নির্ণীত হয়। আর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থার একটা অংশই হল এই সব অপ্রথাগত সংস্থা।

ভারতে অপ্রথাগত সংস্থাগুলির উপর নিয়মিত সমীক্ষা চালায় ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস (NSSO) {পূর্বের নাম ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন} এবং এ ব্যাপারে অপ্রথাগত ক্ষেত্রগুলির যে সব বৈশিষ্ট্য তারা নির্ধারণ করেছে সেগুলি হল:

(ক) উৎপাদনমুখী শিল্পসংস্থাগুলির ক্ষেত্রে সেগুলিকেই ধরা হবে যেগুলি বাৎসরিক সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়।

(খ) পরিষেবা শিল্পের ক্ষেত্রে সেগুলিই বিবেচিত হবে যেগুলি সরকারের দ্বারা পরিচালিত নয় (সরকার বলতে এখানে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় সরকার এই তিনটিকেই বোঝানো হচ্ছে) এবং কর্পোরেট ক্ষেত্রের মধ্যে যেগুলি নিবন্ধিত নয় (unregistered)। অন্য দিকে দেশের কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভাগ সেই সমস্ত ক্ষেত্রকে সংগঠিত ক্ষেত্রের তালিকায় রেখেছে যেখানে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা দশজন বা তার বেশি।

দেশে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ওপর গঠিত ন্যাশনাল কমিশন এই বিষয়ে আলোকপাত করেছে। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা পারিবারিক উদ্যোগে গঠিত যে সব সংস্থাগুলির আইনি অস্তিত্ব মালিকদের থেকে অভিন্ন নয়, অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে মালিক এবং সংস্থা এক ও অভিন্ন সেগুলিই অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। ভারতে ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির গঠনতন্ত্র হতে পারে: (ক) স্বত্বাধিকারী, (খ) অংশীদারি, (গ) কোম্পানি আইনে নথিভুক্ত কোম্পানি, (ঘ) সমবায় আইনে নথিভুক্ত সমবায় সংস্থা, (ঙ) পুরোপুরি সরকারি অথবা সরকারি মালিকানাধীন সংস্থা (অর্থাৎ পাবলিক সেক্টর)। স্বত্বাধিকারী বা অংশীদারি সংস্থার ক্ষেত্রে সংস্থার দায় পুরোপুরি মালিকের উপরই বর্তায় যেখানে অন্যান্য গঠনতন্ত্রযুক্ত সংস্থার ক্ষেত্রে মালিক বা মালিকদের দায় একটা নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ থাকে। আন্তর্জাতিক সংজ্ঞায় আরও বলা হয়েছে, কর্মচারীর সংখ্যাও একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৯ ধরা হয়েছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মালিক এবং সংস্থা যেখানে অভিন্ন, সেখানে মালিক ও সংস্থার আয়ব্যয়ের হিসাব আলাদাভাবে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশের আইনেও স্বত্বাধিকারী এবং অংশীদারি সংস্থার ক্ষেত্রে যেখানে কর্মীর সংখ্যা দশের কম সেখানে ব্যবসার হিসাব আলাদা রাখারও কোনও আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের যে সংজ্ঞা সুপারিশ করা হয়েছে তা হল: "যে সব সংস্থার মালিকানা রয়েছে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক স্তরে, যেগুলি নিবন্ধিত নয়, গড়ে উঠেছে স্বত্বাধিকারী বা অংশীদারি হিসেবে এবং কর্মচারীর সংখ্যা যেখানে ১০-এর কম এবং সংস্থাগুলির কাজ যেখানে জিনিসপত্র বিক্রি করা অথবা উৎপাদন করা অথবা পরিষেবা প্রদান করা সেই সব সংস্থাকেই অপ্রথাগত সংস্থা হিসেবে ধরা যেতে পারে।"

অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বা দেশীয় স্তরে বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা দেওয়া হলেও নির্যাসটা কিন্তু একই।

সংজ্ঞা : অপ্রথাগত শ্রমিক

অপ্রথাগত সংস্থাগুলির মতো অপ্রথাগত বা ইনফর্মাল কর্মীরাও দেশের জাতীয় আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদদের হিসাবনিকাশের বাইরেই ছিল দীর্ঘদিন। এই সব মানুষ সমীক্ষকদের কাছে নিজের আয় এবং কাজের তথ্য প্রকাশ করতে চান না অথবা তাঁকে এড়িয়ে চলেন। সমীক্ষকরাও অনেক সময় এঁদের কাজের বিষয়টি অনুধাবন করে উঠতে পারেন না যে এঁরা কারও অধীনে মজুরির ভিত্তিতে কাজ করছেন না কি স্বাধীনভাবে কোনও কাজে (ফ্রি-লান্স) নিযুক্ত রয়েছেন। স্বাধীনভাবে কাজ বলতে এরা নিজেদের উদ্যোগে মাটি কাটা, বাগান পরিষ্কার করা—এ ধরনের কাজ যেমন করেন সেরকম কোনও দক্ষতা অর্জন করে (যেমন বিদ্যুতের কাজ, প্লাম্বিং-এর কাজ অথবা কৃষি-মেশিন সারাইয়ের কাজ) সেই সব কাজের মাধ্যমে স্বনিযুক্ত থাকেন।

এই সব কর্মীদের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল যে এঁরা সামাজিক সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত নন এবং তাঁদের সঙ্গে মালিকপক্ষের সম্পর্কও ফর্মাল বা আনুষ্ঠানিক নয়। তবে কেবলমাত্র অপ্রথাগত সংস্থার কর্মীরাই নন, অনেক অপ্রথাগত সংস্থার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে তাদের কর্মীদের সঙ্গে মালিকের সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক নয় এবং এই সব কর্মীদেরও অনেক সময়ই সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। আবার কিছু কিছু অপ্রথাগত ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকপক্ষের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক লক্ষ করা যায়।

অপ্রথাগত কর্মীদের কাজের নানা বৈশিষ্ট্যের কারণে সমীক্ষকরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না কীভাবে এঁদের জাতীয় আয়ের গণনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া এঁদের অন্তর্ভুক্ত না করার পেছনে এই সব কর্মীদের কোনও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা না থাকাও অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এ ব্যাপারে শ্রম সম্পর্কিত প্রথম জাতীয় কমিশন (১৯৬৬-৬৯) যে সংজ্ঞার উল্লেখ করেছে তা হল "যে সব শ্রমিক অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারণে অথবা যে সব সংস্থায় তাঁরা কাজ করেন সেগুলি ক্ষুদ্র আকারের হওয়ার কারণে এবং সংস্থাগুলির বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকার কারণে নিজেদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার তাগিদেও ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম হন না, তাঁদেরই অসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।" তাছাড়া 'ন্যাশনাল কমিশন ফর এন্টারপ্রাইসেস ইন দ্য আন-অর্গানাইজ্‌ড সেক্টর'-এর তরফ থেকে ইনফর্মাল শ্রমিকদের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে: পারিবারিক সংস্থায় কর্মরত যে সব শ্রমিক মালিকদের তরফে সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত কোনও রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি এবং এমনকী প্রথাগত ব্যবস্থার আওতাভুক্তও যে সব শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন তাঁদেরই অপ্রথাভুক্ত শ্রমিক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।"

সোজা কথায় একদিকে সংগঠন করতে না পারা এবং অন্য দিকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকা—এই দু'টিই হল অপ্রথাগত শ্রমিকদের চিহ্নিত করার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

দেশের অর্থনীতিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের প্রভাব এবং NSSO-র ৬৭তম সমীক্ষা

২০১৩ সালের এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, ভারতবর্ষের ১.৮৫ ট্রিলিয়ন ডলারের (১ ট্রিলিয়ন = ১ লক্ষ কোটি) অর্থনীতির প্রায় অর্ধেকই হল অপ্রথাগত বা ইনফর্মাল অর্থনীতি। এ ধরনের অর্থনীতি আমাদের দেশের চেয়ে বেশি রয়েছে কেবলমাত্র সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলিতে। কিন্তু বেশিরভাগ উত্তরণশীল অর্থনীতিতে সংখ্যাটা ২০ শতাংশের কাছাকাছি। সেখানে আমাদের দেশে পরিমাণটা যে অনেকটাই বেশি তা সহজেই বোঝা যায়। অকৃষি ক্ষেত্রে দেশের ৮৪ শতাংশ সংস্থাই হল অপ্রথাগত। সমীক্ষা অনুযায়ী দেশের মাত্র ১৩ শতাংশ শিল্পসংস্থা এবং ১২ শতাংশ ব্যবসায়িক সংস্থা নথিভুক্ত। তাছাড়া কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও ভারতীয় কোম্পানিগুলি অপ্রথাগত কর্মী নিয়োগের দিকেই বেশি করে ঝুঁকছে। ১৯৮০ সালে দেশে এই সব সংস্থায় কর্মীসংখ্যা ছিল সংস্থাপিছু গড়পড়তা তিন জন। ২০০৫ সালে এই সব সংস্থার সংখ্যা ৪০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেলেও সংস্থাপিছু গড়পড়তা কর্মীসংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ২.৪ জন।

দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের উপর সেই ১৯৫০ সাল থেকে NSSO-র তরফে সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। দেশের অপ্রথাগত ক্ষেত্রগুলির উপর তারা সর্বশেষ সমীক্ষা চালায় ২০১০-১১ সালে এবং এই সমীক্ষা ৬৭তম সমীক্ষা হিসেবে পরিগণিত। সমীক্ষার জন্য কৃষি এবং নির্মাণ সংস্থা ব্যতিরেকে সমস্ত অনিবন্ধিত (unregistered) অপ্রথাগত সংস্থাগুলিকে বেছে নেওয়া হয়। সমীক্ষায় উৎপাদন, পরিষেবা এবং বাণিজ্য এই তিনটি ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সংস্থাগুলিকে আবার দু ভাগে ভাগ করা হয়। এক ভাগ হল একেবারে নিজস্ব সংস্থা বা 'Own Account Enterprises'। যে সব সংস্থায় মালিক নিজেই উদ্যোগটি চালান এবং কোনও মজুরিভিত্তিক বা বেতনভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ করেন না সেগুলিই এই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। আর যে সব উদ্যোগগুলিতে অন্তত এক জন কর্মীকেও সারা বছর ধরে নিযুক্ত রাখা হয়েছে সেগুলি দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত।

সমীক্ষায় দেখা যায়, দেশে এই ধরনের সংস্থা রয়েছে ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ এবং এদের মধ্যে ৩০ শতাংশ উৎপাদনভিত্তিক, ৩৬ শতাংশের ট্রেডিং এবং বাকি ৩৪ শতাংশ পরিষেবামূলক। এই সব সংস্থার মধ্যে ৫৪ শতাংশের অবস্থান গ্রামীণ এলাকায় এবং ৪৬ শতাংশের শহর এলাকায়। দেখা যায়, উৎপাদন, বাণিজ্য এবং পরিষেবা এই তিনটি ক্ষেত্রের উপস্থিতি গ্রামাঞ্চলে প্রায় সম-সংখ্যায় (৩৩ শতাংশ থেকে ৩৪ শতাংশের মধ্যে); কিন্তু শহরাঞ্চলে ট্রেডিং বা বাণিজ্য ক্ষেত্রটিরই রমরমা বেশি (৩৮ শতাংশ), দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পরিষেবা (৩৫.৫ শতাংশ) এবং তার নীচে রয়েছে উৎপাদন-ভিত্তিক সংস্থা (২৬.৫ শতাংশ)। সমীক্ষায় আরও দেখা যায়, একক মালিকানাধীন সংস্থাগুলির উপস্থিতিই সিংহভাগ, ৪ কোটি ৯০ লক্ষ (৮৫ শতাংশ) এবং এদের মধ্যে ৫৮ শতাংশের উপস্থিতি গ্রামীণ এলাকায় এবং ৪২ শতাংশ শহর এলাকায়। (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। রাজ্যভিত্তিক যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সেখান থেকে দেখা যায় অপ্রথাগত ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ গঠিত হয়েছে উত্তরপ্রদেশে (১৪.৫ শতাংশ) এবং এর পর ক্রম অনুসারে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ (১২.৬ শতাংশ), অন্ধ্রপ্রদেশ (৯.৭ শতাংশ), মহারাষ্ট্র (৮.৯ শতাংশ), তামিলনাড়ু (৭.৮ শতাংশ)। এই পাঁচটি রাজ্যেই এ ধরনের উদ্যোগের সংখ্যা দেশের মোট উদ্যোগের ৫৩.৬ শতাংশ। দেশের মোট ১০ কোটি ৮০ লক্ষ শ্রমিক এই সব সংস্থায় নিযুক্ত রয়েছেন। এর মধ্যে ৫১ শতাংশ শ্রমিক রয়েছেন শহরাঞ্চলে এবং ৪৯ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে। (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া সংস্থাগুলির গঠনতন্ত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, স্বত্বাধিকারী সংস্থার সংখ্যাই সর্বাধিক (৯৬ শতাংশ) এবং এই সব সংস্থার ১৭ শতাংশ মালিক হলেন মহিলা এবং বাকিরা পুরুষ।

এই যে এত সব অপ্রথাগত ক্ষেত্রের উদ্যোগ গড়ে উঠেছে তারা দেশের কী পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করতে পারছে। সারা দেশের হিসাবে উদ্যোগ-প্রতি বাৎসরিক মোট মূল্যযুক্তর পরিমাণ (গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড) ১,০৮,৯৫১ টাকা। ট্রেডিং বা বাণিজ্যভিত্তিক সংস্থাগুলির ক্ষেত্রেই পরিমাণটা সর্বাধিক, ১,১৭,৪৫৪ টাকা, দ্বিতীয় স্থানে পরিষেবা

সারণি-১
কার্যক্রম অনুসারে উদ্যোগের সংখ্যা

কার্যক্রম	উদ্যোগের সংখ্যা (০০০)						সারা ভারতের অবস্থান		
	গ্রাম			শহর			গ্রাম + শহর		
	নিজস্ব সংস্থা	অন্যান্য সংস্থা	মোট	নিজস্ব সংস্থা	অন্যান্য সংস্থা	মোট	নিজস্ব সংস্থা	অন্যান্য সংস্থা	মোট
উৎপাদন	৯১৩৮	৯৭৭	১০১১৫	৫২৯২	১৮০৩	৭০৯৫	১৪৪৩০	২৭৮০	১৭২১০
বাণিজ্য	৯৯৫৪	৬১১	১০৫৬৫	৭৮৭০	২৩১৬	১০১৮৬	১৭৮২৪	২৯২৬	২০৭৫১
পরিষেবা	৯১৫৪	১০৫৭	১০২১১	৭৪০২	২০৯৮	৯৫০১	১০৫৫৬	৩১৫৬	১৯৭১২
মোট	**২৮২৪৬**	**২৬৪৫**	**৩০৮৯১**	**২০৫৫৪**	**৬২১৮**	**২৬৭৮২**	**৪৮৮১০**	**৮৮৬৩**	**৫৭৬৭৩**

উৎস : NSSO-র ৬৭তম সমীক্ষা

সারণি-২
কার্যক্রম অনুসারে শ্রমিকের সংখ্যা
শ্রমিকদের সংখ্যা (০০০) সারা ভারতের অবস্থান

কার্যক্রম	গ্রাম			শহর			গ্রাম + শহর		
	নিজস্ব সংস্থা	অন্যান্য সংস্থা	মোট	নিজস্ব সংস্থা	অন্যান্য সংস্থা	মোট	নিজস্ব সংস্থা	অন্যান্য সংস্থা	মোট
উৎপাদন	১৩২১৩	৫২৯৮	১৮৫১০	৭৬৩২	৮৭৪৬	১৬৩৭৮	২০৮৪৪	১৪০৪৪	৩৪৮৮৮
বাণিজ্য	১৩৬২৯	১৭৪৯	১৫৩৭৮	১০৮৭৭	৭৮৭৪	১৮৭৫১	২৪৫০৬	৯৬২৩	৩৪১২৯
পরিষেবা	১৪৮৫৮	৪৪৩৬	১৯২৯৩	৯৫৫৬	১০১১১	১৯৬৬৮	২৪৪১৪	১৪৫৪৭	৩৮৯৬১
মোট	**৪১৭০০**	**১১৪৮৩**	**৫৩১৮২**	**২৮০৬৪**	**২৬৭৩২**	**৫৪৭৯৭**	**৬৯৭৬৪**	**৩৮২১৫**	**১০৭৯৭৯**

উৎস : NSSO-র ৬৭তম সমীক্ষা

ক্ষেত্র, ১,১৬,৬৩৩ টাকা এবং একেবারে শেষে উৎপাদন-ভিত্তিক সংস্থা বা ম্যানুফ্যাকচারিং, পরিমাণ ৮৯,০০০ টাকা। আর এই মূল্যযুক্তর পরিমাণ শ্রমিক পিছু হিসাব করলে দাঁড়ায় ৫৮,১৯৩ টাকা। এখানেও মূল্যযুক্তর পরিমাণ ট্রেডিং-এর ক্ষেত্রেই সর্বাধিক, ৭১,৪১২ টাকা, এর পরের অবস্থান পরিষেবার ক্ষেত্রে, ৫৯,০১০ টাকা এবং সব শেষে উৎপাদনের ক্ষেত্রে, ৪৪,৩৪৭ টাকা। আর শ্রমিক পিছু বাৎসরিক আয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাণিজ্য, পরিষেবা এবং উৎপাদন এই তিনটি ক্ষেত্রে এই আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৬,৩৬২ টাকা, ৫১,৬০৩ টাকা এবং ৪৭,০২০ টাকা। দেখা যায় ট্রেডিং-এর ক্ষেত্রে অর্থনীতিতে মূল্যযুক্তর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হলেও আয়ের ক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্তিই সবচেয়ে কম। তবে তিনটি ক্ষেত্রেই পরিমাণটা কিন্তু যৎসামান্য।

অপ্রথাগত ক্ষেত্রগুলিকে প্রথাগত করার সম্ভাবনা কতটা?

সমীক্ষায় অপ্রথাভুক্ত কর্মীর যে সংখ্যা উঠে এসেছে আসল সংখ্যাটা যে এর চেয়ে অনেকটাই বেশি তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ সমীক্ষায় নির্মাণ শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অথচ দেশে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে এই সব নির্মাণ সংস্থা। অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি কৃষিক্ষেত্রকেও, যদিও ভারত কৃষি-প্রধান দেশ এবং দেশের বেশিরভাগ মানুষের জীবিকা এখনও কৃষির উপর নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষ চাষবাসের সঙ্গে সম্পর্কিত কৃষকদের বাদ দিলেও কৃষি-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যাঁরা নিযুক্ত, অর্থাৎ মাছ চাষ, দুগ্ধ উৎপাদন, হাঁস-মুরগি পালন, শূকর এবং ছাগল পালন—এ ধরনের অসংখ্য কাজ অপ্রথাভুক্ত। ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং এই সব কাজে যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন তাঁরাও অপ্রথাগত শ্রমিক হিসেবেই পরিগণিত। সুতরাং এই সব ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করলে দেশে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের চেহারাটা আরও বড় আকার ধারণ করবে। তাছাড়া এতদিন অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত এবং স্বল্প দক্ষতার মানুষজনই এই ক্ষেত্রটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে, মানুষ শিক্ষিতও হচ্ছে, অথচ সরকারি চাকরি কমে যাওয়ায় এবং বড় আকারের কলকারখানা সেভাবে তৈরি না হওয়ায় দেশে প্রথাগত ক্ষেত্রের চাকরির সংখ্যা কমছে। এমনকী রাজনীতিবিদরাও বেকারদের দোকান দেওয়ার বা ছোট উদ্যোগ গড়ে তুলে স্বনিযুক্ত হবার পরামর্শ দিচ্ছেন। এর ফলে অপ্রথাগত কর্মীর সংখ্যা যে ক্রমশ আরও বাড়তে থাকবে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বর্তমানে তো অনেক স্নাতক উত্তীর্ণ যুবকেরা রঙের কাজ, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ বা সুরক্ষা কর্মীর কাজ—এ ধরনের বিভিন্ন কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। মেয়েরাও আয়ার কাজে অথবা দোকানে বিক্রয়কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছেন। মজুরির পরিমাণ যাই হোক না কেন, কাজ পাবার এবং বাঁচার তাগিদই বেশি জরুরি হয়ে পড়ছে। অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী বেকারত্বের একটি অন্যতম কারণ হল অশিক্ষা এবং দক্ষতার অভাব। অশিক্ষিত এবং অদক্ষ মানুষের মধ্যে বেকারত্ব কম। কারণ বাঁচার জন্য যে কোনও কাজ পেতেই এঁরা মরিয়া, অন্যথায় তাঁদের হয়তো অনাহারেই দিন কাটাতে হতে পারে, কাজের পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটা এখানে নেহাতই গৌণ। অন্যদিকে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এই পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটা থাকায় তাঁদের মধ্যে বেকারত্ব বেশি। তবে অর্থনীতির এই নিয়ম বর্তমানে আমাদের দেশে বোধ হয় আর সেভাবে খাটছে না। কারণ অপ্রথাগত ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটাই নেই।

ইউরোপ আমেরিকার মতো আর্থিক দিক থেকে উন্নত দেশগুলিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের উপস্থিতি নেই বললেই চলে, সমস্যাটা মূলত প্রকট গরিব ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যেখানে কাজের সুযোগ যথেষ্ট সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিও আরও একটি কারণ। তাছাড়া আমাদের দেশে ভোট ব্যাংকের রাজনীতিও এই ক্ষেত্রগুলির বেশি মাত্রায় গজিয়ে ওঠার একটি অন্যতম কারণ বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সরকারি জমিতে দোকান করতে হলে বা ফুটপাথে ব্যবসা করতে হলে যথাস্থানে অনেক টাকাই নজরানা দিতে হয়। তাছাড়া এভাবে আনুগত্যও কেনা যায় এবং ভোটের সময় এদের ব্যবহার করা যায়। সমালোচকরা বলে থাকেন আমাদের দেশে রাজনীতিবিদদের প্রচ্ছন্ন মদতে অপ্রথাগত সংস্থাগুলির বাড়বাড়ন্ত ঘটে চলেছে।

তবে এই বাড়বাড়ন্ত দেশের অর্থনীতির পক্ষে মোটেই শুভ নয়। কারণ শ্রমিক শ্রেণির মজুরি কম, সামাজিক সুরক্ষা বলয়েও তাঁরা অন্তর্ভুক্ত নন। যদিও কতিপয় রাজ্য সরকারের তরফে এঁদের জন্য বিমা প্রকল্প, স্বাস্থ্য প্রকল্প এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রকল্প চালু করা হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যৎসামান্য মাত্র। সংস্থাগুলি নথিভুক্ত না হওয়ায় সরকার এই সব সংস্থার কাছ থেকে কর আদায় করতে পারে না। কিন্তু ব্যবসা চালাতে যেগুলি জরুরি প্রয়োজন (যেমন জল, বিদ্যুৎ) সেগুলি সবই তারা ব্যবহার করে আর সাধারণ নাগরিকদের করের টাকা থেকেই এই খরচটা উশুল হয়। আর এর ফলে দেশের জাতীয় আয় কমছে এবং অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ এই সব সংস্থার অন্তত কিছু সংখ্যককেও প্রথাগত করে তুলতে পারলে সরকারের আয়ের পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে যেত। কিন্তু রাজনীতিবিদদের তরফে উদ্যোগটা সেভাবে চোখে পড়ছে না এবং অপ্রথাগত ক্ষেত্রের রমরমা দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে তুলছে।❑

ভারতের অপ্রথাগত ক্ষেত্র, কর্মসংস্থান ও জীবিকা

বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে তুলনা করলে ভারতে কর্মীবাহিনী আকারে প্রকারে পৃথক। প্রথাগত ও অপ্রথাগত উভয় ক্ষেত্র এদেশে বিদ্যমান। দুয়েরই অবদান আছে ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশ এবং উন্নয়নে। বিগত দশকগুলিতে রাষ্ট্রের বেশি মনোযোগ পেয়েছে প্রথাগত ক্ষেত্র। রাষ্ট্রের কাছ থেকে দেদার সুযোগসুবিধে হাতিয়েছে। প্রথামুক্ত ক্ষেত্র যেন দুয়োরানি। তার বরাতে জুটেছে উপেক্ষা আর অবহেলা। হালফিল অবস্থাটা বদলাচ্ছে। প্রথামুক্ত ক্ষেত্রে কর্মীদের কল্যাণের জন্য কিছুটা তৎপর হয়েছে ভারত সরকার। লিখেছেন **ড. বি ভি ভোসলে।**

"অপ্রথাগত ক্ষেত্রের সংস্থায় কর্মীসংখ্যা দশের নীচে। পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন এবং বিক্রিবাটার কাজে নিরত এসব সংস্থার মালিক একজন বা একটি পরিবার। কখনও কয়েকজন অংশীদার। "অপ্রথাগত ক্ষেত্রের আওতায় পড়ে কোম্পানি ছাড়া বেসরকারি যাবতীয় ব্যবসায়িক সংস্থা।" "অপ্রথাগত ক্ষেত্র বা ঘরগেরস্থালির কাজে নিযুক্ত সব কর্মী অপ্রথাগত শ্রমিক। সামাজিক সুরক্ষার সুবিধাভোগী স্থায়ী কর্মী এবং প্রথাগত ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার কাছ থেকে কোনও সুরক্ষা না পাওয়া কর্মীরা এর আওতায় পড়ে না।" (অসংগঠিত ক্ষেত্রে সংস্থাগুলির জন্য জাতীয় কমিশন, ভারত সরকার ২০০৭—ন্যাশনাল কমিশন ফর এন্টারপ্রাইজেস ইন দ্য আনঅর্গানাইজড সেক্টর।)

চিরাচরিত ক্ষেত্র দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে। এমনকী খুচখাচ কাজকর্মের পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে লাভজনক এবং দক্ষ সংস্থাও কোনও ব্যতিক্রম নয়। এই হককথার প্রথম স্বীকৃতি মেলে 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা'র কাছ থেকে। সংস্থা বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে কর্মসংস্থান মিশন পরিচালনার কাজে হাত দিয়েছিল। প্রথম মিশনটি শুরু হয় ১৯৭২-এ কেনিয়ায়। ক্ষুদ্র ও অরেজিস্ট্রিকৃত উদ্যোগকে কেনিয়া মিশন 'অপ্রথাগত ক্ষেত্র' নামে চালু করে। এই আখ্যাটি প্রথম শোনা যায় ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ও সমাজ নৃতত্ত্ববিদ কীথ হার্টের মুখে ১৯৭১-এ। ঘানার শহরাঞ্চলে অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিয়ে খোঁজখবর চালানোর সময়।

সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে নতুন আগ্রহ গড়ে ওঠায় অপ্রথাগত ক্ষেত্র নিয়ে চর্চা বাড়ছে। অর্থনীতির বিকাশে এই ক্ষেত্রের সামর্থ্য নিয়ে অবশ্য পণ্ডিতমহলে বাদবিতণ্ডা বিস্তর। প্রায় ৯২ শতাংশ শ্রমিক অপ্রথাগত ক্ষেত্রে নিযুক্ত। এই ক্ষেত্রের 'সাইজ' নিয়ে সাচ্চা পরিসংখ্যান অবশ্য এখনও আমাদের হাতে নেই। কিছু সমীক্ষায় বলা হয়েছে অপ্রথাগত ক্ষেত্র ৯৪ শতাংশ। প্রথামুক্ত ক্ষেত্র সম্পর্কে নিয়মিত সমীক্ষা চালানো দরকার। প্রথাগত ক্ষেত্রেও কর্মীদের ৫৮ শতাংশ বস্তুত অপ্রথাগত (ইন্ডিয়া লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট রিপোর্ট ২০১৪, ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, আইএইচডিআর ২০১৪)। দিল্লির ইন্ডিয়ান স্টাফিং ফেডারেশন-এর অধুনা এক সমীক্ষার মতে প্রথাগত ক্ষেত্রে ২ কোটি ৮৮ লক্ষ শ্রমিক চুক্তিভিত্তিক বা অস্থায়ী। সরকারি অস্থায়ী শ্রমিক ১ কোটি ২৩ লক্ষ। এর মধ্যে ১ কোটি ৫০ হাজার খনি ও নির্মাণ কর্মী। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ভাবা হয়েছিল মিশ্র অর্থনীতির দৌলতে চিরাচরিত ক্ষেত্র জোরদার আধুনিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হবে। টুকিটাকি কাজ, অস্থায়ী কাজকর্ম ও খুচরোখাচরা ব্যবসা প্রথাগত অর্থনীতির আওতায় আসবে। হা হতোস্মি! সত্তরের দশক জুড়ে চলল বেকারির দাপাদাপি।

আটের দশকে বিতর্কের আর শেষ নেই পুঁজিবাদী অর্থনীতি, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের পরিবর্তনের হালহকিকত ঠাহর করা নিয়ে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বৃহৎ শিল্প সংস্থাগুলি দেখল অপ্রথাগত ক্ষেত্রে উৎপাদন করে নিলে লাভের কড়ি বাড়ে। নিয়োগকর্তারা চাইল কম মজুরি দিয়ে কাজ সারতে। সামাজিক সুরক্ষার যতটা সম্ভব কম সুযোগসুবিধে দেওয়াই তাদের ইচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ফুলেফেঁপে ওঠার পথ চিকন করতে দরকার অপ্রথাগত ক্ষেত্র। অপ্রথাগত ক্ষেত্রকে আধুনিক অর্থনীতিতে শামিল করার আশা তাই দূরঅস্ত্। (চেন ২০০৪)।

আফ্রিকায় কাঠামোগত সংশোধন কর্মসূচি (স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম) বা সাতের দশকে মেক্সিকো মিরাকল-এর সুবাদে সেখানে অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিদেশি লগ্নিতে বাধানিষেধের ঘেরাটোপ উঠে গেল। উদারীকরণ আর বেসরকারিকরণের পোয়াবারো। প্রথাগত ক্ষেত্রে লোক নিয়োগ কমতে লাগল মেক্সিকোয়। গরিব আর বড়লোকের আয়ের ফারাক বেড়ে গেল। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে অর্থনীতির পালাবদলে অপ্রথাগত ক্ষেত্র ফেঁপে উঠল। ১৯৯১-এ অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেবার পর ভারতেও একই পরিস্থিতি। সরকারি-বেসরকারি সংস্থা কর্মী কমাচ্ছে। সাবকনট্রাকটিং আর আউটসোর্সিং-এর রমরমা। এসবের মোদ্দাফল—শ্রমিকরা ভিড় জমাচ্ছে প্রথামুক্ত ক্ষেত্রে।

আগের সরকার ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচিতে অপ্রথাগত শ্রমিক কল্যাণে কিছু উদ্যোগ নিয়েছিল। গড়া হয় অসংগঠিত ক্ষেত্রে সংস্থাগুলির জন্য জাতীয় কমিশন (ন্যাশনাল কমিশন ফর এন্টারপ্রাইজেস ইন দ্য আনঅর্গানাইজড সেক্টর)। চাষি, খেতমজুর, শ্রমিক ইত্যাদি অপ্রথাগত কর্মীদের কাজ ও জীবিকার মান বাড়ানো ছিল এর লক্ষ্য। অপ্রথাগত ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, শ্রমনীতি, শ্রমিক অধিকার কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে (ন্যাশনাল কমিশন ফর এন্টারপ্রাইজেস ইন দ্য আনঅর্গানাইজড সেক্টর, ভারত সরকার, ২০০৭)।

জাতপাত, সম্প্রদায়, লিঙ্গ ও অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্নতার দরুন শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য করা হয়। তাই শ্রম বাজারের বিভাজন বা খণ্ডীকরণ (লেবার মার্কেট সেগমেন্টেশন) খতিয়ে দেখা খুব কাজে লাগে। অপ্রথাগত ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারী শ্রমিকের মজুরি অনেক সময় কম। ন্যূনতম মজুরি আইন লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির জন্য বহু ক্ষেত্রে কড়া আইনের অভাব। ন্যূনতম মজুরি তাই বহু কর্মীর কাছে খোয়াব মাত্র। মামুলি কাজের জন্য সমাজের নিচু তলা থেকে শ্রমিক জোটানো হয়। কিন্তু দক্ষ কর্মী বা ম্যানেজার উঁচু পদে মৌরসিপাট্টা উঁচু জাতের। শ্রম বাজারে সবচেয়ে ভুক্তভোগী নারীরা। অধিকাংশের বরাতে জোটে ছিটেফোঁটা মজুরির কাজকর্ম। তা ছেড়ে একটু বেশি টাকার কাজে যাবার অবকাশ খুব কম। এদের অধিকাংশ ঘরে বসে ছোটখাট কাজকর্মে নিযুক্ত। বিশ্বায়নের দরুন রোজগারপাতির নতুন নতুন পথ খুলে গেছে। তথ্য প্রযুক্তি, বিপিও, পোশাক শিল্পের রমরমা। কিন্তু এসব তো আর 'স্ট্যান্ডার্ড' কাজ নয়।

অপ্রথাগত শ্রমিকদের কাজের শর্তাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় কমিশন দুটি খসড়া বিল বানিয়েছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল নির্বিশেষে আরও বেশি দেশ শ্রমিকদের কাজের ন্যূনতম শর্ত সুনিশ্চিত করতে আইন প্রয়োগে এগিয়ে আসছে। বিশ্বায়নের দরুন ইদানীং দেখা যাচ্ছে স্বেচ্ছা আচরণবিধি। এই বিধি কতটা মানা হচ্ছে তা দেখাশোনার জন্য আছে তৃতীয় পক্ষ। ভারতে অপ্রথাগত শ্রমিকদের কাজের পারিপার্শ্বিকতা নিয়ন্ত্রণের জন্য কড়া আইনের অভাব। কিছু কাজকর্ম আছে যা ঠিক পরিমাপ করা যায় না। আর এসব ক্ষেত্রে আইনের হাত এড়িয়ে অপ্রথাগত শ্রমিককে শোষণ করা তো জলভাত। প্রথাগত ক্ষেত্রের সংস্থায় কর্মীদের জন্য আইন তুলনায় ঢের সক্রিয়। কয়েকটি রাজ্য অবশ্য অপ্রথাগত শ্রমিকদের কাজের শর্ত নিয়ন্ত্রণে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। এর নজির কেরল— কৃষি শ্রমিক আইন ১৯৭৪, মহারাষ্ট্র কর্মসংস্থান ও কল্যাণ নিয়ামক আইন ১৯৬৯। কিয়ৎ তৎপর তামিলনাড়ু মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত এবং পশ্চিমবঙ্গও। অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কাজ ও কর্মীদের শ্রেণিবিভাগ খতিয়ে দেখা ও চিহ্নিত করাটা জরুরি। কাজকর্মের শর্তাদি ও জীবিকার মানোন্নয়নে এই শ্রেণিবিভাজনের কথা মাথায় রেখে চাই পৃথক পৃথক আইন। আইন ভাঙলে কড়া সাজা দরকার।

জাতীয় কমিশনের সুপারিশ— অন্তত আধ ঘণ্টা বিরতি সহ দিনে আট ঘণ্টা কাজ, সপ্তাহ পিছু একদিন সবেতন ছুটি, একই কাজে নারীদের জন্য পুরুষের সমান মজুরি, প্রাপ্য মজুরি থেকে কোনও জরিমানা আদায় নয়। এছাড়া আছে সংগঠনের অধিকার, কাজকর্মে সুরক্ষা, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ, নারী কর্মীর বাচ্চাদের পরিচর্যার ব্যবস্থা, যৌন লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা, লিঙ্গ—জাতপাত—ধর্মের ভিত্তিতে কোনও বৈষম্য নয়। এসব সুপারিশ রূপায়ণ অবশ্য মুখের কথা নয়, এ এক পাহাড়প্রমাণ কাজ। এজন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও রূপায়ণকারী এজেন্সি/কল্যাণ পর্ষৎগুলির তরফে উদ্যোগ ও জোরালো অঙ্গীকার থাকা চাই। আর দরকার কোনওরকম ঢিলে না দিয়ে কড়া নজরদারি ব্যবস্থা।

কর্মী ও তার পরিবারের হাসপাতালে চিকিৎসা বাবদ বছরে ন্যূনতম বরাদ্দ ২৫০০০ টাকায় বাড়ানো দরকার। ষাট বছরের বেশি বয়েসি বিপিএল কর্মীদের মাসিক পেনশন নিদেনপক্ষে ২৫০০ টাকা করতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে কর্মীদের পরিবারের জন্য এক স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করতে পারে। সংবিধানের ৩৯ ও ৪২ অনুচ্ছেদে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কাজের ন্যায়সংগত ও মানবিক শর্তাদিতে। নির্দেশাত্মক নীতির ৪৩ অনুচ্ছেদে সুষ্ঠু জীবন, ব্যক্তিগত ও সমবায় ভিত্তিতে কুটির শিল্প বিকাশের কথা আছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও সমবায় মারফত সহজ শর্তে ঋণ দিলে চিরাচরিত শিল্পে অতি ক্ষুদ্র বা মাইক্রো সংস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করা যাবে। অংসগঠিত ক্ষেত্রের জন্য জাতীয় তহবিল (ন্যাশনাল ফান্ড ফর দ্য আনঅর্গানাইজড সেক্টর) নামে একটি বিশেষ এজেন্সি গড়ার সুপারিশ করেছে জাতীয় কমিশন। শুরুতে এই বিধিবদ্ধ সংস্থার মূলধন হবে ১০০০ কোটি টাকা। টাকাকড়ি জোগাবে কেন্দ্র, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সরকারি সংস্থা। আমার মনে হয় অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আবাসন ইত্যাদি বিকাশের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে পৃথক বরাদ্দের কথা ভাবা যেতে পারে। এই জাতীয় তহবিলে মুনাফার একটা নির্দিষ্ট অংশ দিতে কর্পোরেট ক্ষেত্রকে নির্দেশ দেওয়া যায়। এরফলে প্রথামুক্ত ক্ষেত্রের কর্মীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ও কল্যাণ হবে।

অপ্রথাগত ক্ষেত্র বিকাশের ক্ষমতা রাখে। কিন্তু এই ক্ষেত্র, শিক্ষা, দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ ও সহায়সম্পদে পিছিয়ে। এখন তাই আরও বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য এই বিশাল ক্ষেত্রকে সাহায্য করাটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্রকে দেখতে হবে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের উন্নয়ন কর্মসূচিতে শ্রমিক কাজ হারা না হয়। কেউ কর্মচ্যুত হলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। বিশেষ রপ্তানি অঞ্চল (সেজ), নতুন নগর, শিল্পকারখানা এবং বিমানবন্দরের মতো বড় প্রকল্পে জমিহারা গরিব মানুষ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পায় না। এর ফলে সরকারের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ জমে। ছোটখাট দোকানদার, রিকশাচালক, হকারের কথা কেউ ভাবে না। এদের জীবিকা ও পুনর্বাসনের দাবি উপেক্ষা করা হয়। এদের কপালে লাঞ্ছনা জোটে পদে পদে। শহরোন্নয়নে এরা পথের কাঁটা বলে ধরা হয়। ঘুষঘাস বা জরিমানা দিয়ে তারা কাজ চালিয়ে যায়। ভারতে শহর উন্নয়ন

পরিকল্পনায় এদের সবার বিকাশকে ঠাঁই দিতে হবে। (জাতীয় কমিশন ২০০৭)।

১৯৯১-এ ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কারের দরুন বাণিজ্য ও শিল্প নীতিতে রদবদল হয়েছে। কম মজুরি দিয়ে উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে শিল্পমহল। এতে কমেছে উৎপাদন ব্যয়। দুনিয়া জুড়ে উৎপাদন ধাঁচে পরিবর্তনের আঁচ থেকে রেহাই মেলেনি শ্রমিকদের। অস্থায়ী ও চুক্তি শ্রমিকের চাহিদা বেড়েছে। প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে উৎপাদন বিকেন্দ্রীভূত হয়েছে। আউটসোর্সিং বা বাইরে থেকে কাজ করিয়ে নেওয়ায় অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়ছে।

অর্থনৈতিক সংস্কারের পর শ্রমিক সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন ভারতে কর্মী অধিকারের লড়াইয়ে তাদের ধার হারিয়েছে। জঙ্গিপনা খুইয়ে ইউনিয়ন এখন সুর নরম করতে বাধ্য। শুধু ধার নয়, পাল্লা দিয়ে কমেছে ইউনিয়ের ভার বা আকারও। সরকারের ওপর চাপ বজায় রাখার ক্ষমতা আর তেমন নেই। সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনগুলি অপ্রথাগত কর্মীদের জন্য তেমন কোনও কার্যকর ভূমিকা পালন করেনি কোনওদিন। বরং তাদের চোখে বড় কলকারখানায় কাজ না করারা শ্রমিক হিসেবে ধর্তব্য নয়। দিন বদলের পালায় আজ প্রথাগত ক্ষেত্রের শ্রমিকও তাদের অধিকার বজায় রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। শ্রমিকের কাছে বিশ্বাসযোগত্যা খুইয়েছে সর্বভারতীয় ইউনিয়নগুলি। অবশ্য দু'একটি ইউনিয়ন ভুল বুঝতে পেরে অপ্রথাগত কর্মীদের সঙ্গে কাজ শুরু করেছে ইদানীং। স্থানীয় ও সংস্থাভিত্তিক ইউনিয়ন আজকাল বেশি করে 'অটোনমি' বা স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা পাচ্ছে। এছাড়া অপ্রথাগত ক্ষেত্রে একটা নতুন দিক উঠে আসছে। এটা হল 'স্বাধীন' ট্রেড ইউনিয়ন। এদের অধিকাংশকে আভিধানিকভাবে শ্রমিক সংগঠন অ্যাখ্যা দেওয়া চলে না। কিছু সংগঠন আবার স্বেচ্ছাসেবী। মূলস্রোতের ইউনিয়নগুলি অপ্রথাগত কর্মীদের অধিকারের ব্যাপারে তেমন গা না লাগানোয় এরা এগিয়ে এসেছে ফাঁকা জায়গা ভরাট করতে (ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ২০১৪)। বিশ্বায়নের দরুন ভারতে কর্মসংস্থান বেড়েছে এবং বিকাশ জোরদার হয়েছে নিঃসন্দেহে। খুঁটিয়ে দেখলে অবশ্য বোঝা যাবে কর্মসংস্থানের মান 'স্ট্যান্ডার্ডাইজড' হয়নি। নতুন কাজে সামাজিক সুরক্ষার কোনও বালাই নেই। নেই কাজ বজায় থাকার নিশ্চয়তা। 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার' এখন শিল্পপতিদের জপমন্ত্র। যেকোনও মুহূর্তে কর্মীর হাতে 'পিঙ্ক স্লিপ' ধরিয়ে দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলা যায়। ২০০৪-০৫ সাল ইস্তক এবং তার পরেও পরিস্থিতি একই রকম। অধিকাংশ কাজ জুটছে অপ্রথাগত ক্ষেত্রে বা প্রথাগত ক্ষেত্রের অপ্রথাগত কাজকর্মে।

ভারতের অর্থনীতিতে পরিষেবা ক্ষেত্রের বাড়বাড়ন্ত লক্ষণীয়। এর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আর্থিক পরিষেবা। এক্ষেত্রে ২০১১-১২-তে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার প্রায় ৮ শতাংশ। আর্থিক পরিষেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো অধিকাংশ পরিষেবা ক্ষেত্রে অপ্রথাগত কর্মী নিয়োগ বেড়েছে। এসব জায়গায় ট্রেড ইউনিয়ন গরহাজির। গ্রাম থেকে ঠাঁইনাড়া হয়ে শহরে আসা গরিবগুরবো মানুষ কাজ জুটিয়ে নেয় প্রথামুক্ত ক্ষেত্রে। মেয়েরা করে ঝিগিরি। এদের মাথাগোঁজার ঠাঁই আর স্যানিটেশনের হাল কহতব্য নয়। অনেকে পথেঘাটে টুকিটাকি কাজকর্মের মাধ্যমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। এদের হাল আরও শোচনীয়। এরা পুলিশ আর পুরকর্মীদের সহজ শিকার। ভারতে শ্রমজীবীদের সংগ্রামের এটাই আদত চিত্র। এদের জন্য আইনি সুরক্ষা কোথায়? অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কর্মীদের প্রথাগত করাটা এখনও অধরা। কিছু অসরকারি সংস্থা, গুজরাতের সেল্‌ফ এমপ্লয়েড উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন, এবং গুটিকয়েক ট্রেড ইউনিয়ন চেষ্টাচরিত্তির চালাচ্ছে। প্রথামুক্ত কর্মীদের প্রথাগত করার 'স্ট্র্যাটেজি' নিয়ে সরকারি নীতি ভাবনাচিন্তা করতে পারে। অ-সরকারি সংস্থা এবং শ্রমিক সংগঠন এই ভাবনাচিন্তায় শামিল হলে ভালো। অপ্রথাগত ক্ষেত্রে খেটেখাওয়াদের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এই তিনপক্ষ ভেবেচিন্তে দেখতে পারে।

অপ্রথাগত ক্ষেত্রের তাকতের ভিত্তিতে ভারতে সকলের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর নতুন পথনির্দেশিকা বা রোড ম্যাপ স্থির করতে হবে। আমি আশাবাদী নতুন সরকার আগামী দিনে এ ব্যাপারে সঠিক নীতি নিয়ে এগোবে।❑

[লেখক মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক।

emil : bvbhosale@sociology.mv.ac.in]

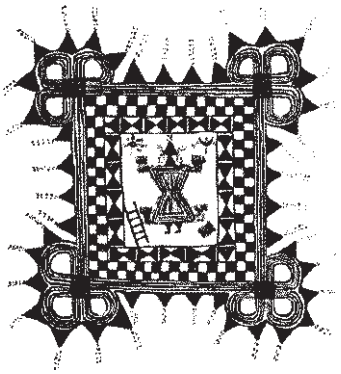

প্রধানমন্ত্রীর জন-ধন যোজনা

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ

প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনার মূল উদ্দেশ্য দরিদ্র অর্থক্লিষ্ট মানুষদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ছত্রচ্ছায়ায় আনা। তাদের জীবনের দুরবস্থার সামান্য হলেও উন্নতি ঘটানো। সরকার তাদের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্প বাবদ যে অনুদান দেন তা তাদের হাতে যাতে পৌঁছোয় তার ব্যবস্থা করা; তাদের কাজকর্মকে, উৎপাদনকে বিমার নিরাপত্তা দেওয়া। এইভাবে একটু একটু করে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং ঝুঁকির সঙ্গে যুঝবার শক্তি, ও ক্ষমতা দেওয়া। এই যোজনাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে নানা সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে আমাদের জানাচ্ছেন **প্রভাকর সাহু।**

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ভারত যে খুব একটা ভালো জায়গায় নেই, তা বলার অপেক্ষাই রাখে না। ২০১২ সালেও ১৫ বছরের বেশি বয়স্কদের মাত্র ৩৫ শতাংশের কোনও বিধিবদ্ধ আর্থিক সংগঠনে অ্যাকাউন্ট ছিল। সারা বিশ্বের বিকাশশীল দেশগুলিতে গড়ে ৪১ শতাংশ মানুষের অ্যাকাউন্ট আছে। রিজার্ভ ব্যাংক-এর তৎপরতায় বর্তমানে ২২৯ মিলিয়নটি প্রাথমিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। বিধিবদ্ধ আর্থিক সংস্থাগুলি এখন সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে। কিন্তু এখনও বহু গ্রাম এমন আছে যেখানে কোনও ব্যাংকের একটিও শাখা নেই। বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণের মাত্র ১০ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে যায় যেখানে মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ বাস করেন। অতএব আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলার আর প্রয়োজন নেই।

এ বছর ২৮ আগস্ট থেকে চালু হয় প্রধানমন্ত্রী 'জন-ধন' যোজনা (পিএমজেডি ওয়াই)। এর লক্ষ্যমাত্রা হল আগামী বছর, অর্থাৎ ২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট-এর মধ্যে ৭.৫ কোটি পরিবারের জন্য ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া। যেদিন এ প্রকল্প চালু হয় ২ কোটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। এই প্রকল্পের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল প্রতিটি ভারতীয়র জন্য ব্যাংকে একটি করে অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া। প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি পরিবারে একটি করে অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক স্বাক্ষরতাও তাদের দেওয়া হবে। ফলে কারও মধ্যস্থতা ছাড়া তারা সহজেই টাকা হাতে পাবে বা অ্যাকাউন্টে জমা করে দিতে পারবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যাদের অ্যাকাউন্ট তাদের জন্য আর্থিক পরিষেবা দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে তাদের ক্ষুদ্র বিমা ও পেনশন দেওয়া হবে। সারা দেশের প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংক-এর শাখা খোলা যেহেতু প্রায় অসম্ভব, তাই অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের সুবিধার্থে ব্যাংক করেসপন্ডেন্ট (BC) নিয়োগ করা হবে। এদের সাহায্য ছাড়া এই প্রকল্প সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করতে পারবে না। দেশের আনাচেকানাচে ব্যাংক-এর সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে ভারত উন্নত দেশগুলির তুলনায় তো বটেই, বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায়ও অনেকটাই পিছিয়ে আছে (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য)। অতএব আর্থিক অন্তর্ভুক্তির এই পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল এবং এর জন্য সরকার যথেষ্ট প্রশংসিত। বাস্তবে, সবার জন্য আর্থিক সংগঠনের সমস্ত সুবিধা সবার নাগালের মধ্যে এনে দেওয়া এবং ঋণদানের ব্যবস্থা করা দেশের আর্থিক উন্নয়ন এবং নতুন উদ্যোগ শুরু করবার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার পক্ষে সত্যিই সহায়ক।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও তার গুরুত্ব

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং সবার জন্য আর্থিক সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করবার সুযোগ করে দেওয়া বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান-এর ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। মূলধনের সঠিক, সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টন এবং ঝুঁকির আশঙ্কা সর্বশ্রেণির সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলেই এই আর্থিক বিকাশ ঘটতে পারে। এছাড়া আর্থিক অন্তর্ভুক্তি মানুষের ভাগে আয়ের অংশ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এবং এর ফলে দারিদ্রের প্রকোপ কমতে থাকে। এছাড়া গরিব মানুষদের জন্য ঋণদানের ব্যবস্থা করে তাদের জন্যও একটু সুযোগ করে দেওয়ার ফলে সামাজিক অসাম্য কমায়। আর্থিক পরিষেবাকে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের নাগালের ভিতরে এনে দেওয়ার ফলে স্বনিযুক্তি ক্ষুদ্র উদ্যোগ, গৃহস্থালিতে ভোগের মাত্রা বাড়া এবং আর্থিক কল্যাণ ইত্যাদির উন্নতি যে ঘটে, তা প্রমাণ করা আজ অত্যন্ত সহজ। বিশেষজ্ঞরা এও বলেন যে দারিদ্র দূরীকরণে ক্ষুদ্র ঋণ একটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার।

ভারতের মতো অপ্রথাগত অর্থনীতিতে গরিব মানুষ টাকা ধার করে আবার সুযোগ বুঝে দেনা মিটিয়ে তাদের রুজি-রোজগার বা ব্যবসাপাতির প্রয়োজন কোনও মতে মেটান। আত্মীয় বন্ধু বা মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করা বা আবর্তনশীল সঞ্চয় প্রকল্পগুলিতে

টাকা জমা রাখা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং এভাবে যতটুকু অর্থ পাওয়া যায় তা আদৌ এদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা একটি নির্ভরযোগ্য প্রকল্প যা দরিদ্রদের যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করতে উৎসাহিত করবে। দক্ষিণ এশিয়া ও ভারতে সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকের পরিষেবা ছড়িয়ে দিতে পারলে তা অবশ্যই সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে যা দেশ ও দশের উপকারে লাগবে।

ভারতের মতো দেশে আর্থিক সংস্কার আনার জন্য আর্থিক ক্ষেত্রে সংস্কার আনাটাই সব সময়ে সব থেকে ভালো ফল দিয়েছে। যে সমস্ত আর্থিক সংগঠন নিরাপদ, ঝুঁকিবিহীনভাবে আর্থিক সুবিধা দিয়ে থাকে এবং মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে, সেগুলি এ দেশের পক্ষে সব থেকে সুবিধাজনক। নির্ভরযোগ্য আর্থিক সংগঠনগুলি যদি উৎসাহব্যঞ্জক আর্থিক সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে উঠতে বাধ্য। উন্নয়নশীল দেশগুলির গ্রামবাসী বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারীরা এ সুযোগ সব সময়ে পান না। এধরনের সুবিধা পেলে গরিব মানুষ প্রয়োজনমাফিক অর্থ ব্যয় করেও সঞ্চয়ের জন্য সচেষ্ট হতে পারে; হাতের টাকা অনর্থক খরচ করে ফেলার প্রবণতা তাদের কমে যায়।

প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা ওভারড্রাফ্ট বা ঋণদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ঋণ পাওয়ার এই সুবিধা পেলে দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রায় উন্নতি ঘটবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে এবং তারা ব্যবসা বা অন্যান্য রুজি-রোজগারের পরিকল্পনাও করতে পারবে এই আর্থিক সহযোগিতার সুবিধা থাকার ফলে। এছাড়া গ্রামের দরিদ্র মানুষজনের জন্য থাকবে ১ লক্ষ টাকার বিমার সুরক্ষা। বিমার এই সুরক্ষা থাকার ফলে এরা কাজে-কর্মে ঝুঁকি নেওয়ার এবং তেমন কোনও আর্থিক ক্ষতি হলে তা সামাল দিয়ে দ্বিতীয়বার শুরু করবার মতো সাহস এবং আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পাবে। এই আর্থিক সমর্থনটুকু না

চিত্র-১ বাংক অ্যাকাউন্ট থাকার হার ১৫ বছরের বেশি বয়স্কদের

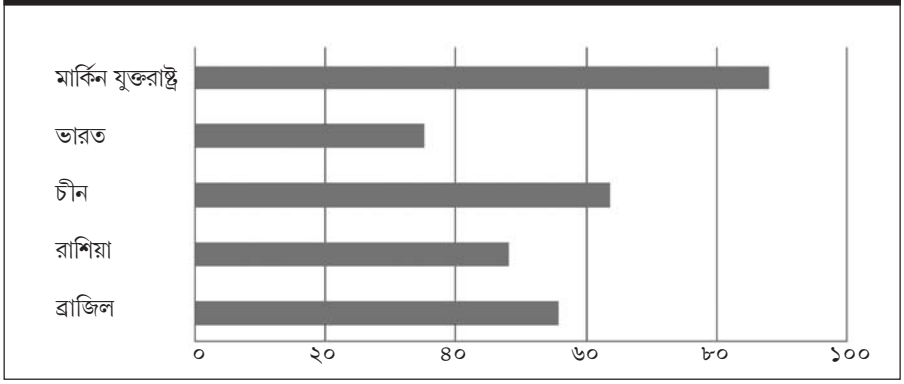

উৎস : বিশ্বব্যাংক ২০১২

থাকার ফলে অনেক সময় দরিদ্র মানুষজনেরা ইচ্ছা ও দক্ষতা থাকলেও নতুন কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন না। যার ফলে তাঁরা দারিদ্ররেখাও অতিক্রম করতে পারেন না। গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-এর শাখা খোলার ফলে মানুষের আর্থিক অবস্থায় একটু-আধটু উন্নতি হতে দেখা যাচ্ছে। আর আর্থিক উন্নতি ছাড়াও, মানুষকে 'প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনার মাধ্যমে' ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় আনতে পারলে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পর সঙ্গে যুক্ত আর্থিক সাহায্য, ভাতা ইত্যাদি তাঁরা সরাসরি পেয়ে যেতে পারেন আর তার জন্য অতিরিক্ত সরকারি ব্যয়েরও প্রয়োজন হবে না।

প্রকল্পের পরিধি ও ব্যাংকিং পরিষেবা

প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলা। কিন্তু ২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট-এর আগে যাঁরা অ্যাকাউন্ট খুলবেন তাঁরা বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা পাবেন, যেমন—একটি 'রু-পে' ডেবিট কার্ড, ১ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমা, এবং ৩০,০০০ টাকা কভারেজ-এর একটি জীবন বিমা। যাঁরা সময় মতো অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিতে থাকবেন তাঁদের ওভারড্রাফ্ট-এর সুবিধা দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনার লক্ষ্য পূরণ করা বড় সহজ কাজ নয়। অ্যাকাউন্ট খুলতে সময় লাগে, জনপ্রতি অন্তত ২০ মিনিট; যাঁরা কোনওদিন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলেননি তাঁদের ক্ষেত্রে হয়তো আরও একটু সময় লাগতে পারে। গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট শাখাগুলিতে ব্যাংক কর্মচারী সংখ্যায় কম। দেরি হওয়ার এটাও অন্যতম কারণ হয়ে উঠতে পারে। আট ঘণ্টায় অর্থাৎ একটা পুরো কাজের দিনে হয়তো সর্বসাকুল্যে ২৪টি অ্যাকাউন্ট খোলা যেতে পারে। বেশ কয়েকবছর আগে রিজার্ভ ব্যাংক এই আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রাথমিক অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ দেয়। প্রায় দশ কোটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয় ঠিকই কিন্তু তাতে সময় লেগে যায় ৩ বছর।

প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা সূচনার দিনে সারা দেশের গ্রাম ও শহর মিলিয়ে ২ কোটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। অ্যাকাউন্ট খোলার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। এইভাবে বাড়তে থাকলে ব্যাংকগুলির ওপর প্রচুর চাপ পড়বে। চিত্র ২ ও ৩-এ ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের ব্যাংকিং পরিকাঠামোর (শাখা এবং এটিএম) তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হয়েছে। ভারতে প্রতি লক্ষ মানুষে ব্যাংক শাখার সংখ্যা কিছু বাড়লেও ব্রাজিল, রাশিয়া ও মেক্সিকোর তুলনায় তা কিছুই নয়।

ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ ব্যাকিং ব্যবস্থার আওতায় এখনও পড়ে না। তারা এখনও মহাজন ও অন্যান্য অপ্রথাগত ঋণদানকারী সংস্থার ওপর নির্ভর করে। বর্তমানে দেশে ১,১৫,০৮২টি ব্যাংক শাখা আছে যার মধ্যে ৪৩,৯৬২ বা ৩৮.২ শতাংশ ব্যাংক গ্রামাঞ্চলের। দেশের মোট এটিএম-এর সংখ্যা ১,৬০,০৫৫ যার মধ্যে ২৩,৩৩৪টি অর্থাৎ মাত্র ১৪.৫৮ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে। প্রতিটি ব্যাংক-কে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় শাখা ও এটিএম গ্রামাঞ্চলে খুলতে হবে—রিজার্ভ ব্যাংক-এর নির্দেশ পাওয়ার

পর এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া আরম্ভ হয়। ডাক বিভাগ এব্যাপারে সব থেকে ভালো কাজ করেছে। এটিএম নেটওয়ার্ককে আরও সফল করে তোলবার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনায় ডেবিট কার্ড-এর ব্যবহার আরম্ভ করার কথা ভাবা হচ্ছে।

চিত্র ৩-এ দেশের এটিএম পরিকাঠামো সম্পর্কে জানানো হচ্ছে যে প্রতি এক লক্ষ মানুষের জন্য ১১টি করে এটিএম আছে। রাশিয়াতে প্রতি ১ লক্ষ জনের জন্য ১৮২টি, ব্রাজিলে ১১৮টি, মেক্সিকোতে ৪৭টি ও চীনে ৩৭টি এটিএম বর্তমান। তবে ভারতে গত ৫ বছরে এটিএম-এর সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বেশ ভালো—সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর জন-ধন যোজনার যত প্রসার ঘটবে এটিএম ও ডেবিট কার্ড ব্যবহারকারীদের সংখ্যাও বাড়তে থাকবে। এর ফলে চাপ বাড়বে ব্যাংকগুলির ওপর তার প্রধান কারণ এটিএম সমস্ত অঞ্চলে সমানভাবে ছাড়ানো নয়।

বিমা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৯ সালে বলবৎ হওয়ার পর থেকে ভারতের বিমা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ছিল মাত্র ৪টি জাতীয় কোম্পানি! সে জায়গায় এখন ৫১টি বেসরকারি বিমা কোম্পানি হয়েছে। ২০১১-১২ সালে বিমা শিল্পের ইকুইটি ক্যাপিটাল ছিল মোট ৩২,৩২৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে জীবন বিমার অংশ ছিল ৭৭ শতাংশ অর্থাৎ ২৫,০০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য বিমার অংশ বাকি ৩৩ শতাংশ। জীবন বিমার তুলনায় দ্বিতীয় ক্ষেত্রটির বৃদ্ধি দ্রুত ঘটেছে। ২০১১-১২ সালে জীবন বিমায় প্রিমিয়ামের হার ৮.৫ শতাংশ কমে যায় (সারা বিশ্বে প্রিমিয়াম ওই সময়ে কমে ছিল ২.৭ শতাংশ)। অন্যান্য বিমার বৃদ্ধি ঘটে ১৩.৫ শতাংশ (অন্যান্য দেশে এই বৃদ্ধির হার ছিল ১.৮ শতাংশ) ২০১১ সালে বিমা সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা, বিমা প্রকল্পের প্রসার এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নানা জিনিসকে বিমার নিরাপত্তা দেওয়া এবং তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে 'প্যান ইন্ডিয়া ইন্স্যুরান্স অ্যাওয়ারনেস ক্যামপেন'-এর সূচনা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা যদি ভালোভাবে কার্যকর করা হয় তাহলে বিমা কোম্পানিগুলির প্রসার শহর থেকে শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলে হওয়া দরকার কারণ গরিব মানুষেরা বিমার দ্বারা ভীষণ উপকৃত হবেন। এর জন্য চাই বিমা পণ্যের অভিনবত্ব, ভালো নেটওয়ার্ক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগের পরিমাণে বৃদ্ধি।

এই সমস্ত কিছু বাবদ বিমা কোম্পানিগুলির প্রয়োজন হবে ৬১,২০০ কোটি টাকা যা ভারতীয় বিনিয়োগ বাজারের পক্ষে তোলা কঠিন। বেসরকারি ও বিদেশি বিমা কোম্পানিগুলির অংশগ্রহণের ফলে (২৬ শতাংশ পর্যন্ত উচ্চসীমা) বিমাক্ষেত্রের অনেকটাই উন্নতি ঘটেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও 'ইনস্যুরান্স পেনিট্রেশন' (অর্থাৎ বছরে প্রিমিয়াম ও জিডিপি-র অনুপাত)-এর পরিমাণ জীবন বিমা ও অন্যান্য বিমা মিলিয়ে মাত্র ৪.১ শতাংশ রয়েছে। অন্যান্য বিমার ক্ষেত্রে বিশ্বে ভারতের অবস্থান ৫২তম। ২০১১-১২ সালে পেনিট্রেশান ছিল ০.৭ শতাংশ (বিশ্বের নিরিখে ২.৮ শতাংশ) জীবন বিমার ক্ষেত্রে দেশে পেনিটেশন হার ছিল ৩.৪ শতাংশ (বিশ্বের নিরিখে ভারত ২.৮ শতাংশ, ইউকে ১২.৫ শতাংশ, জাপান ১০.৫ শতাংশ, কোরিয়া ১০.৩ শতাংশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৯.২ শতাংশ)। আমাদের দেশে বিমাক্ষেত্র যে অনুন্নত, তার আরও একটি সূচক হল বিমা-ঘনত্ব (জনপ্রতি প্রিমিয়াম-এর হিসাব)। ভারতে জীবন বিমা ও অন্যান্য বিমার ক্ষেত্রে যা যথাক্রমে ৪৯ ও ১০ মার্কিন ডলার, চীনে তা ৯৯ ও ৬৪ মার্কিন ডলার। এমতাবস্থায় দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণিভুক্তদের জন্য (যাঁরা প্রাথমিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন) বিমার ব্যবস্থা করে দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত এক নিঃসন্দেহে এক বিরাট পদক্ষেপ। তবে এ ব্যাপারে কতটা সাফল্য আসবে বা না আসবে তা নির্ভর করে এর উপযুক্ত রূপায়ণ ও ব্যাংকিং পরিকাঠামো ও পরিষেবার উন্নয়নের ওপর।

চিত্র-২ প্রতি ১ লক্ষ জনের জন্য ব্যাংক শাখার সংখ্যা

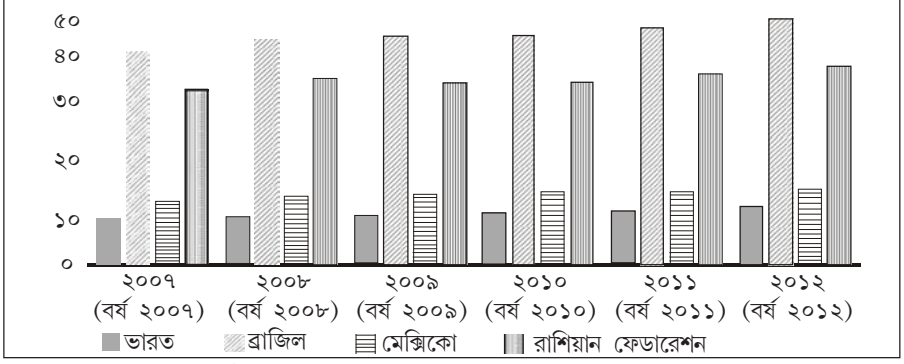

সূত্র : বিশ্ব ব্যাংক-এর বিশ্ব উন্নয়ন সূচক ২০১৪ থেকে নেওয়া।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি—অন্যান্য দেশে

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক বিকাশের জন্য যে সব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত শ্রেণির নাগরিকদের ব্যাংকিং-এর আওতায় আনার প্রক্রিয়া অন্যতম। এর জন্য ব্যাংকিং পরিষেবায় বেশ কিছু নতুনত্ব আনতে হয়েছে সব দেশেই। যেমন, 'করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং মডেল'-এর সূত্রপাত। এক্ষেত্রে ব্যাংক কর্মীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা ও টাকা জমা দেওয়া বা ঋণদান ইত্যাদির কাজ করে থাকেন। এর ফলে সব জায়গায় পৃথক শাখা খোলার ব্যয় ও ঝঞ্ঝাট থাকে না। যেমন ব্রাজিলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই এমন গরিব নাগরিকদের কাছে সরকারি কল্যাণমূলক অনুদান তুলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বহু কর্মী (ব্যাংক করেসপন্ডেন্ট বা বিসি) নিয়োগ করা হয়। ২০০০ সালের মধ্যে ব্রাজিলের এক তৃতীয়াংশ পৌরসভায় ব্যাংক শাখা খোলা হয়। এদিকে ৯৫,০০০ ব্যাংক করেসপন্ডেন্ট মাত্র ৩ বছরে ১২ মিলিয়ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দেয় দেশের সমস্ত পৌর অঞ্চল জুড়ে। ব্রাজিলের এই সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে পেরু, কলম্বিয়া, মেক্সিকো, চিলির মতো দক্ষিণ

চিত্র-৩ প্রতি ১ লক্ষ জনের এটিএম-এর সংখ্যা

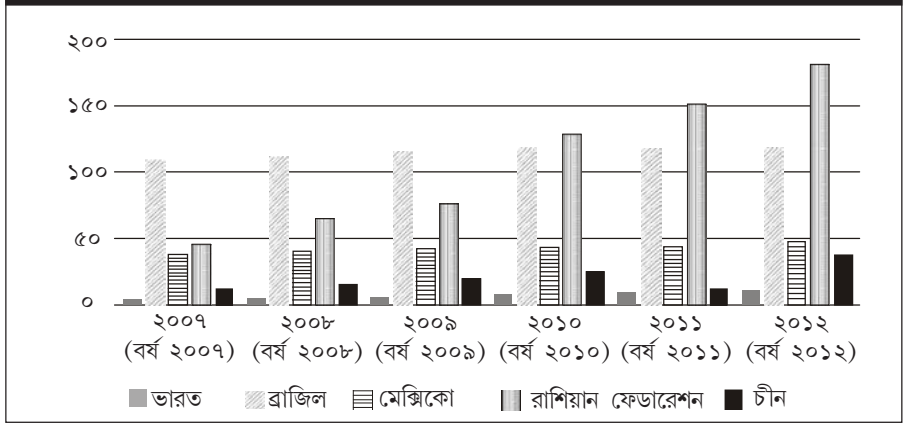

সূত্র : বিশ্ব ব্যাংক-এর বিশ্ব উন্নয়ন সূচক ২০১৪।

আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে, যেখানে ব্যাংক সংক্রান্ত পরিকাঠামো অত্যন্ত অপ্রতুল, সেখানে উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার খুব ভালো ফল দিয়েছে। কেনিয়ার কথাই বলি। সেখানে সাফারিকম নামে সেলফোন নেটওয়ার্ক অপারেটার 'এম-পেসা' নামে মানি ট্রান্সফার সার্ভিস-এর সুবিধা দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ নথিভুক্ত গ্রাহকরা এর দ্বারা উপকৃত। এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পর আর্থিক পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না এমন মানুষের হার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বছরে ৬ শতাংশ হারে কমেছে।

আজ এই বৈদ্যুতিন টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে ৭৫ শতাংশ এরও বেশি সংখ্যক কেনিয়াবাসী আর্থিক পরিষেবার সুবিধা ভোগ করেন। এই একই পদ্ধতি মেক্সিকোতেও চালু হয়েছে। এ দেশে কল্যাণমূলক আর্থিক অনুদানের জন্যও ব্যাংকের ব্যবহার হয়। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণের এই ব্যবস্থা প্রাপক ও প্রেরক উভয়ের পক্ষেই অনেক সুবিধাজনক ও সাশ্রয়কারী। ভারতের জন্যও এমন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবা হচ্ছে। এর ফলে অর্থ সাশ্রয় তো হবেই, দুর্নীতিও রোধ করা সম্ভব হবে।

জন-ধন যোজনার ভবিষ্যৎ

প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনার একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা কিন্তু নয়। তাহলে এই অ্যাকাউন্ট অব্যবহৃত থাকার সম্ভাবনা হয়তো থাকত। এই অ্যাকাউন্ট-এর মাধ্যমে বিভিন্ন কল্যাণমূলক সরকারি প্রকল্পের অর্থ পাঠানো যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সুবিধাভোগীরা নিয়মিত টাকা তুলবেন, জমাও করবেন। মধ্যস্থতাকারীদের অসাধুতা মানুষকে বিব্রত করবে না। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে যেমন অ্যাকাউন্ট খোলার ফলে মানুষের সুবিধা হয়েছে, তেমনি এখানেও অবশ্যই হবে বলে আশা করা যায়। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ বিপরীত মতও পোষণ করেন।

ডাক বিভাগের সাহায্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ঘটানোও আমাদের দেশে সাফল্য লাভ করতে পারে। গ্রামাঞ্চলে অল্প সময়ে নতুন শাখা বা অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার থেকে ডাক পরিষেবার সাহায্য নেওয়া অনেক বাস্তবসম্মত ও ব্যয় সাশ্রয়কারী ব্যবস্থা হবে বলে মনে হয়। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ব্যাংক শাখা গড়ে তোলার আগে দুটি কাজ সারা খুব দরকার। এক, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়াটিকে যথাসম্ভব সহজ করা। আর দুই, সাধারণ মানুষকে অ্যাকাউন্ট খোলার প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। অন্যান্য দেশে এই দুটি বিষয়ের ওপর অনেকটা গুরুত্ব দেওয়া হয়। মূলত ব্যাংক করেসপন্ডেন্টদের মাধ্যমে এই কাজ করানো হয়। প্রধানমন্ত্রীর এই প্রকল্পে ব্যাংকিং-এ মোবাইল ফোন-ও ব্যবহৃত হবে। *99# এই সার্ভিস কোড-এর সাহায্যে অ্যাকাউন্টে কত ব্যালান্স রয়েছে, তা দেখে নেওয়া সম্ভব হবে।

ব্যাংকিং করেসপন্ডেন্টদের দিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলার কাজ করানো গেলেও টাকা তোলা ও সঠিক লোকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার কাজ তাদের দিয়ে করানোয় ঝুঁকি আছে। তাদের বর্তমানে মাসে ১৫০০-২০০০ টাকা করে দেওয়া হয়। এই বেতন একেবারেই অপর্যাপ্ত। সরকার তাদের ৫০০০ টাকা বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাও নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী কর্মী পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ভালো ব্যাংক কর্মী নিয়োগ সরকারের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। সরকারের এই যোজনা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য নানাভাবে কাজ করবে, তা আগেই বলা হয়েছে। এটিএম নেটওয়ার্ক সর্বত্র সমানভাবে গড়ে না তুলতে পারলে এই যোজনা কার্যকর করা কঠিন হবে। গ্রামাঞ্চলে ভারতের ৭০ শতাংশ মানুষের বাস। তাদের জন্য বর্তমানে রয়েছে মাত্র ১৫ শতাংশ এটিএম। তবে ব্যাংক শাখার সংখ্যা এর তুলনায় বেশি। গ্রামাঞ্চলে দিনে ২০০টি অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ ব্যাংকগুলিকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাবে এ কাজ সম্পাদন করা কঠিন। সুতরাং আরও শাখা খুলতে হবে— না হলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির স্বপ্ন যে তিমিরে, সে তিমিরেই রয়ে যাবে।

উপসংহার

প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে এক বিরাট পদক্ষেপ, সন্দেহ নেই। দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। তবে এ পরিবর্তন এক দিনে ঘটবে না। এর জন্য সময় লাগবে, লাগবে সদিচ্ছা।❑

[লেখক দিল্লির 'ইনস্টিটিউট অব ইকোনমিক গ্রোথ'-এ সহযোগী অধ্যাপক।
email:pravakar@iegindia.org]

বি | শে | ষ | নি | ব | ন্ধ

ভারত-বাংলাদেশ বদ্বীপ ও গঙ্গার প্রাকৃতিক প্রবাহ

ভারত ও বাংলাদেশ দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অগণিত মানুষের জীবন ও জীবিকা, জীববৈচিত্র, বাস্তুতন্ত্রের ওপর গঙ্গা-পদ্মা এবং তাদের শাখানদীগুলির প্রভাব অতলস্পর্শী। কিন্তু জলবিদ্যুৎ ও সেচপ্রকল্প, ফারাক্কা বাঁধ, ভূমিক্ষয়, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিভিন্ন বিষয় কীভাবে নদীর প্রাকৃতিক জলপ্রবাহের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে, আলোচ্য নিবন্ধে তা তুলে ধরেছেন দুই বিজ্ঞানী **ড. এইচ এস সেন ও ড. দীপঙ্কর ঘড়াই।** *রয়েছে সমস্যা সমাধানের দিশা-নির্দেশও।*

"দক্ষিণ এশিয়ার গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় অবস্থিত নদীতীরবর্তী দুই প্রতিবেশীর সহযোগিতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্বের ইতিহাসে আর নেই। সদর্থক সহযোগিতা সুনিশ্চিত করা গেলে তার সুফল যেমন সংশ্লিষ্ট দুই দেশের ভবিষ্যৎকে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতায় উত্তীর্ণ করতে পারে, তেমনি অসহযোগিতার শাস্তি হিসাবে এমন বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, যা কল্পনারও অতীত।"—জগন মেহতা

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিস্তৃত নিম্ন গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে হুগলি-ভাগীরথী এবং গঙ্গা/পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র নদীখাতে প্রাকৃতিক প্রবাহ ক্রমশই স্তিমিত হয়ে আসছে। এই প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রেখে বাস্তুতন্ত্র বাঁচাতে অবিলম্বে সার্বিক অন্তর্সমীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। গঙ্গাকে পুনরুজ্জীবিত করে তার প্রতিকূল প্রবণতা রুখে দিলে শুধু যে বাস্তুতন্ত্র বাঁচবে তাই নয়, উন্নত হবে এর দুধারে বসবাসকারী মানুষের জীবন ও জীবিকা। (Sen, 2010, Sen et al., 2012)। এছাড়া সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ভূ-অঙ্গসংস্থান, জলের মান, জীববৈচিত্র প্রভৃতিও প্রাকৃতিক প্রবাহের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (Kaushal, 2014)। এই সবকিছু মিলিয়ে তৈরি হয় সংযুক্ত জলসম্পদ বিকাশ ব্যবস্থাপনা, যার তত্ত্বাবধানে রয়েছে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় জল কমিশন। গঙ্গায় প্রাকৃতিক প্রবাহের ওপর জলবিদ্যুৎ ও সেচ প্রকল্পগুলি বিশেষ প্রভাব ফেলে। এগুলির জন্য কোনও পরিকল্পনা ছাড়া, ফলাফলের হিসাব না করেই জল নিয়ে নেওয়া হয়। সম্প্রতি অবশ্য হিসাবনিকাশের কিছু প্রয়াস চোখে পড়ছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল WWF-India-র কাজ (Kaushal, 2014)। এরা গঙ্গার বিভিন্ন ব্যবহার সবিস্তারে বিশ্লেষণ করছেন। পৃথিবীর যে দশটি বিখ্যাত নদীর অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে, অতিরিক্ত ব্যবহার ও দূষণের কারণে গঙ্গাও তাদের মধ্যে অন্যতম বলে এঁরা মনে করেন (Sanghi and Kaushal, 2014)। ভারতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে দিয়ে বয়ে এসে গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কা বাঁধে পৌঁছোয়। দীর্ঘ এই যাত্রাপথে নদীর অপব্যবহারের যেসব অভিযোগ ওঠে, তা খতিয়ে দেখা দরকার। ফারাক্কার পর গঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। সেজন্য গঙ্গার পুনরুজ্জীবনে দু'দেশের সরকারকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

ফারাক্কা বাঁধ এবং ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি

গঙ্গার ওপর বাঁধ নির্মাণ করে এর জলপ্রবাহ ভাগীরথীর দিকে ঘুরিয়ে দেবার প্রস্তাব প্রথম দিয়েছিলেন স্যার আর্থার কটন, ১৮৫৩ সালে। সেই মতো হুগলি-ভাগীরথীর ১৭ কিলোমিটার উজানে পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কায় এই বাঁধ নির্মিত হয়। হুগলি-ভাগীরথী যেমন ভারতের মধ্যে দিয়ে বইছে, তেমনি পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা ও তার শাখানদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছে বাংলাদেশে। সবকটি নদীই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে গিয়ে মেশে। গঙ্গাবক্ষে পলি কমিয়ে কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বাড়াতে এবং গ্রীষ্ম মরশুমে ভারত ও বাংলাদেশে জলের জোগান বাড়াতে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল, এই দুটি লক্ষ্যের কোনওটিই পূরণ করা সম্ভব নয়।

পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনায় জলের জোগানের স্বল্পতা দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর দু'দেশের মধ্যে কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রথম চুক্তিটি ১৯৭৪ সালে, দ্বিতীয়টি ১৯৭৭ সালে এবং পরবর্তীকালে আটের দশকে আরও দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু কোনওটির মাধ্যমেই ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। গঙ্গার জলবণ্টন নিয়ে ১৯৯৬ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে তিরিশ বছর মেয়াদি যে চুক্তিটি বর্তমানে কার্যকর রয়েছে, তার ভিত্তি হল গত চার দশকে (১৯৪৯-১৯৮৮) গঙ্গার গড় জলপ্রবাহ। কিন্তু ১৯৭৭ সালে যে জলপ্রবাহের হিসাব করা হয়েছিল, তার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার আকাশ-পাতাল তফাত। গত কয়েক দশকে গঙ্গার ওপর বহু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও সেচ প্রকল্প গড়ে উঠেছে। ক্রমশই পরিবর্তিত হয়েছে এর গতিপথ।

জলবিদ্যুৎ ও সেচ এবং জলের মান

গঙ্গার ভাগীরথী ও অলকানন্দা অববাহিকায় প্রচুর জলবিদ্যুৎ ও সেচ প্রকল্প গড়ে উঠেছে। (Sanghi and Kaushal, 2014, South Asia Network on Dams, Rivers and People.) গঙ্গার জলপ্রবাহ বরাবর যে প্রকল্পগুলি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে এবং যেগুলি নির্মাণকাজ চলছে, তাদের তালিকা দীর্ঘ। কেবল উত্তরাখণ্ডেই অলকানন্দা, ভাগীরথী ও তার শাখানদীগুলির ওপর প্রচুর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। গঙ্গার বিপুল পরিমাণ জল এই কেন্দ্রগুলিতে ব্যবহার করা হয়। (সারণি-১) (Wildlife Institute of India, 2012.) এছাড়া এই গতিপথে নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট দূষণের বহু উৎসও ধরা পড়েছে। (Sanghi and Kaushal, 2014.)

প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, সরকার পরিস্থিতির মোকাবিলায় যে ব্যবস্থা নিয়েছে, (GAP-I in 1985, GAP-II, 1993, National River Conservation Plan in 1996) তার মিশ্র ফল মিলেছে। ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। (Sanghi and Kaushal 2014, National River Conservation Directorate, 2009.) নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহের সবকটি উপাদানের ওপর জলবায়ু পরিবর্তন গভীর প্রভাব ফেলে। সকলেই এখন জানেন, বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে হিমবাহগুলি বিশেষত হিন্দুকুশ হিমালয়ের হিমবাহগুলি দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে। এর জেরে হিমবাহ থেকে অববাহিকায় জলের প্রবাহ এই শতকের শেষে ২৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ কমে যেতে পারে বলে কাঠমান্ডু ভিত্তিক সংস্থা International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। (দেখুন the thirdparty.net)

জাতীয় নদী সংরক্ষণ নির্দেশনালয় অবশ্য জানাচ্ছে, কার্যক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নদীর জলের গুণগত মান বেড়েছে। জনসংখ্যা এবং জৈব দূষণ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে জলের গুণগত মানের বিচার করা উচিত। চালু প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হলে এবং বর্জ্য জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে জলের গুণগত মান বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে GAP পূর্ববর্তী ও GAP পরবর্তী মূল্যায়নে DO, BOD ও জীবাণুর মতো তিনটি মাপকাঠিতে বিচার করলে এই গুণমান এখনও আদৌ সন্তোষজনক নয়। ক্ষীয়মাণ জলপ্রবাহ এবং জলের গুণগত মান ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার ঘটনা নদী অববাহিকায় থাকা মানুষজনের জীবিকার ওপরেও বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বাঁশগাছের চাষ-এর অন্যতম নিদর্শন। (Ghorai and Sen, 2014.)

নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকায় বাস্তুতন্ত্রের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ও পলির সমস্যা

ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের জেরে উচ্চ অববাহিকায় রাজমহল থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত এবং নিম্ন অববাহিকায় ফারাক্কা থেকে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। জলস্তর পরিবর্তন, পলি জমা প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে নদীপাড় ক্ষয় চরম রূপ ধারণ করে। পলি জমার ফলে গঙ্গা ও পদ্মায় নদীভাঙন আরও গতি পায়। এর প্রভাবে নাব্যতা নষ্ট হয়, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনচক্রের ওপর নানা ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। (Parua, 2009.)

ফারাক্কা ও রাজমহলের মধ্যে ঝাড়খণ্ডের ৫৩ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তন এবং তার প্রভাবে নদীভাঙন ও বন্যা নিয়ে ১৯৫৫ থেকে ২০০৫ সময়কালে LANDSAT ও Indian Remote Sensing Satellite বা দূরসংবেদী উপগ্রহ চিত্রের সাহায্যে একটি বিস্তৃত সমীক্ষা করা হয় (Thakur, 2014)। এতে দেখা গেছে, নদীপাড়ে মাটির স্তর, কঠিন পাথুরে শিলার উপস্থিতি, বিপুল পরিমাণ পলি, পলি সংস্কারের কাজ না এগোনো এবং ফারাক্কা বাঁধের নির্মাণ নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। মালদার মানিকচক, কালিয়াচক ২, কালিয়াচক ৩ এবং রতুয়া ১ নম্বর ব্লকে ১৯৭৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৬৭০ হেক্টর কৃষিজমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে (Thakur, 2014)। মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা নদীভাঙন ও বন্যার কবলে। এর জেরে জেলার বহু মানুষ ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়েছেন। (Banerjee 1999, Rudra 2004.)

বাংলাদেশেও একই কারণে বিপুল ক্ষতি হয়েছে, বারে বারে বন্যার করাল গ্রাসে পড়তে হয়েছে নদীমাতৃক এই দেশটিকে। (Islam et al 1999, Banglapedia.)

সারণি-১
উত্তরাখণ্ডে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির জন্য অলকানন্দা, ভাগীরথী ও তাদের শাখানদীগুলির প্রভাবিত অংশ

নদী	নদীর মোট দৈর্ঘ্য (মিটার)	পরিবর্তিত গতিপথ (মিটার)	প্লাবিত অংশ (মিটার)	প্রভাবিত অংশের দৈর্ঘ্য (মিটার)	শতাংশে গতিপথ পরিবর্তন	শতাংশে প্লাবিত অংশ	শতাংশে প্রভাবিত অংশ
ভাগীরথী অববাহিকা							
ভাগীরথী	২,১৭,০০০	৬৮,০৩১	৮৫,৪০০	১,৫৩,৪৩১	৩১	৩৯	৭০.৭১
অসিগঙ্গা	২০,৫০০	১০,৯৪৫	০	১০,৯৪৫	৫৩	০	৫৩.৩৯
ভিলানগঙ্গা	১,০৯,০০০	২০,৩৬৯	১৯,০০০	৩৯,৩৬৯	১৯	১৭	৩৬.১২
বালগঙ্গা	৩৭,০০০	১৪,৭২১	০	১৪,৭২১	৪০	০	৩৯.৭৯
ছোট শাখানদী	৭৩,০০০	১৬,৪০১	০	১৬,৪০১	২২	০	২২.৪৭
অলকানন্দা অববাহিকা							
অলকানন্দা	২,২৪,০০০	৬০,৪১২	৪৭,১০০	১,০৭,৫১২	২৭	২১	৪৮.০০
ধৌলিগঙ্গা	৫০,০০০	৪৬,৭৯৪	০	৪৬,৭৯৪	৯৪	০	৯৩.৫৯
ঋষিগঙ্গা	৩৮,৫০০	১০,৪২৬	৬০০	১১,০২৬	২৭	২	২৮.৬৪
বিরহীগঙ্গা	২৯,৫০০	২১,৯২৬	০	২১,৯২৬	৭৪	০	৭৪.৩২
নন্দাকিনী	৪৪,৫০০	১৫,৫০৭	০	১৫,৫০৭	৩৫	০	৩৪.৮৫
মন্দাকিনী	৮১,০০০	৩৪,৮৭৫	৫০০	৩৫,৩৭৫	৪৩	১	৪৩.৬৭
পিন্ডার	১,১৪,০০০	২৪,৯৭৪	১০,০০০	৩৪,৯৭৪	২২	৯	৩০.৬৮

সূত্র : Wildlife Institute of India, 2012.

জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি

নিম্ন বদ্বীপ অঞ্চলে জলপ্রবাহ কমে যাওয়ার প্রভাব এই অঞ্চলে, বিশেষত দুদেশের মধ্যে বিস্তৃত সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের ওপর কতটা পড়েছে, তা নিয়ে প্রায়শই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। বর্তমানে এখানকার বাস্তুতন্ত্র দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। বনাঞ্চলে খুব দ্রুত লোপ পাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। তবু এখনও সুন্দরবন বহু দুর্লভ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর ধাত্রীভূমি।

জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের নেপথ্যে যে কারণগুলি রয়েছে, তা চিহ্নিত করা গেছে। এর অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নদীর জলপ্রবাহ হ্রাস এবং বিভিন্ন নৃতত্ত্বঘটিত কারণের সঙ্গে যুক্ত।

নদীর জল ছাড়া এবং বাংলাদেশে লোনা জলের অনুপ্রবেশ : একটি বিশ্লেষণ

নিম্ন গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার অধিকাংশই বাংলাদেশে। এই এলাকাটির ওপর বিশেষ মনোযোগ দেবার প্রয়োজন রয়েছে। ১৯৭০ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত গঙ্গার জল ছাড়ার যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে, ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের পর সেদেশে শুখা মরশুমে (নভেম্বর-মে) জলের সরবরাহ ৮২% পর্যন্ত কমেছে। (Afroz and Rahman, 2013) তবে ফারাক্কার কারণে জলপ্রবাহ হ্রাসে তাদের বাস্তুতন্ত্র ও অন্যান্য উপাদানের ক্ষতির যে পরিসংখ্যান বাংলাদেশ তুলে ধরে, তার গণনার ভিত্তি বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ায় সেগুলি অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। আবার ভারত যে হিসাব দেখায়, তার ভিত্তি ফারাক্কা-পূর্ব সময়ের ওপর আধারিত হওয়ায় যেটিও বাস্তবোচিত হয়ে ওঠে না।

ভবিষ্যৎ নীতি ও উপসংহার

নিম্ন গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে ভারত ও বাংলাদেশে বাস্তুতন্ত্র একই ধরনের। সেজন্য ফারাক্কা বাঁধের দরুন নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং জলের দূষণ দুটি দেশকে একইভাবে প্রভাবিত করে। অভিন্ন এই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সার্বিক ও সুনির্দিষ্ট ভাবনাচিন্তা প্রয়োজন। এ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রস্তাবের উল্লেখ করা হল।

- ফারাক্কা বাঁধের নকশা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত। দু'দেশের স্বার্থে নতুন করে খতিয়ে দেখা উচিত জলবণ্টন ও জল সরবরাহ সংক্রান্ত বিধিনিয়মগুলি। প্রয়োজনে নতুন নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত।
- গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের যে জলপ্রবাহের হিসাব করা হয়েছে, তা নতুন করে পর্যালোচনা করা দরকার। এর উৎস তিব্বতের হিমবাহ থেকে, যা জলবায়ু পরিবর্তন ও উষ্ণায়নের কারণে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তিত বাস্তবতার মাপকাঠিতে ফারাক্কা বাঁধ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ নতুন করে নির্দিষ্ট করা দরকার।
- ভারতে নতুন জলবিদ্যুৎ ও সেচ প্রকল্পের ছাড়পত্র দেবার আগে নদীর জলপ্রবাহের ওপর তার প্রভাব খতিয়ে দেখা বাধ্যতামূলক করা উচিত। বাস্তুতন্ত্র যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা আবশ্যক।
- আগে তৈরি যেসব প্রকল্প ইতিমধ্যেই কার্যকর, সেগুলির ক্ষেত্রেও নদীর জলপ্রবাহের ওপর তাদের প্রভাব নতুন করে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে নতুন বিধিনিয়ম প্রণয়ন করা উচিত।
- বেসরকারি সংস্থাগুলি যাতে নিজেদের ইচ্ছামতো নদীর গতিপথ অবরুদ্ধ করতে না পারে সেজন্য কড়া প্রশাসনিক নজরদারি থাকা দরকার।
- নদীর সম্পূর্ণ গতিপথ জুড়ে এলাকাভিত্তিক সংযুক্ত জল উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে তাতে স্থানীয় মানুষজনের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। নদীতে দূষণ যাতে না ছড়ায়, তার ওপর নজর রাখার দায়িত্বও থাকবে তাঁদের।
- ভারতে, বিশেষত নিম্ন বদ্বীপ অঞ্চলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করে সেখানকার জমি, জলপ্রবাহ, জোয়ার-ভাটা, পলি পড়ার হার, নাব্যতা, জলের মান, জীববৈচিত্র্যসহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠির সাপেক্ষে সার্বিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে। এই কাজের জন্য গড়ে তুলতে হবে কেন্দ্রীয় টাস্ক ফোর্স, যার সদস্য হবেন বিজ্ঞানী, সরকারি আধিকারিক, স্থানীয় মানুষজন, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রমুখ। একই ধরনের কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে বাংলাদেশেও। দুটি দেশের সংশ্লিষ্ট প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে একটি দল গড়তে হবে। এই দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে নিয়মিতভাবে আলোচনা ও মতবিনিময় করবেন। প্রতি বছর কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন তাঁরা।

এটাও মনে রাখা দরকার যে, দু'দেশের নিম্ন বদ্বীপীয় অঞ্চলের অনেকটাই উপকূলভাগে অবস্থিত। তাই যে কোনও সময়েই প্রাকৃতিক বিপর্যয় সবকিছু তছনছ করে দিতে পারে। একে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কারওর হাতেই নেই। তাই সাফল্যের কোনও সহজ রাস্তা বের করা সম্ভব নয়। দুটি দেশের অগণিত মানুষের জীবন ও জীবিকা এবং বাস্তুতন্ত্র, নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহের ওপর নির্ভরশীল। যে কোনও মূল্যে তা অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন।❑

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শেখ গোলাম রসুল, প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট (কম্পিউটার), KVK বর্ধমান।

[ড. সেন ব্যারাকপুরের সেন্ট্রাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট ফর জুট অ্যান্ড অ্যালায়েড ফাইবারস-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর।

email : hssen.india@gmail.com

ড. ঘড়াই বর্ধমানের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ।

email : dipankarghoraikvk.gmail.com]

বি | শে | ষ | নি | ব | ন্ধ

উপকূলের অধিকার

বিশ্বায়নের দ্রুতগতি পৃথিবীকে উষ্ণায়নের মতো ধ্বংসাত্মক বিপত্তির মুখে ঠেলে দিয়েছে। মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট হলেও, তার সীমাহীন লোভ নিবারণ করা অসম্ভব। এর ওপর রয়েছে যথেষ্ট অপচয় ও সুষম বণ্টন ব্যবস্থার অভাব। এই পরিস্থিতিতে সমুদ্রতলের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি কাজে লাগানোর আড়ালে পরিবেশের পরিণতি প্রসঙ্গে বিভিন্ন শঙ্কা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন **আনন্দ গুপ্ত।**

এই মানবসভ্যতা প্রকৃতির দান। প্রকৃতি শুধু মানুষ সৃষ্টিই করেনি, তাকে খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, সম্পদ দিয়ে সমৃদ্ধিশালী করেছে।

মানুষের জন্য প্রকৃতি তার ভাণ্ডার সাজিয়ে রেখেছে মাটির উপরে, মাটির নীচে। যে ভাণ্ডার প্রকৃতি সাজিয়ে রেখেছিল তা সহজে ফুরিয়ে যাবার কথা ছিল না, কারণ এর মধ্যে অনেক সম্পদই তো পুনরুৎপাদনযোগ্য। প্রকৃতি নিজেই তা পুনরুৎপাদন করে নিত, শুধু তার জন্য তাকে দিতে হত কিছুটা সময়। কিন্তু মানুষ তার অতিরিক্ত লোভের কারণে পুনরুৎপাদন-অযোগ্য সম্পদগুলিকে তো প্রায় শেষ করেই এনেছে, এমনকী পুনরুৎপাদনযোগ্য সম্পদগুলিও বহু ক্ষেত্রে আজ নিঃশেষিত হবার মুখে, প্রকৃতিকে যথেষ্ট সময় না দেবার জন্য।

মাটির উপরে ও নীচের সম্পদকে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলে এবার মানুষের লোভের দৃষ্টি পড়েছে জলের তলার সম্পদের উপর। জল বলতে সমুদ্র। যে সমস্ত দেশের উপকূলীয় সীমানা আছে তারা সেই অঞ্চলের সমুদ্রের কিছু দূর অবধি এলাকা নিজেদের বলে দাবি করতে শুরু করে। এই নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনা, চুক্তিও সম্পাদিত হতে থাকে। উপকূলীয় দেশগুলির দাবিও স্বীকৃত হয়। হয় বলেই আজকে বোম্বে হাই-এর তেলের মালিকানা ভারতের। কিন্তু সমুদ্রের উপর এই মালিকানাই অতঃপর অন্য সমস্যার জন্ম দিতে থাকে। উপকূল অঞ্চলগুলিতে শুরু হয় নানাবিধ 'উন্নয়নমূলক' কাজকর্ম, বিঘ্নিত হতে শুরু করে সেই সব অঞ্চলের পরিবেশ। এই সব অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পায়ে বেড়ি পরাতে আইন প্রণয়নের শুরুও এই সূত্রেই।

এক

ভারতে নিয়ন্ত্রিত উপকূলীয় অঞ্চল (কোস্টাল রেগুলেশন জোন) সংক্রান্ত সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিটি জারি হয়েছে ২০১১ সালে। ২০১১ সালের জানুয়ারিতে তৎকালীন পরিবেশমন্ত্রী জয়রাম রমেশ বিজ্ঞপ্তিটি জারি করার পর থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। এই বিজ্ঞপ্তি কি উপকূলীয় অঞ্চলে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজকর্মে রাশ টানার জন্য, নাকি প্রকারান্তরে তাকে উৎসাহিত করার জন্য, বিতর্ক এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই।

ভারতের উপকূল রেখাটি দৈর্ঘ্যে ৭৫১৭ কিলোমিটার। বিস্তীর্ণ এই উপকূলীয় অঞ্চলটি একদিকে জৈববৈচিত্রে অন্যদিকে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। প্রায় পুরো উপকূল অঞ্চল জুড়ে দীর্ঘ পর্বতমালা এই জৈববৈচিত্রের চারণভূমি, আর সমুদ্রগর্ভ সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে উপকূল অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, যোগ হয়েছে বন্দরের সুবিধা, যোগ হয়েছে বায়ু ও সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা। ফলে সমগ্র উপকূল অঞ্চল জুড়ে বন্দরের সুবিধা নেবার জন্য নানাবিধ শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, পর্যটনকে কেন্দ্র করে হোটেল ও আনুষঙ্গিক শিল্পের দাপাদাপিতে বিনষ্ট হচ্ছে জীববৈচিত্র, ব্যাহত হচ্ছে স্থানীয় জেলেদের জীবনযাত্রা।

উনিশশো সত্তরের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে উন্নয়নমূলক নির্মাণের ঘটনা বাড়তে শুরু করে, যা ব্যাপক আকার ধারণ করে ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে। ১৯৮১ সালে এই ব্যাপারে উদ্যোগী হন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। এর ফলে ১৯৮৩ সালে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক 'এনভায়রনমেন্টাল গাইডলাইনস ফর বিচেস' নামক একটি নির্দেশিকা জারি করে (শ্রীধর ও শংকর ২০০৬)। এরপরই ১৯৯১ সালে 'নিয়ন্ত্রিত উপকূলীয় অঞ্চল (সি আর জেড)' সংক্রান্ত প্রথম বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিটিতে সর্বোচ্চ জোয়ার রেখা থেকে ভেতর দিকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত এলাকার বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ জারির কথা বলা হয়। এই বিজ্ঞপ্তি লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জসহ ভারতের প্রতিটি উপকূলীয় অঞ্চল, সাগর, উপসাগর, নদী বা খাঁড়ির মতো যে সমস্ত জলাশয়ে জোয়ারের প্রভাব পড়ে তাদের উপকূল অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বলে জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তির অধীন যে এলাকা তাকেই নিয়ন্ত্রিত উপকূলীয় অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও তাকে বিশেষ কার্যকরী করে তোলা যায়নি। না যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এটিকে কার্যকর করার প্রধান ভার যাদের উপর দেওয়া হয়েছিল সেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি এই ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হয়নি। সরকারের এই উদ্যোগহীনতাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর এনভায়রো-লিগাল অ্যাকশন বনাম ভারত সরকার) হলে কেন্দ্র সরকার এই ব্যাপারে তার অক্ষমতা স্বীকার করে নেয়। সুপ্রিম

কোর্ট তার রায়ে পরিষ্কার বলে সরকারের এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে পরিবেশের সুরক্ষার প্রশ্নটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ সুরক্ষিত করতে যে সব কাজ হচ্ছে তা বন্ধ করতে সরকারি বিজ্ঞপ্তিটির যথাযথ রূপায়ণে সরকারকেই উদ্যোগী হতে হবে। তারপর ১৯৯৬ সালে প্রায় একই ধরনের একটি জনস্বার্থ মামলায় (এস. জগন্নাথ বনাম ভারত সরকার) সুপ্রিম কোর্ট উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের সুরক্ষার জন্য ১৯৮৬ সালের পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন অনুযায়ী একটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ গঠনের নির্দেশ দেয়, যে কর্তৃপক্ষ ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তিটির যথাযথ রূপায়ণের বিষয়টি দেখবে। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৮ সালে একটি জাতীয় উপকূলীয় অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (ন্যাশনাল কোস্টাল জোন অথরিটি) এবং উপকূলীয় রাজ্যগুলির জন্য একটি করে রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল কর্তৃপক্ষ গঠন করে। কিন্তু আদালতের ধাক্কা খেয়ে এতদূর পর্যন্ত এগোলেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। উপকূলীয় রাজ্যগুলির নিজেদের রাজ্যের জন্য একটি করে 'কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান' তৈরির কথা থাকলেও কোনও রাজ্যই তা করে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রককে দিয়ে অনুমোদিত করিয়ে নেয়নি।

তবে ব্যর্থতার পুরো দায়টি রাজ্যগুলির উপর চাপিয়ে দিলেও চলবে না। এই ব্যাপারে কেন্দ্রে টালবাহানাও কম ছিল না। কেবলমাত্র ১৯৯১-২০০৩—এই কয়েক বছরেই মূল বিজ্ঞপ্তিটিতে সংশোধনি আনা হয়েছিল উনিশটি। এবং এই প্রতিটি সংশোধনীতেই কার্যত যেটা হয়েছিল তা হল যে সমস্ত কাজকর্মকে ইতিপূর্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল সেগুলিকে একটি একটি করে বৈধতা দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে ২০০৪ সালে একটি রিভিউ কমিটি গঠন করা হয় এম.এস. স্বামীনাথনের নেতৃত্বে। ১৯৯১ সালে বিজ্ঞপ্তিটির মূল্যায়ন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন প্রস্তাব কিছু থাকলে তা দেবার ভার দেওয়া হয় এই কমিটির উপর। ২০০৫ সালে কমিটি যে রিপোর্ট দেয় তাতে একটি সুসংহত উপকূল অঞ্চল পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া সি.আর.জেড.-এর মধ্যে কেবল আন্তর্দেশীয় স্থলভাগকেই নয়, জলভাগকেও (উপকূল থেকে সমুদ্রের ১২ মাইল গভীর পর্যন্ত যে অঞ্চলকে সংশ্লিষ্ট দেশের আন্তর্জাতিক সীমানা বলে গণ্য করা হয়) অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশের ভিত্তিতে পরিবেশ মন্ত্রক ২০০৮ সালে একটি খসড়া বিজ্ঞপ্তি তৈরি করে তার উপর সাধারণ মানুষের মতামত আহ্বান করে। খসড়া প্রকাশ হবার পর থেকেই সমালোচনার ঝড় ওঠে। তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে উপকূলীয় এলাকার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সংগঠনগুলি। 'ন্যাশনাল ফিশ ওয়ার্কার্স ফোরাম' এবং আরও কিছু মৎস্যজীবী সংগঠন এবং কিছু অ-সরকারি সংগঠন একত্রিতভাবে আন্দোলন চালানোর জন্য 'ন্যাশনাল ক্যাম্পেন ফর দ্য প্রোটেকশন অফ দ্য কোস্ট' নামে একটি বৃহত্তর মঞ্চ গড়ে তোলে (শর্মা, ২০১২)।

সম্মিলিত প্রতিবাদের সামনে পড়ে সরকার ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে খসড়াটিকে পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেয়। দায়িত্ব দেওয়া হয় 'পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি অন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট'-এর উপর। ২০০৯ সালের মার্চ মাসে স্ট্যান্ডিং কমিটি রিপোর্ট দেয় যতদিন না উপকূল অঞ্চলের জনসম্প্রদায়গুলির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে তাদের দাবিগুলির যথাযথ বিবেচনা সাঙ্গ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই বিজ্ঞপ্তি কার্যকর করা থেকে বিরত থাকতে হবে। খসড়া বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদ করছিলেন তাঁদের প্রধান বক্তব্য ছিল নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তিটির উপর ভিত্তি করেই, বাদ দিতে হবে ২৫টি সংশোধনীকে (ততদিনে সংশোধনীর সংখ্যা পঁচিশে পৌঁছে গেছে)। স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে খসড়া বিজ্ঞপ্তিটিকে পুনর্গঠনের জন্য স্বামীনাথনের নেতৃত্বেই দ্বিতীয়বার যে কমিটি গঠন করা হয় সেই কমিটি সমালোচকদের বক্তব্য মেনে নেয়। ২০১০ সালের এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরের নতুন বিজ্ঞপ্তির যথাক্রমে একটি প্রাক-খসড়া ও খসড়া সাধারণের মতামতের জন্য পরিবেশ মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়।

কিন্তু প্রতিবাদ এই খসড়াটির বিরুদ্ধেও ওঠে। অক্টোবরের ২৯ তারিখে মৎস্যজীবীদের একটি সর্বভারতীয় ধর্মঘট সংগঠন করে ন্যাশনাল ফিস ওয়ার্কার্স ফোরাম। উপকূলবর্তী রাজ্যগুলির তরফে পরিবেশমন্ত্রীকে কয়েকটি চিঠিও দেওয়া হয়। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ মন্ত্রক ডিসেম্বর মাসে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সংগঠনগুলির সঙ্গে আরেকদফা আলোচনার পর ২০১১ সালের জানুয়ারিতে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তিটি জারি করে।

দুই

নিয়ন্ত্রিত উপকূল অঞ্চল ২০১১ শীর্ষক বিজ্ঞপ্তিটি জারি করার সময়ই পরিবেশ মন্ত্রক এর উদ্দেশ্যগুলিও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। পরিবেশ মন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তির উদ্দেশ্য হল—১. উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও অন্যান্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবিকার প্রশ্নটিকে সুরক্ষিত করা; ২. উপকূল অঞ্চলকে সংরক্ষণ করা ও সুরক্ষা দেওয়া এবং ৩. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা ও বিশ্ব উষ্ণায়নের কথা মাথায় রেখে উপকূলীয় অঞ্চলে বিকাশমূলক কাজকর্মকে বৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

নিয়ন্ত্রিত উপকূলবর্তী অঞ্চল বলতে কোন অঞ্চলটিকে বোঝানো হবে সে প্রশ্নে ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তিটির থেকে এক ধাপ এগিয়েছে ২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তিটি। ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তিতে উপকূল অঞ্চলের জলভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তি সেটা করেছে। সমুদ্রের ভেতর দিকে ১২ মাইল পর্যন্ত এলাকাকে নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ১২ মাইলের হিসাবটি হবে তটভূমির সর্বনিম্ন জোয়ার রেখা থেকে। সর্বোচ্চ জোয়ার রেখা বলতে জোয়ারের সময় সবচেয়ে নিচু ঢেউটি তটভূমির যে পর্যন্ত যায় সেটিকে বোঝানো হচ্ছে।

নতুন আরেকটি যে ধারণার প্রবর্তন ২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তিতে করা হয়েছে সেটি হল 'হ্যাজার্ড লাইন'। কোনও একটি উপকূলে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঢেউয়ের উচ্চতা,

সারণি-১

কোস্টাল রেগুলেশন জোন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

	১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তি		২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তি	
	কোন অঞ্চল	কী বিধিনিষেধ	কোন অঞ্চল	কী বিধিনিষেধ
CRZ I	যে সমস্ত অঞ্চল বাস্তুতান্ত্রিক দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল (যেমন জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, জলস্রোত অরণ্য, প্রধান দ্বীপ) যে অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অত্যন্ত মনোরম, যার বিশেষত জৈববৈচিত্র অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সমুদ্রতল বৃদ্ধির ফলে সব ডুবে যাবার সম্ভাবনা আছে।	কোনওরকম নতুন নির্মাণ করা যাবে না।	মোটামুটি অপরিবর্তিত	মোটামুটি অপরিবর্তিত
CRZ II	যে সমস্ত অঞ্চল ইতিমধ্যেই উন্নত, যাদের নির্মাণ কাজ বেলাভূমি ছুঁয়ে ফেলেছে। তবে এই এলাকাগুলিকে কোনও পৌরসভার অন্তর্গত হতে হবে এবং নির্মাণকাজের মধ্যে যথাযথ নিকাশি ব্যবস্থা থাকতে হবে, রাস্তা, জল সরবরাহের মতো সুবিধা থাকতে হবে।	বেলাভূমিকে ঘিরে যে রাস্তা আছে বা রাস্তার প্রস্তাব আছে সেই রাস্তার সমুদ্রের দিকে নতুন কোনও নির্মাণ করা যাবে না। আর উলটোদিকে নির্মাণ কাজ করা গেলেও উপযুক্ত অনুমোদনসহ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে করতে হবে।	মোটামুটি অপরিবর্তিত	মোটামুটি অপরিবর্তিত
CRZ III	যে সমস্ত অঞ্চলে এখনও পর্যন্ত পরিবেশ বিঘ্নিত হয়নি এবং যে সমস্ত অঞ্চল ১ বা ২ নম্বর তালিকাভুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলি মূলত গ্রামীণ উপকূলীয় অঞ্চল, যার মধ্যে ছোটখাট শহরাঞ্চলও কিছু আছে।	সর্বোচ্চ জোয়ার রেখা থেকে ২০০ মিটার ভিতর পর্যন্ত যেটুকু যা আছে তার সবটাই কাজ ছাড়া আর কিছু করা যাবে না। তবে বাগান, ফুলের বাগান, চাষবাস, নুন তৈরির ছোট উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। ২০০ থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে হোটেল করা যেতে পারে পরিবেশ মন্ত্রকের অনুমোদন সাপেক্ষে আর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ দোতলা পর্যন্ত বাড়ি করতে পারে।	মোটামুটি অপরিবর্তিত	মোটামুটি অপরিবর্তিত
CRZ IV	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ ও অন্যান্য ছোট দ্বীপগুলির উপকূল এলাকা যেগুলি প্রথম তিনটি তালিকায় অনুপস্থিত	সর্বোচ্চ জোয়ার রেখা থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে কোনও নতুন নির্মাণ করা যাবে না। ২০০-৫০০ মিটারের মধ্যে যে নির্মাণ করা হবে তার উচ্চতা ৯ মিটারের বেশি হবে না। নির্মাণ কাজের জন্য প্রবাল বা বিচ থেকে বালি সংগ্রহ করা যাবে না। নির্মাণ সৌকর্যকে এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হতে হবে।	সর্বনিম্ন জোয়ার রেখা থেকে সমুদ্রের ভিতর দিকে ১২ মাইল এলাকা পর্যন্ত এবং যেখানে সমুদ্রের জোয়ারের প্রভাব আছে সেখানে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের সঙ্গে সমুদ্রের যোগ যেখানে হয়েছে সেখান থেকে মূলভাগের দিকে যতদূর পর্যন্ত জোয়ারের প্রভাব আছে।	জলদূষণ ঘটে এমন কোনও কিছুই জলে ফেলা যাবে না। আশপাশের শহরের আবর্জনা শোধনের একটি সুসংহত পরিকল্পনা এক বছরের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। তেল এবং গ্যাস উত্তোলন থেকে দূষণ রোধ করতে হবে। তবে মৎস্যজীবীদের চিরাচরিত কাজকর্ম এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আনুষঙ্গিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখা যাবে।
বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন আছে এমন এলাকা	ছিল না	অপ্রাসঙ্গিক	গ্রেটার মুম্বই, গোয়া এবং কেরালার যে অংশগুলি নিয়ন্ত্রিত উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে পড়ে।	জোয়ারের জলকে ব্যাহত না করে এমনভাবে রাস্তা বানাতে হবে, দু'বছরের মধ্যে সি. আর জেড-এলাকার বাইরে বর্জ্য ফেলার বন্দোবস্ত করতে হবে। উপকূল এলাকার সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ রেখে বস্তি উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
			ভয়ংকরভাবে ভঙ্গুর উপকূলীয় অঞ্চল যেমন সুন্দরবন	এলাকার অধিবাসীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং ম্যানগ্রোভ অরণ্যের সংরক্ষণের সুবন্দোবস্তের উপর গুরুত্ব আরোপ করে একটি সুসংহত পরিচালন পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে।

তথ্যসূত্র : পরিবেশ মন্ত্রক, ভারত সরকার।

তটভূমির পরিবর্তন ইত্যাদি বিবেচনা করে পরিবেশ মন্ত্রক এই রেখাটি টানতে পারে। এটি আসলে স্থলভাগের উপর নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের সীমারেখা। যে সমস্ত উপকূলে স্থলভাগের উপর সাধারণভাবে নির্ধারিত সীমারেখাটি টপকে আরও কিছুটা ভেতর অবধি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনুভূত হবে সেখানেই এই রেখাটি টানা হবে, অন্যথায় নয়।

সাধারণভাবে নির্ধারিত সীমারেখা বলতে আমরা কী বোঝাতে চাইছি? বিজ্ঞপ্তিতে নিয়ন্ত্রিত উপকূলবর্তী অঞ্চলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে উপকূলীয় এলাকায় নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলটির বিস্তার হবে জোয়ার রেখাটিকে কেন্দ্র করে দুদিকে। স্থলভাগের দিকে সর্বোচ্চ জোয়ার রেখা থেকে ৫০০ মিটার ভিতর পর্যন্ত এবং সমুদ্রের দিকে সর্বনিম্ন জোয়ার রেখা থেকে ১২ মাইল গভীর পর্যন্ত। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এই দুটিই হবে দুদিকের নির্ধারিত সীমারেখা। হ্যাজার্ড লাইন নির্ধারণ করা হবে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে।

স্থলভাগের দিকে যে স্বাভাবিক সীমারেখাটির কথা বলা হল সেটি অবশ্য সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার জন্য। এছাড়া উপসাগর, উপহ্রদ, খাঁড়ি বা নদীর মোহনা সংলগ্ন উপকূল, অর্থাৎ সমুদ্র-উপকূল ব্যতীত আর যেখানে জোয়ারের প্রভাব পড়ে, সেই সমস্ত উপকূলে সর্বোচ্চ জোয়ার রেখা থেকে ১০০ মিটার ভিতর পর্যন্ত এলাকাকেই নিয়ন্ত্রিত ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ এই সমস্ত উপকূলে হ্যাজার্ড লাইন যদি কিছু টানতে হয় তাহলে তা টানা হবে এই ১০০ মিটারের পর। হ্যাজার্ড লাইনটি টানার উদ্দেশ্য উপকূল অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পত্তিকে সুরক্ষিত করা।

নিয়ন্ত্রিত উপকূল অঞ্চলটিকে চিহ্নিত করার পর তাকে আবার কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণিবিন্যাস ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তিতে ছিল, ২০১১ সালেরটিতেও আছে। ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তিতে সমস্ত উপকূল অঞ্চলকে চারটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। ২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তিতেও চারটি শ্রেণিই আছে, তবে বিশেষ শ্রেণি হিসেবে আরও দুটি যোগ করা হয়েছে (সারণি দ্রষ্টব্য)। প্রতিটি অঞ্চলে কোন কোন কাজ নিষিদ্ধ আর কোনটি অনুমোদনীয় তাও বলা আছে বিজ্ঞপ্তিতে। এই সব বিধিনিষেধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও সঙ্গের সারণিতে দেওয়া হয়েছে।

২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তিটিতে নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য কীভাবে অনুমোদন নিতে হবে তার একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলিতে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করার আগে সেই অঞ্চলের একটি 'কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান' তৈরি করতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের 'কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটি'কে। সেই সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হলে তবেই একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প ছাড়পত্র পাবে। এমনকী শুধু এই পদ্ধতিতে ছাড়পত্র দেওয়াই নয়, ছাড়পত্র দেবার পর কীভাবে সমগ্র প্রকল্পটির কাজের অগ্রগতির তদারকি করা হবে তাও বলা হয়েছে।

তবে এত কিছুর পরেও, নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপিত করার পরেও, বিজ্ঞপ্তিটি গরিষ্ঠাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। প্রথম কথা, পরিবেশের উপর অত্যাচার এখন সর্বত্রই এত লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে যে নিয়মকানুন একদম সুনির্দিষ্ট করে না বললে এবং নিয়ম লঙ্ঘন করলে তা কীভাবে এবং কতটা শাস্তিযোগ্য হবে তা বলা না থাকলে কাজের কাজ কিছু হবে না। উদাহরণস্বরূপ, মুম্বইয়ের উপকূলে গড়ে ওঠা ৩১ তলার আদর্শ হাউজিং সোসাইটির কথা বলা যেতে পারে। ২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশের পর সেটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা বোধ হয় হয়েছিল মুম্বইয়ের পত্রপত্রিকায়, কারণ সেখানে যাবতীয় নিয়মনীতি উলঙ্ঘন করে উপকূল অঞ্চলে বেপরোয়া নির্মাণ চলছে। আদর্শ হাউজিং সোসাইটিও এরকমই একটি। ২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তিটির কোনও তোয়াক্কা না করেই এই নির্মাণ হয়েছে। এখন আপাতত নির্মাণ স্থগিত। বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন। পরিবেশ মন্ত্রক নির্মাণটি ভেঙে দেওয়ার কথা ভাবছে (পুরোহিত ও মার্কাস, ২০১৩)। অর্থাৎ পরিস্থিতি যা, উপকূল অঞ্চলের পরিবেশকে সত্যি সত্যিই নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে শুধু বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কিছু হবে না, চাই পুরোদস্তুর আইন। দ্বিতীয় যে কথাটি এই প্রসঙ্গে বলবার তা হল, ২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তিটি চূড়ান্ত করার ব্যাপারে সরকারকে বারবার পিছু হঠতে হয়েছে উপকূল অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসী, বিশেষত মৎস্যজীবীদের প্রতিরোধে। উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম এদের জীবন ও জীবিকাকেই আহত করেছে সবচেয়ে বেশি। সরকার বারবার এদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, আশ্বাস দিয়েছেন এই দিকটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবার, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তিতে এমন কিছু নেই যা এদের আশ্বস্ত করতে পারে। একটি অঞ্চলের পরিবেশের দীর্ঘস্থায়িত্ব অর্জন করতে গেলে কিন্তু স্থানীয় মানুষকে সঙ্গে নিতেই হবে, তাদের অভিজ্ঞতাকে মূল্য দিতে হবে, তাদের স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে হবে। যদি না পারা যায়, যদি না করা হয়, বিজ্ঞপ্তি জারিই হোক বা আইন প্রণয়ন, গন্তব্য অধরাই থেকে যাবে।❑

তথ্যসূত্র : ১. পুরোহিত, সুস্মিতা ও টিল মার্কাস (২০১৩) ইন্ডিয়া'জ কোস্টাল রেগুলেশন জোন নোটিফিকেশন ২০১১—টিপিং দ্য স্কেলস টুওয়ার্ডস এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনএবিলিটি; ল, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট জার্নাল, সংখ্যা ৯/১

২. শর্মা, চন্দ্রিকা (২০১১); সি আর জেড নোটিফিকেশন ২০১১: নট দ্য এন্ড অফ দ্য রোড; ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, সংখ্যা ৫৬/৭

৩. শ্রীধর, আরতি ও কার্তিক শংকর (২০০৬); রিভিউ অফ দ্য স্বামীনাথন কমিটি রিপোর্ট অন দ্য সি আর জেড নোটিফিকেশন; অশোকা ট্রাস্ট ফর রিসার্চ ইন ইকোলজি অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট, বেঙ্গালুরু।

গান্ধীজি ও স্বাস্থ্যবিধান

আজও যদি আমরা সাবরমতী বা ওয়ার্ধা আশ্রমে যাই, দেখব কী সাধারণ, সাদামাটা ঘরদোর অথচ কত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন সেখানকার পরিবেশ। দেখেই একটা সম্ভ্রমের ভাব জাগে। যে মানুষটি প্রায় সারা জীবন ধরে পরিচ্ছন্ন পারিপার্শ্বিকের ওপর জোর দিয়ে এসেছেন, সে মানুষটি আজ কত বছর হল আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা আজও তাঁর সেই শিক্ষা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আসছেন। অথচ দেশের বাদবাকি মানুষ সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারেননি। তিনি জীবন দিয়ে, নিত্যকর্মে তাঁর বিশ্বাস ও ভাবনাকে প্রয়োগ করে প্রমাণ করেছেন এর প্রয়োজনীয়তা, এর গুরুত্ব কিন্তু আমরা তার মূল্য দিইনি। গান্ধী কি তবে বিস্মৃত এক মহানুভব? লিখছেন **সুদর্শন আয়েঙ্গার।**

গ্রাম ও ব্লক স্তরের সরকারি কর্মচারীদের সন্দেহজনক আচরণে এই কিছুদিন আগে আমাদের একজন শিক্ষক তথা কর্মী চিন্তা ব্যক্ত করেন। যাঁদের জন্য সরকারের তরফ থেকে শৌচালয় তৈরি করে দেওয়ার কথা, তাঁরা সেই কাজের জন্য টাকা চেয়ে আবেদন করেন। সে ব্যাপারে পরে খোঁজ নেওয়া হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মচারীরা এমন কোনও প্রস্তাব জমা পড়ার কথা সরাসরি অস্বীকার করেন।

'গুজরাত বিদ্যাপীঠ' নামক গুজরাতের এই সংগঠনটি নানা জায়গায় শৌচালয় গড়ে তোলার ব্যাপারে মানুষকে বুঝিয়ে এবং পরিচ্ছন্নতা ও অনাময়ের বিষয়ে তাঁদের সচেতন করে তোলার কাজে নিজেদের যুক্ত করেছেন। শ্রীনারায়ণ দেশাই-এর '১০৮তম গান্ধীকথা' তাঁদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সত্ত্বেও এই সংগঠন বিগত দু' বছরে ১৩০০টি টয়লেট নির্মাণে সফল হয়েছে। এগুলি তৈরি হয়েছে সাদরা নামক গ্রামে যা রাজধানী আমেদাবাদ থেকে ২০ কিমি দূরে অবস্থিত। প্রথম যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা হল এ ব্যাপারে মানুষের অনীহা ও অসহযোগী মনোভাব। দ্বিতীয় সমস্যা, কাজের প্রতি নিষ্ঠাহীন, দুর্নীতি-পরায়ণ সরকারি কর্মীদের নিয়ে কাজ করা।

গরিব ভারতবাসীদের অনেকের কাছেই মোবাইল ফোন আছে অথচ বাড়িতে শৌচালয় নেই। এর থেকেই বোঝা যায় মানুষ অনাময় ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি কতটা সচেতন এবং কতটা গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত। এ ব্যাপারে ভারতবাসীর উদাসীনতা ও অসচেতনতা সম্পর্কে গান্ধী ছোটবেলা থেকেই সজাগ ছিলেন। যে কোনও সভ্য ও উন্নত রাষ্ট্রের পক্ষে অনাময়ের উচ্চমান রক্ষা যে কতটা জরুরি তা তিনি গোড়া থেকেই মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করেন নানাভাবে। পশ্চিমি সমাজে দীর্ঘদিন কাটাবার ফলে এই বোধ তাঁর গড়ে ওঠে। সেই দক্ষিণ আফ্রিকার দিনগুলি থেকে শুরু করে জীবনের শেষপর্যন্ত তিনি অনাময় সম্পর্কে প্রচার চালিয়ে যান অক্লান্তভাবে। ১৮৯৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ সরকার অপরিচ্ছন্নতার কারণে ভারতীয় এবং এশীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। সেই থেকে গান্ধী ভারতীয়দের মধ্যে অনাময় ও পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে প্রচার শুরু করেন। যেদিন আততায়ীর গুলিতে নিহত হন তার আগের দিন পর্যন্তও এই প্রচার অব্যাহত ছিল। লোকসেবক সংঘ-র খসড়া সংবিধানে জনগণের সেবকদের কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে গান্ধীজি বলেন—"জনসেবকরা গ্রামের মানুষদের স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবেন এবং তাদের মধ্যে রোগ ভোগ ও অসুস্থতা ও স্বাস্থ্যহীনতা রোধের সবরকম চেষ্টা করবেন।" (CWMG, Vol. 90 p. 528)। গান্ধীজির এই আজীবন সাধনা সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা এবং বর্তমান অবস্থাকে তুলে ধরার চেষ্টা এখানে করা হল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী

গান্ধী প্রথমবার অনাময়-এর বিষয়টি নিয়ে জনসমক্ষে আলোচনা করেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। কিন্তু সে আলোচনা ছিল ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্বাস্থ্য সচেতনতার সপক্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় ও এশীয় গোষ্ঠীর পক্ষে আবেদনকারী হয়ে তাঁদের পরিচ্ছন্নতা বোধের সমর্থনে তিনি বক্তব্য রাখেন। সেই সঙ্গে আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের তিনি সমানেই পরিচ্ছন্ন থাকার এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। গান্ধী তাঁর বিভিন্ন আবেদন এবং বিবৃতির মাধ্যমে বারবার প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভারতীয়রা যেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৌড়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে, তাই তাঁরা ওঁদের ট্রেড লাইসেন্স দিতে চাইছে না। তাছাড়া ব্রিটিশরা যাই বলুন না কেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অনাময় ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে পৌরসভার চিকিৎসক ডাক্তার ভিল (Veal)-এর মন্তব্য উল্লেখ করেন। ডাক্তারবাবুর মতে ভারতীয়রা যথেষ্ট পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করেন এবং অপরিচ্ছন্নতাজনিত কোনও অসুখ-বিসুখে তাঁরা ভোগেন না (CWMG, খণ্ড-১, ১৯৬৯ সংস্করণ, ২১৫ পৃষ্ঠা)। ভারতীয়দের ট্রেড লাইসেন্স না দেওয়ার কারণ হল তাঁরা ক্রমশ ব্রিটিশদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে এবং সে কারণে ব্রিটিশদের মনে ভারতীয়দের প্রতি ঈর্ষার মনোভাব বাড়ছে। ভারতীয়দের চাহিদা কম, ভোগবিলাসের অভ্যাস নেই, তাঁরা মিতাহারী আর সেই কারণেই তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা স্বল্প ব্যয়সাধ্য। এ কারণেও পশ্চিমি ব্যবসায়ীরা ওঁদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না।

কিন্তু বাস্তবে যে ভারতীয়দের অনাময় সম্পর্কে ধ্যানধারণা পোক্ত নয়, তা গান্ধীজি ভালোই জানতেন। আর সেই কারণেই এই বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য তিনি সমানে প্রচার চালান। এর কুড়ি বছর পর

১৯১৪ সালে তিনি বুঝতে পারেন যে পরিচ্ছন্নতা ও অনাময় সংক্রান্ত সচেতনার অভাব যে ভারতীয়দের মধ্যে এত বেশি তার প্রধান কারণ ভারতের বিপুল জনসংখ্যা। যেখানে এত বেশি মানুষ এত অল্প জায়গার মধ্যে বসবাস করেন, তখন সেখানে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, শৌচালয় নির্মাণ এবং তা পরিষ্কার রাখা বড় সহজ কাজ নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় গোষ্ঠীর বসবাসের জন্য নির্ধারিত এলাকার বিস্তৃতি খুব বেশি ছিল না। আর তাতে পরিকাঠামোরও অভাব ছিল। গান্ধীজির মতে সুস্থভাবে বাঁচার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকা দরকার এবং সেই জায়গা জোগানের দায়িত্ব পৌরসভার। জোহানেসবার্গের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পর্কিত মেডিকাল অফিসারকে তিনি একটি চিঠি লেখেন—

''ভারতীয়দের জন্য নির্ধারিত বাসস্থানগুলির চরম দুরবস্থা সম্পর্কে আপনাকে জানানো প্রয়োজন বোধ করছি বলেই এই চিঠির অবতারণা। অনাময় সংক্রান্ত পরিষেবা এখন বড়ই অনিয়মিত হয়ে পড়েছে এবং ওই অঞ্চলের অনেকেই আমার দপ্তরে এসে অভিযোগ জানিয়েছেন যে আগের তুলনায় অবস্থা এখন আরও সঙ্গীন।" (CWMG, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২৯)।

তাঁর আত্মজীবনীতে গান্ধীজি বলেছেন— "একদিকে পৌরসভার অবহেলা এবং অন্যদিকে মানুষের অজ্ঞতা—এই দুইয়ে মিলে অঞ্চলটির অবস্থা ভীষণভাবে অপরিচ্ছন্ন করে তুলেছিল।" একবার সেখানে প্লেগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। সৌভাগ্যক্রমে এই ভয়ংকর রোগ ছড়ানোর কারণ ভারতীয়রা ছিলেন না। জোহানেসবার্গ-এর অদূরে অবস্থিত এক সোনার খনি থেকে এই রোগ ছড়ায়। গান্ধীজি এই রোগে আক্রান্ত মানুষদের সেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দেন, কঠিন পরিশ্রম করে, সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে রোগীদের সেবা করেন। পৌরসভার ডাক্তার ও কর্তৃপক্ষ তাঁর এই কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা এই ঘটনার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন, এই ছিল গান্ধীর ইচ্ছা। তিনি লেখেন—

"এই সব নিয়ম কঠোর হওয়া সত্ত্বেও দরকারি, এর জন্যে আমাদের রাগ করা ঠিক নয়। বরং এমনভাবে আমাদের চলা উচিত যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।...আমাদের মধ্যে যাঁরা দারিদ্রতম তাঁরাও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের সুফল সম্পর্কে জানেন। এই যে এত মানুষ গাদাগাদি করে একই জায়গায় থাকেন, এটা ঠিক নয়।...পরিচ্ছন্নতার সুফলই পরিচ্ছন্নতার পুরস্কার। সম্প্রতি যে ভয়ানক পরিস্থিতির শিকার আমরা হয়েছি, এর থেকেই আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।" (CWMG, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪৬)।

গান্ধীজির এই পরামর্শ আমরা গত ১০০ বছরেও গ্রহণ করিনি। দিল্লির মতো শহরেও চিকনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি ইত্যাদির মতো রোগ, যা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে উৎপন্ন, প্রতি বছরই বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দেখা দেয়। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক গুজরাত হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত এক এনকোয়েরি কমিটির সদস্য ছিলেন। কমিটির উদ্দেশ্য আমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালের নার্স ও ডাক্তারদের ডেঙ্গি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান। এই কমিটি আজ থেকে দু' বছর আগে পরিচ্ছন্নতা ও অনাময় সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেয় যা আজও কার্যকর হয়নি। এই রোগ এবং রোগের কারণে মৃত্যু আজও অব্যাহত।

ভারতে অনাময় ব্যবস্থার প্রচারে গান্ধী

মাদ্রাজের (এখন চেন্নাই) মিশনারি কনফারেন্সে 'স্বদেশি' বিষয়ক এক ভাষণে ১৯১৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি গান্ধী তাঁর ভাষণে বলেন—

"সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমে যদি মাতৃভাষা হত, তাহলে জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, ছাত্রছাত্রীরা অনেক উপকৃত হতেন এবং গ্রামাঞ্চলের অনাময় সংক্রান্ত ব্যবস্থার সমাধান সম্ভব হত।" (CWMG, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২২২)

গুরুকুল কাঙ্গড়ি-র শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯১৬ সালে ২০ মার্চ প্রদত্ত ভাষণে গান্ধী বলেন—

"গুরুকুলের প্রতিটি কিশোরের দুটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করা উচিত। এক, সন্তানকে লালন-পালন করবার সঠিক পদ্ধতি এবং অনাময় ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি ও উপায়...অনাময় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষকরা আমাদের সব সময় সাবধান করতেন এই বলে যে, অনাময় সম্পর্কে আমাদের বোধ ও অভ্যাস কিন্তু একেবারেই সন্তোষজনক নয় আর আমার সব সময় এই ভেবে মন খারাপ হত যে বার্ষিক এই অতিথিদের অনাময় সংক্রান্ত শিক্ষা আমরা কোনওদিনই দিতে পারি না।" (CWMG, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২৬৪)

গান্ধীজি তখন নীল চাষিদের সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় চম্পারণে। সেই জটিল সমস্যার সমাধানসূত্র সম্পর্কে ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর 'অনুসন্ধান দল'-এর সদস্যদের সেখানকার মানুষকে অনাময় সংক্রান্ত প্রশ্ন করবার নির্দেশ দেন। অনুসন্ধানকারী দল তাদের কাজের মাঝে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অনাময় ও সার্বিক পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষাটুকু দিক—এই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

গান্ধীজি গুজরাত বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন ১৯২০ সালে। আশ্রমের আদলে তৈরি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য কর্মীরা নিজেরাই বিদ্যাপীঠকে পরিচ্ছন্ন রাখতেন। রাস্তাঘাট, থাকবার জায়গা, কাজের জায়গা এবং গোটা ক্যাম্পাস তাঁরা নিজেরাই পরিষ্কার রাখতেন। শৌচালয়ও পরিষ্কার করতেন তাঁরা রোজ। গান্ধী নিজে হাতে নতুন আশ্রমিকদের শিখিয়ে দিতেন কীভাবে এসব কাজ করতে হয়। আজও বিদ্যাপীঠে এই নিয়ম বহাল আছে।

গান্ধী কখনও থার্ড ক্লাস ছাড়া রেল-এ সফর করতেন না। রেলের এই শ্রেণির চরম অপরিচ্ছন্নতা তাঁকে বিব্রত করত। তিনি সংবাদপত্রে চিঠি লিখে এ ব্যাপারে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন—"এই ধরনের একটি সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে গোটা একটি ট্রেনকে আটকে দেওয়ার সিদ্ধান্তটা তবু বোধগম্য হয়। কিন্তু ট্রেনের অপরিচ্ছন্নতা ও শৌচালয়ের নোংরা অবস্থা এমনটা কেন হবে, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। এর ফলে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা আদর্শচ্যুত হই আমরা...তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীদের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে যাত্রা করবার অধিকারটুকুও কি নেই?...আমরা এঁদের অনাময়, পরিচ্ছন্নতা

এবং সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হারাচ্ছি।" (CWMG, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২৬৪-৫৫০)

গুজরাত রাজনৈতিক সম্মেলনে (নভেম্বর ৩, ১৯১৭) ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি আমাদের ধর্মীয় স্থানগুলির নোংরা পরিবেশ সম্পর্কেও বলেন—"ডাকোর-এর তীর্থস্থান এখান থেকে বেশি দূর নয়। আমি সেখানে গেছি। এই তীর্থকে অপবিত্র ছাড়া আর কী বলব। আমি নিজেকে একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বলে মনে করি। তাই ডাকোরজির সমালোচনা করবার অধিকার আমার আছে। সেখানকার পরিবেশ এতটাই নোংরা যে, যে কোনও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষের পক্ষে সেখানে ২৪টি ঘণ্টাও কাটানো কঠিন। দর্শনকারীরা যথেচ্ছভাবে আশপাশের জায়গা ও ট্যাঙ্ক নোংরা করছেন।" (CWMG, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৫৭)

ওই একইভাবে ইয়ং ইন্ডিয়ার ৩.২.১৯২৭-এর সংখ্যায় তিনি দেশের আর একটি তীর্থক্ষেত্র গয়া সম্পর্কে বলেন—হিন্দুদের অন্তরাত্মা গয়ার ওই ভয়ানক নোংরা পরিবেশ দেখে বিদ্রোহ করে ওঠে।

বলা বাহুল্য, আজ এত বছর পরও ভারতীয় রেলের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ যেমনকে তেমনই রয়ে গেছে। কম্পার্টমেন্ট ও শৌচালয় পরিষ্কার করবার জন্য লোক রাখা হয়েছে কিন্তু ভারতীয়দের নোংরা করা এবং তার মধ্যে বাস করবার অভ্যাস অপরিবর্তিত থেকে গেছে। বাতানুকূল মানের শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশুদেরও পায়খানা করানো হয় 'পট'-এর বাইরে। আর এটা-সেটা ফেলে সমস্ত ট্রেন নোংরা করবার স্বভাব তো আছেই। এ লজ্জা আমরা কোথায় রাখব!

ডাকোর-এ গিয়েছিলাম ২০১৩ সালে। গত ১০ বছরে দেশের অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রেও গিয়েছি। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি যার বিন্দুমাত্র পরিচ্ছন্নতাবোধ আছে, সে দ্বিতীয়বার এসব জায়গায় যেতে চাইবে না।

জনসমক্ষে অনাময়ের সমস্যার আলোচনা

অমৃতসর কংগ্রেস-এ (ডিসেম্বর ২৯, ১৯১৯) ভাষণ প্রসঙ্গে গান্ধী সিএফ অ্যান্ড্রুজ-এর বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে সব ইউরোপীয়রা ভারতে আসেন, তাঁরা এখানকার অস্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখে এ দেশ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব নিয়ে বাড়ি ফেরেন।

কংগ্রেস-এর প্রায় প্রতিটি সম্মেলনে গান্ধী এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১৯২৪ সালের এপ্রিলে দোহাদ শহরে অনাময়ের সুব্যবস্থা করার জন্য তিনি কংগ্রেস সদস্যদের অভিনন্দন জানান এবং অস্পৃশ্যদের বসতিতে গিয়ে তাঁদেরকেও অনাময় সম্পর্কে বুঝিয়ে বলার পরামর্শ দেন। তেমনি কানপুর শহরে অনাময়ের সুব্যবস্থা দেখে তিনি কর্মীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

শহর ও শহরতলি পৌরসভাগুলির প্রথম ও প্রধান কাজ হওয়া উচিত তাদের অঞ্চলের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। তিনি কংগ্রেস কর্মীদের বলেন—পৌরপিতা হওয়ার পর তাঁরা যেন নিষ্ঠাবান অনাময় কর্মী হন। তাঁর চোখে অপরিচ্ছন্নভাবে থাকা ছিল পাপের শামিল। কলকাতায় প্রদত্ত ভাষণে (আগস্ট ২৫, ১৯২৫) তিনি বলেন—"তাঁকে গ্রামে গ্রামে সন্ন্যাসীর মতো ঝাড়ু হাতে বিনয়ের সঙ্গে যেতে হবে। অনাময়ের অভাব, দারিদ্র ও আলস্য—এই তিন আপদকে পরাস্ত করতে হবে তিন হাতিয়ার দিয়ে—ঝাড়ু, কুইনিন ও ক্যাস্টর অয়েল।" (CWMG, খণ্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১০৯)।

ইয়ং ইন্ডিয়ার ১৯.১১.১৯২৫ সংখ্যায় তিনি দেশের এই পরিস্থিতির সারাংশ এইভাবে তুলে ধরেছেন—

"দেশের নানা জায়গায় গিয়েছি বিভিন্ন সময়ে। এখানকার মানুষের অপরিচ্ছন্নতা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের অভ্যাস আমাকে যে ব্যথা দিয়েছে তার কোনও তুলনা নেই। অনাময়ের সমস্যার সঙ্গে যেন বাধ্য হয়েই আমাকে আপস করতে হচ্ছে।" (CWMG, খণ্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৪৬১)।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শিক্ষায় স্বাস্থ্য

অগুনতি মানুষ গান্ধীর আশ্রমে আশ্রমিক হিসাবে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাঁকে চিঠি লিখতেন। উত্তরে, গান্ধীজি তাঁদের কাছে প্রথম শর্ত হিসাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মল-মূত্র পরিষ্কারের বিষয়টি উপস্থাপন করতেন। পশ্চিমের দেশগুলি থেকে স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কে জানার এবং তা কার্যকর করবার শিক্ষা নিতে বলতেন তিনি। বেলগাঁও-এ নাগরিক অভ্যর্থনায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন (ডিসেম্বর ২১, ১৯২৪)—

"পৌর স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়টি পশ্চিমের মানুষের কাছ থেকে আমাদের শেখা উচিত... বিজ্ঞানসম্মতভাবে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধানের যে পদ্ধতি তাঁরা আয়ত্ত করেছেন, তা গ্রহণ করাতেই আমাদের মঙ্গল। পানীয় জলের উৎস পরিচ্ছন্ন রাখার কোনও ইচ্ছাই যেন আমাদের নেই...এসব অভ্যাস আমাদের গড়ে তুলতে হবে।" (CWMG, খণ্ড-২৫, পৃষ্ঠা-৪৬১)

কংগ্রেস কমিটির খসড়া নিয়মাবলিতে তিনি পঞ্চায়েতের দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলেছেন—"প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত গ্রামের শিশুদের, পুত্র ও কন্যা নির্বিশেষে, প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নেবে। ঘরে ঘরে চরকার ব্যবহার চালু করবে এবং স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা বিষয়ে তাঁদের শিক্ষিত করে তুলবে।" (CWMG, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা-২১৭)।

১৯৩৩ সালে স্বাস্থ্য-শিক্ষা সম্পর্কে তিনি আরও বলেন—"লেখাপড়া করতে জানলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আরও অনেক কিছু শিখতে হবে। সভ্যতা-ভব্যতা, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধান—এসব সম্পর্কে না জানলে, কিছুই জানা হয় না।" (CWMG, খণ্ড-৫৬, পৃষ্ঠা-৯১)।

তিনি লেখাপড়ার তুলনায় ব্যবহারিক জীবনে স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দেন। স্বাক্ষরতা অর্জনের থেকে এই সব বিষয়ে শিক্ষিত হওয়া বেশি জরুরি বলে তিনি মনে করেন। 'হরিজন' পত্রিকার একটি সংখ্যায় এই কথা তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন।

এসব সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানে বদলে গেছে। আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঝাড়ুদার বা ঝাড়-পোঁছের জন্য লোক রাখি। শিশুদের দিয়ে এসব কাজ করানো বা করতে শেখানোকেও 'শিশু-শ্রম' বলে মনে করেন সমাজকর্মীরা। তবে এখনও সময় আছে। যেখানে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে

গান্ধীজির 'নয়ী তালিম' পুনরায় চালু করলে এখনও অনেক কিছু শেখার অবকাশ আছে।

গান্ধী, অনাময় ও সাফাইকর্মী

অস্পৃশ্যতাকে গান্ধী ঘৃণা করতেন। গান্ধীজি তাঁর মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ছোট্ট মোহনকে যখন তাঁর মা সাফাই-কর্মীকে ছুঁতে বারণ করেন তখন তাঁর সমস্ত সত্তা বিদ্রোহ করে ওঠে। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেকে তাঁর নিজের ময়লা নিজে পরিষ্কার করবেন, এটা অন্য কারও কাজ নয়। আমাদের সমাজের ইতিহাস এক শ্রেণির মানুষকে জাতপাতের দোহাই দিয়ে বংশগতভাবে এই কাজ করতে বাধ্য করে। তাঁরা গ্রামের বাইরে আলদা জায়গায় থাকেন চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। সমাজের বাধ্য-বাধকতা, দারিদ্র ও অশিক্ষার কারণে তাঁদের এই ধরনের জীবনযাপন করতে হয়। গান্ধী তাঁদের বুকে টেনে নেন এবং সমস্ত কর্মী এবং নেতাদের এই মনোভাব গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তাঁরা মূলস্রোতে ফিরে এসে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করুক, এই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা এবং এ ব্যাপারে ছাত্রসমাজসহ সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে অনুরোধ করেন তিনি।

ভারতীয় সমাজে সাফাই কর্মীদের অমানবিক কাজ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেন তিনি :

"হরিজনদের মধ্যে 'ভাঙ্গি'-রা হল সমাজের অন্ত্যজ। আবার তাঁরাই সমাজে অপরিহার্যও বটে—যেমন শিশুর কাছে মা অপরিহার্য। 'ভাঙ্গি' সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখে, যেমন মা রাখেন তাঁর সন্তানকে। যদি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিজের ময়লা নিজেদেরই পরিষ্কার করতে হত তবে 'ভাঙ্গি'-রা যে সমস্ত প্রাচীন পদ্ধতিতে নিজেদের কাজ করেন, তা কবেই লুপ্ত হয়ে যেত।" (CWMG, খণ্ড-৫৪, পৃষ্ঠা-১০৯)

স্বাস্থ্যবিধান ও বর্তমান পরিস্থিতি

দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, গান্ধীর সমস্ত আবেদন, নির্দেশের পর ৭৫ বছর কেটে যাওয়া সত্ত্বেও সাফাইকর্মীরা এবং মেথররা আজও আছে আমাদের সমাজে। ১৯৯৩ সালের পর ২০১৩ সালে নতুন আইন এল যাতে হাতে করে ময়লা পরিষ্কারের কাজ বন্ধ হয়। কিন্তু রাজ্যগুলিতে সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়ন আজও হয়নি।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন প্রকল্প দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন প্রকল্পে পরিণত হবে তবু আমাদের স্বাস্থ্য চিত্র আগের মতোই হতাশাজনকই রইবে। 'দ্য ওয়ার্ল্ডস ওয়াটার অব দ্য প্যাসিফিক ইনস্টিটিউট'-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭০ সালে মোট গৃহস্থালির মাত্র ১৯ শতাংশ নিরাপদ পানীয় জল পেত (৮৫ শতাংশ শহরবাসী ও ৫ শতাংশ গ্রামবাসী)। ২০০৮ সালে এই হার সামান্য বেড়ে হয় ৩০ শতাংশ যার মধ্যে শহরবাসী ৬২ শতাংশ ও গ্রামাঞ্চলে ২০ শতাংশ। আমাদের দেশে ২০১২ সালেও প্রায় ৬২৬ মিলিয়ন মানুষ অর্থাৎ প্রায় ৫০ শতাংশ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করতেন (ইউনিসেফ-এর 'হু'-এর পরিসংখ্যান)।

অনাময়-এর অর্থ শুধু শৌচালয় নির্মাণ নয়। দেশের গ্রামাঞ্চলকে ২০১২ সালের মধ্যে সার্বিক অনাময় ব্যবস্থার আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল ভারত। সে লক্ষ্য এখনও বহু দূর। ১৯৮১ সালে গ্রামাঞ্চলের মাত্র ১ শতাংশ মানুষ এই টোটাল স্যানিটেশন কর্মসূচি বা সার্বিক অনাময় কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৯১ সালে এই হার বেড়ে ১১%, ২০০১ সালে ২২% এবং ২০১১ সালে ৫০ শতাংশ হয়। এই কর্মসূচির অন্তর্গত কাজগুলি হল গৃহস্থালি ও বিদ্যালয়ে শৌচালয় নির্মাণ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। এ ব্যাপারেও লক্ষ্যপূরণ বহু দূরের স্বপ্ন।

আমাদের দেশে এখনও স্বাস্থ্যবিধি ও অনাময় ব্যবস্থার প্রসার না ঘটার পিছনে সাংস্কৃতিক কারণও আছে। এ ব্যাপারে দুটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যেতে পারে। প্রথমত, এ দেশের মানুষ মনে করেন পবিত্র ও ধর্মনিষ্ঠ হওয়া পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার থেকেও বড় জিনিস। আমাদের ধর্মস্থানগুলির চরম অপরিচ্ছন্নতাই এর প্রমাণ। চারপাশে নোংরা ফেলা, যেখানে-সেখানে মলত্যাগ করা, দূষণ ও পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব এই সব তীর্থক্ষেত্রে সামান্য ব্যাপার। তাছাড়া জাতপাতের সংকীর্ণতা তো আছেই। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এর প্রাদুর্ভাবই বেশি। শহরে এ জিনিস থাকলেও খুব সূক্ষ্মভাবে তা মিশে আছে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে।

দ্বিতীয়ত, স্কুলে যাওয়ার ফলে জীবাণু ও জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রোগভোগ সম্পর্কে সবাই আজ অল্পবিস্তর সচেতন। কিন্তু বিষয়টিকে গভীরভাবে কেউ বুঝতে চাননি বা পারেননি। পানীয় জলকে এখনও যেভাবে ব্যবহার করা হয় তাতে করে এঁদের পরিচ্ছন্নতাবোধ ও স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাকে ঘিরে মনে সন্দেহ জন্মায়। বিভিন্ন কোম্পানির জল শুদ্ধ করার যন্ত্র খুব সাম্প্রতিক জিনিস। তার আগে লোকে বড় বড় জালা থেকে হাতায় করে জল বার করত। এখন সে হাতা চোখেই পড়ে না আর পড়লেও তা এখন 'কিউরিও'-তে পরিণত হয়েছে।

ভারতের স্বাস্থ্যচিত্র আজও বড় হতাশাপূর্ণ। আমরা আবার গান্ধীকে আমাদের জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছি। গান্ধী আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত কাজ ও কর্মীকে মর্যাদার আসনে বসানোর চেষ্টা করেছিলেন। স্বাধীনতার পর সেই সব আন্তরিক প্রচার ও বার্তা কর্মসূচি ও প্রকল্পে পরিণত হয়। প্রকল্পগুলির লক্ষ্য নির্ধারিত হয়; পরিসংখ্যান ও পরিকাঠামোর সূত্রপাত ঘটে। 'তত্ত্ব'-কে উপেক্ষা করে 'তন্ত্র'-কে গুরুত্ব দিতে শিখি অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সেই মূল্যবোধ বা ভাবনাকে জাগিয়ে তোলার চেয়ে ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনা ও পরিকাঠামো গঠনের প্রতি জোর দিই। পরিকাঠামো গঠনের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তবে তার থেকে অনেক বেশি দরকার অনাময় ও স্বাস্থাভাবনা সম্পর্কে 'বোধ'-কে জাগিয়ে তোলা। এর জন্য চাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা। শৌচালয়ের সঠিক ব্যবহার, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষিত হওয়া—এগুলিই আজ বেশি জরুরি।❑

[লেখক গুজরাত বিদ্যাপীঠের উপাচার্য।
email : vc@gujratvidyapeeth.org]

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(২১ আগস্ট—১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪)

বহির্বিশ্ব

● **মিশরের মধ্যস্থতায় অবশেষে দীর্ঘমেয়াদি অস্ত্র বিরতি :**

পশ্চিম এশিয়ায় শান্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল। ২৬ আগস্ট যুযুধান দুই পক্ষ, ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন আরও একবার যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছে। গত ৮ জুলাই থেকে দু'পক্ষের তুমুল লড়াইয়ের মাঝে বার কয়েক অস্ত্র বিরতি ঘোষণা হলেও এবারের মেয়াদ 'অনির্দিষ্টকালের'।

প্যালেস্তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৮ থেকে এই ২৬ আগস্ট পর্যন্ত প্যালেস্তাইনের গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলি আক্রমণে নিহত হয়েছেন ২১২৯ জন সাধারণ নাগরিক, যার মধ্যে ৪৯০ জন শিশু। অন্যদিকে, ইজরায়েল কর্তৃপক্ষের দাবি, গাজা ভূখণ্ডের সশস্ত্র বিদ্রোহীগোষ্ঠী 'হামাস'-এর ছেদহীন রকেট আক্রমণে ৬৮ জন ইজরায়েলি মারা পড়েছেন, যার মধ্যে ৬৪ জনই সেনা।

● **ইরাকে 'আইএস'-এর সীমাহীন নৃশংসতা :**

সংবাদে প্রকাশ, দুই মার্কিন সাংবাদিকের মুণ্ডচ্ছেদ করে তার ভিডিয়ো প্রচার থেকে শুরু করে ইরাকের বিভিন্ন অংশে জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট বা আইএস জাতিভিত্তিক গণহত্যা, অপহরণ, যৌন পীড়ন, দাসত্বে বাধ্য করা, মানুষ পাচার ইত্যাদি জঘন্য অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পর্ষদের প্রধান জায়ের রাদ অল হুসেন সম্প্রতি এক বার্তায় আইএস জঙ্গিদের এই কার্যকলাপকে মানবাধিকারের চরম অবমাননা বলে উল্লেখ করেছেন।

অন্যদিকে, সাংবাদিক হত্যার নৃশংসতায় সারা বিশ্বে নিন্দার ঝড় উঠেছে। ক্ষিপ্ত মার্কিন প্রশাসন আইএস জঙ্গিদের ধ্বংস করতে আন্তর্জাতিক মঞ্চ গঠনের উদ্যোগ শুরু করেছে। তাতে যোগ দিচ্ছে আরব লিগও।

● **গণতন্ত্রের বকলমে সেনা শাসন থাইল্যান্ডে :**

গত ২২ মে রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে থাইল্যান্ডের নির্বাচিত জাতীয় সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সে দেশের সেনাধ্যক্ষ জেনারেল প্রায়ুত চান ওচা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি নিজেই নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। তার আগে তিনি গায়ের জোরে জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে ঘনিষ্ঠ অনুগতদের মনোনীত করে একটি 'পুতুল' সংসদ গঠন করেন এবং সেই সংসদে 'সর্বসম্মতিক্রমে' প্রধানমন্ত্রী 'নির্বাচিত' হন।

একটি নির্বাচিত সরকারকে গদিচ্যুত করে ক্ষমতা দখলের অজুহাত হিসাবে সেনাধ্যক্ষ যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক নৈরাজ্যের কথা বলেছিলেন, তা হয়তো মিথ্যা নয়। থাইল্যান্ডে প্রধানমন্ত্রী ইংলাক সিনাওয়াত্রার ইস্তফার দাবিতে বিরোধী পক্ষের সমর্থকেরা মাসের পর মাস রাজধানী ব্যাংককের সমস্ত প্রধান সড়ক, সরকারি দপ্তর অবরুদ্ধ রেখেছিলেন। প্রশাসন কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাধ্যক্ষ এই সুযোগই কাজে লাগিয়েছেন। যার ফলে দীর্ঘ ২২ বছর পরে থাইল্যান্ডে সামরিক শাসন ফিরে এল।

● **সমগ্র সিরিয়াই এখন শরণার্থী শিবির :**

তিন বছরের গৃহযুদ্ধে গোটা সিরিয়াই যেন শরণার্থী শিবিরে পরিণত হয়েছে। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরই কোনও ঠিকানা নেই। সিরিয়ার ৬৫ লক্ষ মানুষ দেশের মধ্যেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন শান্তিতে দিন কাটানোর আশায়। প্রতিবেশী দেশ লেবানন, তুরস্ক, জর্ডনে ছড়িয়ে পড়েছেন কমপক্ষে ৩০ লক্ষ মানুষ। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পর্ষদ এই তথ্য জানিয়ে বলেছে, বিপন্ন মানবতার সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন এখন সিরিয়া।

বিষময় বর্তমান, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। সিরিয়ায় মানুষদের অবস্থা এরকমই। গত তিন বছর ধরে যুদ্ধ চলছে। কখনও রাষ্ট্রপতি বাসার আল-আসাদের সেনারা এগোচ্ছে। কখনও হারানো এলাকা পুনর্দখল করছে বিদ্রোহীরা। মাঝে পড়ে উলুখাগড়ার মতো প্রাণ হারাচ্ছেন সাধারণ বাসিন্দারা।

● **জাপানে নতুন মন্ত্রিসভা :**

প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে জাপানের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে নজির গড়লেন। নতুন করে মন্ত্রিসভা গঠন করে তাতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিলেন ৫ মহিলাকে। উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১৩ বছর আগে ২০০১ সালে জাপানি মন্ত্রিসভায় ৩ জন মহিলা ছিলেন। এতদিন পর্যন্ত সেটাই ছিল সর্বোচ্চ সংখ্যা। এবার সেই নজির ভেঙে গেল। আবে জানান, তাঁর আশা, ২০২০ সালের মধ্যে মন্ত্রিসভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যই মহিলা হবেন। উল্লেখ্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে বিশ্বের অগ্রণী দেশের অন্যতম হলেও রাজনীতি কিংবা প্রশাসনের কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে জাপান আজও রক্ষণশীল।

● **বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা পোপের কণ্ঠে :**

ইতালির শহিদ মিনারে এসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে এসে পোপ ফ্রান্সিস আরও একটা বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। পোপের ভাষায়, যুদ্ধ আসলে একটা মাদকতা, পাগলামি। প্রসঙ্গত, ঠিক ১০০ বছর আগে ১৯১৪ সালে ইতালির যে সকল সৈনিকরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁদেরই স্মৃতিতে ইতালিতে তৈরি হয়েছে 'রেদিপাগলিয়ার' শহিদ স্তম্ভটি। সেখানে শ্রদ্ধা জানাতে হাজির ছিলেন ফ্রান্সিস পোপ।

● **ভূমধ্যসাগরে জাহাজ ডুবি :**

ভূমধ্যসাগরের মাল্টা দ্বীপের কাছে জাহাজ ডুবে গিয়ে কমপক্ষে ৫০০ জনের সলিল সমাধি হয়েছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ওই জাহাজ, মিশরের দামিয়েত্তা থেকে যাত্রা শুরু করে ১৫ সেপ্টেম্বর ইউরোপে ঢোকার মুখে, ভূমধ্যসাগরে তলিয়ে যায়। তলিয়ে যাওয়া ওই জাহাজের যাত্রীরা 'বেআইনি অভিবাসী'। মানব পাচারকারীর একটি দল তাদের নিয়ে ইউরোপের পথে পাড়ি দিয়েছিল। তবে এ ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নয়; জাহাজ থেকে ছোট নৌকায় স্থানান্তরিত করার সময় যাত্রীরা আপত্তি তোলায় পাচারকারীরাই ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। মর্মান্তিক ওই ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করে আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থার জনৈক মুখপাত্র জানান, চলতি বছরে এ পর্যন্ত আফ্রিকা থেকে এইভাবে পাচারকারীদের সাহায্য নিয়ে গোপনে ইউরোপে ঢুকতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২,৯০০ জন বেআইনি অভিবাসী।

এই দেশ

● **কয়লা ব্লক বণ্টন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় :**

২৫ আগস্ট দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এক রায়ে জানাল, ১৯৯৩ থেকে ২০১০ পর্যন্ত সারা দেশে যে ২১৮টি কয়লার ব্লক (কয়লাখনি)

বণ্টন করা হয়েছে, তা সবই অবৈধ, বেআইনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে বেসরকারি সংস্থাকে কয়লাখনি দিতে স্ক্রিনিং কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ২০১০ পর্যন্ত ২১৮টি কয়লার ব্লক বণ্টন করে। পরে কয়েকটি ফেরত নেওয়ায় সংখ্যাটি দাঁড়ায় ১৯৬। বণ্টন হয়ে যাওয়া এই খনিগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ধারাবাহিক শুনানি শুরু হয়।

● **উপ-নির্বাচনের ফল ঘোষণা :**

আগস্ট মাসে বিধানসভা উপ-নির্বাচনে বিহারে ১০টি আসনের মধ্যে ৬টি দখল করল সংযুক্ত জনতা দল (জেডিইউ) ও রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) জোট। দীর্ঘ ২০ বছর পরে হাত মিলিয়েছিলেন জেডিইউ-এর নেতা নীতীশ কুমার ও আরজেডি-র লালুপ্রসাদ যাবদ। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কংগ্রেসও।

পরবর্তী পর্যায় ১৩ সেপ্টেম্বরে ৩টি লোকসভা আসনের সঙ্গে ন' রাজ্যের মোট ৩২টি বিধানসভা আসনের জন্য উপ-নির্বাচন হয়। ভোট গণনা হয় ১৬ সেপ্টেম্বর।

গুজরাতের বরোদা, উত্তরপ্রদেশের ম্যানপুরী ও তেলেঙ্গানার মেদক—এই তিন লোকসভা আসনে জয়লাভ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (টিআরএস) ও সমাজবাদী পার্টি (এসপি) [যথাক্রমে]।

উত্তরপ্রদেশে ১১টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৮টি দখল করেছে এসপি এবং বাকি জিতেছে বিজেপি জোট। গুজরাতে ৬টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি। বাকি ৩টি আসন কংগ্রেসের দখলে। রাজস্থানে কংগ্রেসের দখলে ৩টি আসন, বিজেপি-র ১টি।

আসামের তিনটি আসনের মধ্যে একটি করে জিতে নিয়েছে বিজেপি, কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ।

পশ্চিমবঙ্গে চৌরঙ্গিতে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দক্ষিণ বসিরহাটে বিজেপি-র শমীক ভট্টাচার্য।

অন্যান্য রাজ্যে একটি করে আসনে উপ-নির্বাচন হয়। সিকিমে জয়ী হন নির্দল প্রার্থী, অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেগু দেশম পার্টি (টিডিপি) এবং ত্রিপুরায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিএম)।

● **দাগি মন্ত্রীদের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীর হাতে :**

কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের ১৩ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অর্থাৎ আইনের চোখে দাগি। ওই সব দাগি মন্ত্রীদের অপসারণ দাবি করে শীর্ষ আদালতে এক জনস্বার্থ মামলার রায়ে প্রধান বিচারপতি রাজেন্দ্র মাল লোধা-র নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ, পুরো বিষয়টা কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীদের 'শুভ বুদ্ধি'র ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ দাগিরা মন্ত্রী থাকবেন কি না, তা স্থির করবেন প্রধানমন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রী।

শীর্ষ আদালত মনে করে, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীরা নিজেরাই সংবিধান মেনে দায়িত্ব পালনের শপথ নিয়েছেন। সুতরাং তাঁরা মন্ত্রিসভায় কলঙ্কিত মন্ত্রীদের রাখবেন না এটাই প্রত্যাশিত।

● **প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য :**

পূর্ব এশিয়ায় ভারতের নীতির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র ৫ দিনের (৩০ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর) জাপান সফরের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল যে, গত ২০ বছর ধরে এই অঞ্চলে ভারতের নীতি 'পূর্বমুখী' হওয়ার যে ভাবাদর্শ অনুসরণ করে চলেছিল, প্রধানমন্ত্রীর আলোচ্য সফর সেই দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারই ইঙ্গিত। এখন বলা যেতেই পারে যে, অতঃপর এ অঞ্চলে ভারতের নীতি 'পূর্বপন্থী' হতে চলেছে। এছাড়াও নরেন্দ্র মোদী-র এবারের জাপান সফরে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। জাপানি বিনিয়োগ দেশে আনার ক্ষেত্রে ভারত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আগামী ৫ বছরে ভারতের নাগরিক ও অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জাপান ৩৩৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সম্ভব হতে পারে। এছাড়াও দু'দেশের মধ্যে সামরিক ও অসামরিক ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত সহযোগিতা এ অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক চিত্রটিকেও বদলে দিতে পারে বলে পর্যবেক্ষকমহলের অনুমান।

● **আট শতাব্দী পরে ফের খুলল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় :**

দীর্ঘ ৮০০ বছর পর ফের খুলল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। গত ১ সেপ্টেম্বর রাজগির থেকে ১২ কিমি দূরে বিহার সরকারের একটি ভবনে ইতিহাস এবং পরিবেশ বাস্তুতন্ত্রবিষয়ক দুটি বিভাগে ক্লাস শুরু হল। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে আপাতত ১৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। সেখানে যোগ দিয়েছেন ১১ জন শিক্ষক। নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন।

২০২০ সালের মধ্যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন ও আবাসিকদের থাকার ব্যবস্থার কাজ শেষ হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

● **বন্দি মুক্তি নিয়ে আদালতের নির্দেশ :**

শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি রাজেন্দ্র মাল লোধা-র নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ গত ৫ সেপ্টেম্বর এক রায়ে জানায়, কোনও বিচারাধীন বন্দি তাঁর সর্বোচ্চ শাস্তির মেয়াদের অর্ধেকের বেশি কারাবাস ভোগ করে ফেললে সংশ্লিষ্ট আদালত ওই ব্যক্তিকে মুক্তি দেবে। এক জনস্বার্থের মামলার রায়ে শীর্ষ আদালত, ১ অক্টোবর থেকে দু'মাসের মধ্যে নিম্ন আদালতগুলিকে এই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে। উল্লেখ্য, সারা দেশের প্রায় চার লক্ষ বন্দির মধ্যে আড়াই লক্ষ-ই বিচারাধীন। অর্থাৎ মোট সংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ।

● **ভারত-অস্ট্রেলিয়া পরমাণু চুক্তি :**

নয়াদিল্লি সফররত অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী টোনি অ্যাবটের সঙ্গে বহু প্রতীক্ষিত পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষর করল ভারত। এর ফলে, পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম কাঁচামাল ইউরেনিয়াম অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করতে পারবে ভারত। প্রসঙ্গত, ভারত 'পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি' (NTP)-তে স্বাক্ষর করেনি বলে প্রথমে ইউরেনিয়াম রপ্তানিতে নারাজ ছিল বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ইউরেনিয়াম উৎপাদক দেশ অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু সম্প্রতি অস্ট্রেলীয় প্রশাসন জানিয়েছে, আমদানি করা ইউরেনিয়াম অসামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের যে নিশ্চয়তা ও সতর্কতা বিধি ভারত দিয়েছে, তাতে আশ্বস্ত হয়েই চুক্তি স্বাক্ষরের রাজি হয়েছে তারা।

● **হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিধানসভার ভোট ঘোষণা :**

৯০ আসনবিশিষ্ট হরিয়ানা আর ২৮৮ আসনের মহারাষ্ট্র বিধানসভার নির্বাচনের দিন ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। ওই দুটি রাজ্যে একই দিনে, ১৫ অক্টোবর ভোট নেওয়া হবে। ১৯ অক্টোবর ফলাফল ঘোষণা করা হবে। বর্তমানে এই দুটি রাজ্যেই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় রয়েছে।

● **পথ সুরক্ষায় নতুন আইন কেন্দ্রের :**

দেশের সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে 'সড়ক পরিবহণ ও নিরাপত্তা বিল'-এর খসড়া পেশ করল কেন্দ্রীয়

সরকার। খসড়া বিল অনুযায়ী, সড়ক পরিবহণ নিয়ন্ত্রণে নতুন দুটি স্বশাসিত সংস্থা, ন্যাশনাল অথরিটি অফ রোড সেফটি ও ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড মাল্টি-মোডাল অথরিটি, গঠন করা হচ্ছে। এছাড়াও, অভিন্ন গাড়ি রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম ও বায়োমেট্রিক ড্রাইভিং লাইসেন্স পদ্ধতি চালু, প্রযুক্তি নির্ভর লাইসেন্স-এর পরীক্ষা, শিশুদের জন্য বিশেষ হেলমেট, সমস্ত সড়ক ব্যবহারকারীর জন্য বিমা সুবিধা, তার জন্য বিশেষ তহবিল গঠন ইত্যাদি প্রস্তাব রাখা হয়েছে নতুন আইনের খসড়ায়।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর নিরিখে বিশ্বে এক নম্বরে ভারত। প্রতি তিন মিনিটে এক জন পথ দুর্ঘটনায় মারা যান এদেশে। এই পরিসংখ্যানের প্রেক্ষিতেই নতুন আইন আনার এই উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

● **জম্মু-কাশ্মীরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় :**

আগস্টের শেষে এবং সেপ্টেম্বরের শুরুতে বন্যার দাপট বেশ বড়সড় ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। মৃতের সংখ্যা দুশোর ওপর। সর্বস্ব খুইয়ে আশ্রয়হীন কয়েক লক্ষ মানুষ। জলবন্দি অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়া মানুষেরা এখন ত্রাণ শিবিরে। সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিক জানা না গেলেও তা যে বিপুল ও ব্যাপক সন্দেহ নেই। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলেও পুরো স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই রাজ্য

● **হাতির জন্ম নিয়ন্ত্রণে পরীক্ষামূলক প্রকল্প রাজ্যে :**

বুনো হাতির সংখ্যা কমাতে তাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করতে পরীক্ষামূলকভাবে 'পাইলট প্রজেক্ট' শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকারের বনদপ্তর। আর ওই প্রকল্পের প্রাথমিক প্রয়োগের জন্য এই রাজ্যকেই বেছে নেওয়া হল। উত্তরবঙ্গের হাতিরাই প্রথম টার্গেট। এই কাজে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিশেষজ্ঞদের আনা হচ্ছে। ঘুম পাড়ানি গুলি ছোড়ার পদ্ধতিতে হাতিদের শরীরে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ইঞ্জেকশন ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। এদিকে রাজ্যের হাতি বিশেষজ্ঞমহল, 'প্রকৃতি সন্তানদের সঙ্গে মানুষের এই একতরফা' আচরণের তীব্র বিরোধিতা করেছে। এই ব্যবস্থা নীতি বিরুদ্ধ এবং হাতিদের ভারসাম্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এছাড়াও হাতি বিশেষজ্ঞদের তথ্য অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে হাতি বৃদ্ধির হার আদৌ উদ্বেগজনক নয়।

● **রাজ্যে মহিলা ভোটার বাড়ানোর উদ্যোগ :**

রাজ্যে পুরুষের তুলনায় মহিলা ভোটারের সংখ্যা কম। পুরুষ এবং মহিলা ভোটারদের অনুপাত ১০০০ : ৯৩১। প্রতি হাজার পুরুষে ৯৩১ জন মহিলা। অথচ জনসংখ্যার নিরিখে প্রতি হাজার পুরুষে ৯৫০ জন মহিলা। ভোটের ময়দানে এই ব্যবধান ঘোচাতে আসরে নামল নির্বাচন কমিশন। মহিলাদের আরও বেশি সংখ্যায় ভোটার তালিকায় যোগ দেওয়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংগঠন, 'আশা', 'আইসিডিএস', 'স্বনির্ভরগোষ্ঠী' এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কমিশন। ওই সব সংস্থার কর্মীদের কাজ হবে ভোটার তালিকায় নাম তোলার ব্যাপারে মহিলাদের উৎসাহিত করা। প্রয়োজনে মহিলাদের কাছে 'ফর্ম' (আবেদনপত্র) পৌঁছে দেবেন তাঁরা।

● **বিনয় কোঙার ও সইফুদ্দিন চৌধুরী প্রয়াত :**

একই দিনে (১৪ সেপ্টেম্বর) প্রয়াত হলেন প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা বিনয় কোঙার (৮৪) এবং প্রাক্তন সিপিআই(এম) সাংসদ (পরে পৃথক সংগঠন গড়ে তোলেন) সইফুদ্দিন চৌধুরী (৬২)। ঘটনাচক্রে দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরই আদি বাড়ি বর্ধমানের মেমারিতে।

অর্থনীতি

● **ক্রেডিট কার্ডে নতুন রীতি রিজার্ভ ব্যাংক-এর :**

অনলাইনে ভারতীয় ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কেনাকাটার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধাপে 'পাসওয়ার্ড' দেওয়ার পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করল রিজার্ভ ব্যাংক। এবার থেকে ওই ধরনের লেনদেনে বিল মেটাতে হবে এ দেশেরই কোনও ব্যাংকের মাধ্যমে এবং তা দিতে হবে টাকায়। ডলার বা অন্য কোনও বিদেশি মুদ্রার মাধ্যমে দাম মেটালে চলবে না।

● **চোদ্দোটি গাড়ি সংস্থাকে জরিমানা :**

দেশের প্রথম শ্রেণির ১৪টি গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থাকে ২৫৪৫ কোটি টাকার জরিমানা করল প্রতিযোগিতা কমিশন। সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে গাড়ির যন্ত্রাংশের জোগান কমিয়ে লাভ ওঠানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। প্রতিযোগিতা আয়োগের (কম্পিটিশন কমিশন) রিপোর্টে মারুতি, টাটা মোটরস, মাহিন্দ্রা-র মতো ভারতীয় সংস্থার পাশাপাশি ফিয়াট, বিএমডব্লু, ফোর্ড, মার্সিডিজ, হন্ডা, টেয়োটা, স্কোডা, নিসান, জেনারেল মোটরসেরও নাম রয়েছে বলে জানা গেছে।

● **রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন পদক্ষেপ :**

রপ্তানি বাড়ানোর লক্ষ্যে এবার রাজ্যগুলিকে 'এক্সপোর্ট কমিশনার' নিয়োগ করার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারি সূত্রে বলা হয়, রাজ্য স্তরে জোগানের পথে বাধা দূর করা এবং বরাদ্দ টাকার যথাযথ ব্যবহার করে পরিকাঠামো উন্নয়নে সাহায্য করাই কমিশনারদের কাজ হবে।

● **গ্যাসের দাম নিয়ে কেলকার কমিটির সুপারিশ :**

সরকার নিযুক্ত কেলকার কমিটির সুপারিশ হল, উৎস যাই হোক না কেন, গ্যাসের দাম বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই হওয়া উচিত। 'রোডম্যাপ ফর রিডাকশন ইন ইমপোর্ট ডিপেনডেন্সি ইন হাইড্রোকার্বন সেক্টর, ২০৩০' শীর্ষক রিপোর্টে এই সূত্র দিল কমিটি। কমিটির মতে, উৎপাদন খরচের ওপর যুক্তমূল্য ধরে গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা উচিত। উল্লেখ্য, বেশ কিছু দিন আগে, একই কথা বলেছিল সংসদীয় কমিটি এবং বেশ কয়েকটি শিল্প সংস্থা।

● **নতুন 'সেবি' আইন চালু :**

দেশের শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'সেবি'-র (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া) হাত আরও শক্ত করার জন্য নতুন আইন নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করল কেন্দ্র। নতুন আইনের নাম 'সিকিউরিটিজ লজ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট'। আইনটি সম্প্রতি সংসদেও গৃহীত হয়েছে। নতুন আইন অনুযায়ী, এবার থেকে 'সেবি' সরাসরি কোনও সংস্থার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে। পাশাপাশি, যেসব সংস্থা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলে তা মেটাতে ব্যর্থ হবে, প্রয়োজনে তাদের কর্তাদের গ্রেপ্তারের নির্দেশও জারি করতে পারবে।

● **নতুন নীতি বিলগ্নীকরণে :**

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের জারি করা নতুন এক নীতিতে, এবার থেকে খুচরো বিনিয়োগকারীরা আরও বেশি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার কিনতে পারবেন বলে বলা হয়েছে। দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে শেয়ার

বিক্রির সময় খুচরো বিনিয়োগকারীদের জন্য ২০ শতাংশ শেয়ার সরিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নতুন নীতিতে।

● **'জন-ধন' যোজনায় কেন্দ্রের উৎসাহ :**

প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার কাজে গতি আনতে ব্যাংকগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য 'উৎসাহ প্রকল্প' চালু করার সিদ্ধান্ত জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক একটি খসড়া তৈরি করেছে। সেই অনুযায়ী 'উৎসাহ প্রকল্প' কাজ করবে। উল্লেখ্য দেশের সাড়ে সাত কোটি পরিবারের প্রতিটিতে অন্তত দু'জনের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দিতে 'জন-ধন' প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই কাজ শেষ করতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে ২৬ জানুয়ারির সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সব ক'টি ব্যাংক যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই লক্ষ্য পূরণে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে তার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার 'উৎসাহ প্রকল্প' চালু করেছে।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

● **মহাকাশে ইঁদুর :**

আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে তিন মাসের জন্য ইঁদুর পাঠানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করল মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ন্যাশনাল অ্যারোটেনিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা)। উল্লেখ্য, এর আগেও ইঁদুর পাঠানো হয়েছিল। তবে তা ছিল কেবল এক থেকে দু' সপ্তাহের জন্য। মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই বললেই চলে। সেই সামান্য মাধ্যাকর্ষণ (মাইক্রো-গ্র্যাভিটি) ইঁদুরদের ওপর কতটা প্রভাব ফেলে সে দিকেই লক্ষ্য বিজ্ঞানীদের।

● **'হাড়' নয় পাথর :**

মঙ্গলগ্রহের মাটিতে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে 'হাড়'-এর মতো দেখতে একটি বস্তুর সান্নিধ্যে এসেছিল মার্কিন মহাকাশ গবেষণা যান 'কিউরিওসিটি রোভার'। হইহই পড়ে গিয়েছিল বিজ্ঞনীমহলে। বস্তুটিকে প্রথমে ডাইনোসর জাতীয় কোনও অতিকায় জীবের ফসিল হয়ে যাওয়া 'ফিমার' বলেই মনে হয়েছিল। প্রশ্ন উঠেছিল, তবে কি মঙ্গলে জন্মানো প্রাণ এত দূর পর্যন্ত এগিয়েছিল? কিন্তু বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সব আশায় জল ঢেলে দিয়ে বিজ্ঞানীরা জানিয়ে দেন, খুঁজে পাওয়া ওই বস্তুটি দেখে যাই মনে হোক, সেটি আসলে পাথরের টুকরো ছাড়া কিছুই নয়।

● **ইবোলা ও এইচআইভি নির্মূলে এক নতুন ধাপ :**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি স্কুল অফ মেডিসিনের মলিকিউলার মাইক্রোবায়োলজি-র চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা একযোগে ইবোলা ও এইচআইভি সংক্রমণ দমন করার উপায় খুঁজে পেয়েছেন। বিজ্ঞানীদের দাবি, নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে তাঁরা এমন এক প্রোটিন পরিবারের সন্ধান পান যার বৈশিষ্ট্য হল ইবোলা সংক্রমিত কোষগুলির মধ্যে ঢুকে পড়া এবং ওই কোষ থেকে নতুন জীবাণু সৃষ্টির পথ বন্ধ করে দেওয়া। এদিকে, ইবোলা প্রতিরোধ করতে সক্ষম এমনই কোনও প্রোটিনের সন্ধান করার সময়ই কিছুটা আকস্মিকভাবেই বিজ্ঞানীদের নজরে আসে এমন এক প্রোটিন পরিবারের, যার সদস্য সব প্রোটিনই শুধু ইবোলাই নয়, এইচআইভি আক্রান্ত একটি কোষ থেকে নতুন কোনও কোষে ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়াও আটকে দিতে পারে।

অর্থাৎ, এই প্রথম এমন কোনও প্রোটিনের সন্ধান পাওয়া গেল, যা একই সঙ্গে ইবোলা ও এইচআইভি, দুই মারণ রোগকেই রোধ করতে সক্ষম।

● **ভিনগ্রহে 'রোবোবাহিনী' পাঠাচ্ছে 'নাসা' :**

ভিনগ্রহ অভিযানে মার্কিন মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র 'নাসা'-র অনুপ্রেরণা পিঁপড়ে। অর্থাৎ পিঁপড়ে যে পদ্ধতিতে কাজ করে, অবিকল সেই পদ্ধতিতেই এক রোবোবাহিনী তৈরি করা শুরু করেছে 'নাসা'। মঙ্গলগ্রহে পাঠানো কিউরিওসিটির মতো দু'টনের বড়সড় যন্ত্রযান নয়, তার চেয়ে অনেক ছোট মাপের যন্ত্র তৈরি করে পাঠানো হবে ভিনগ্রহে। ছোট মাপের এই রোবো দলের নাম দেওয়া হয়েছে 'সোয়ার্মি'। ওয়েব ক্যাম, জিপিএস, রেডিয়ো যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদিতে সজ্জিত এই 'সোয়ার্মি' নামিয়ে দেওয়া হবে অন্য কোনও গ্রহে। পিঁপড়েরা যেমন খাবারের সন্ধান পেলেই বাসার বাকি সদস্যদের সংকেতে খবর পৌঁছে দেয়, ঠিক তেমনি 'সোয়ার্মি'র একজন কোনও আকর্ষণীয় কিছুর সন্ধান পেলে রেডিয়োর মাধ্যমে অন্যদের কাছে সেই খবর ছড়িয়ে দেবে।

● **ফের আরও একবার মহাবিশ্ব ধ্বংসের হুঁশিয়ারি হকিং-এর :**

বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং আরও একবার সৃষ্টিনাশের হুঁশিয়ারি দিলেন। অতীতে হকিং ভিনগ্রহীদের হাতে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। এবার দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও জটিল গাণিতিক ফর্মুলার সাহায্যে হকিং দেখিয়েছেন 'হিগস-বোসন' বা ঈশ্বরকণার আঘাতে সৃষ্টি লয় হতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। স্টিফেন হকিং-এর এই সতর্কবার্তা প্রকাশ করা হয়েছে 'স্টারমুস' নামের একটি সংকলন গ্রন্থে।

খেলার জগৎ

● **সরে দাঁড়ালেন ইন্দ্রজিৎ সিং বিন্দ্রা :**

জাতীয় ক্রিকেট প্রশাসন থেকে অবসর নিলেন পাঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থার প্রেসিডেন্ট ইন্দ্রজিৎ সিং বিন্দ্রা। সংস্থার সঙ্গে গত ৩৬ বছর যুক্ত ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা বিসিসিআই-এর এই প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। তাঁর জায়গায় প্রেসিডেন্ট হলেন বরিষ্ঠ আইএএস অফিসার ডিপি রেড্ডি। ৭০ বছরের বিন্দ্রা এখন পাঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থার দৈনন্দিন কাজের জন্য সময় দিতে চান।

● **অবসর ভেঙে ফের স্বমহিমায় ফেল্পস্ :**

অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে প্রথম বড় সাফল্য পেলেন কিংবদন্তি মার্কিন সাঁতারু মাইকেল ফেল্পস্। ১৮টি অলিম্পিক সোনার মালিক, অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্টে আয়োজিত, প্যান প্যাসিফিক চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম ব্যক্তিগত সোনা জিতলেন ১০০ বাটারফ্লাইয়ে। ৪ × ২০০ ফ্রিস্টাইল রিলেতেও ফেল্পস্-সহ জয়ী মার্কিন দল। সফল পুরুষ মেড্‌লে দলেরও সদস্য ছিলেন তিনি।

● **ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ ভারতের :**

টেস্ট সিরিজে লজ্জাজনক হারের পরে একদিনের সিরিজে ইংল্যান্ডকে টেক্কা দিল ভারত। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ৩-১ ফলাফলে জিতে নিল। ব্রিস্টলে প্রথম একদিনের ম্যাচ বৃষ্টিতে ধুয়ে যায়। কার্ডিফ, ট্রেন্টব্রিজ এবং এসবাস্টনে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ম্যাচে ভারত অনায়াসে জিতে সিরিজও হাতে নেয়। তবে বার্মিংহ্যামে নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচে ইংল্যান্ড দাপট নিয়েই জয়ী হয়।

● **বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে ফের ব্রোঞ্জ সিন্ধু-র :**

ফের বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে সেমিফাইনালে আটকে গেলেন পিভি সিন্ধু। কোপনহেগেনে স্পেনের ক্যারোলিনা মারিনের কাছে ১৭-২১, ১-২১ হারেন তিনি। এই নিয়ে টানা দুবার ফাইনালে ব্যর্থ হলেন সিন্ধু। শেষ আটের (কোয়ার্টার ফাইনালে) বাধা টপকে

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে টানা দুবার ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করে ইতিহাস গড়েছিলেন হায়দ্রাবাদের তারকা। ফাইনালে উঠলে তা হত এক অনন্য কীর্তি।

● **ইউএস ওপেন টেনিসে সানিয়ার মিক্সড ডাবলস খেতাব :**

নিউইয়র্কে ইউএস ওপেন টেনিসে মিক্সড ডাবলস খেতাব জিতলেন ভারতীয় তারকা সানিয়া মির্জা। ব্রাজিলীয় ব্রুনো সোয়রেস-কে সঙ্গী করে সানিয়া ফাইনালে ৬-১, ২-৬, ১১-৯ সেটে হারান মার্কিন-মেক্সিকান জুটি অ্যাবিগেল স্পিয়ার্স এবং সান্তিয়াগো গঞ্জালেস-কে। এটি সানিয়ার তিন নম্বর গ্র্যান্ডস্লাম এবং সবকটিই মিক্সড ডাবলসে। মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জিতলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাতারকা সেরেনা উইলিয়ামস। এই নিয়ে পর পর তিনবার মার্কিন ওপেনে চ্যাম্পিয়ন সেরেনার ঝুলিতে এখন ১৮টি গ্র্যান্ডস্লাম। একই সঙ্গে তিনি স্পর্শ করলেন দুই কিংবদন্তি মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা এবং ক্রিস এবার্টের রেকর্ড।

পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জিতলেন ক্রোয়েশিয়ার মারিন চিলিচ। ফাইনালে তিনি ৬-৩, ৬-৩, ৬-৩ সেটে পর্যুদস্ত করলেন জাপানের কেই নিশিকোরিকে। চিলিচ-এর এটাই প্রথম গ্র্যান্ডস্লাম। ২০০১ সালে গোরান ইভানিসেভিচ-এর পর এই প্রথম ক্রোয়েশিয়ার কেউ গ্র্যান্ডস্লাম জিতলেন। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে ডোপিংয়ের দায়ে চার মাস নির্বাসিত ছিলেন চিলিচ। তারপর এই গ্র্যান্ডস্লাম জয়।

● **কলকাতা ফুটবল লিগ খেতাব ইস্টবেঙ্গলের :**

চ্যাম্পিয়নশিপের নির্ণায়ক ম্যাচে টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে ২-১ গোলে হারিয়ে কলকাতা ফুটবল লিগ খেতাব জিতে নিল ইস্টবেঙ্গল। টানা ছ'বার এবং এই নিয়ে মোট ৩৬ বার লিগ চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল।

● **ব্যাডমিন্টনে প্রথম বড় মাপের আন্তর্জাতিক খেতাব প্রণয়ের :**

জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়ান মাস্টার্স গ্রাঁ-প্রি ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের খেতাব জিতলেন ভারতের এইচএস প্রণয়। ফাইনালে তিনি ২১-১১, ২২-২০ গেমে হারান ইন্দোনেশিয়ার ফিরম্যান আব্দুল খলিককে এর আগে ভিয়েতনাম গ্রাঁ-প্রি ব্যাডমিন্টনে প্রণয় রানার্স হন। এই প্রথম বড় মাপের আন্তর্জাতিক খেতাব প্রণয়ের।

বিবিধ সংবাদ

● **'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কারজয়ী কন্নড় সাহিত্যিকের জীবনাবসান :**

প্রখ্যাত কন্নড় সাহিত্যিক, উদুপি রাজাগোপালচার্য অনন্তমূর্তি, (৮২) প্রয়াত হলেন। প্রচলিত বিশ্বাসকে বরাবরই প্রশ্ন করেছে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'সংস্কার'। ওই উপন্যাসে তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদ, কুসংস্কার এবং ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় পাঠকমহলে। পরে উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। ছবিটি জাতীয় পুরস্কারও পায়। সারা জীবনে তিনি মোট পাঁচটি উপন্যাস, একটি নাটক, আটটি গল্প সংগ্রহ, কবিতার তিনটি সংকলন এবং আটটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯৯৪ সালে 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার পান। ১৯৯৮ সালে 'পদ্মবিভূষণ' রচনা করেন। ২০১৩ সালে 'ম্যান বুকার' আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন। পেশায় অধ্যাপক অনন্তমূর্তি দু-দশকেরও বেশি মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

● **'গান্ধী'-স্রষ্টা অ্যাটেনবরো আর নেই :**

বিশ্ব জুড়ে আলোড়ন ফেলে দেওয়া 'গান্ধী' ছবির পরিচালক রিচার্ড স্যামুয়েল অ্যাটেনবরো প্রয়াত হলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯০। দীর্ঘ জীবনে অ্যাটেনবরো 'দ্য গ্রেট এস্‌কেপ', সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি', 'জুরাসিক পার্ক'-সহ একাধিক সাড়া জাগানো ছবিতে অভিনয় করেছেন। 'আ ব্রিজ টু ফার', 'ওহ! হোয়াট আ লাভলি ওয়ার', 'ক্রাই ফ্রিডম'-এর মত সফল চলচ্চিত্রের পরিচালকও অ্যাটেনবরো। কিন্তু 'গান্ধী' তাঁকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। ওই ছবির মধ্য দিয়ে পশ্চিমি দর্শককে তিনি মহাত্মা গান্ধী-কে নতুন করে চিনতে শিখিয়েছেন। ১৯৮২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ওই ছবি ৮টি 'অস্কার' পুরস্কার জিতে নেয়। ১৯৭৬ সালে অ্যাটেনবরো 'নাইট' উপাধি পান। ১৯৮৩ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মানে ভূষিত করে। আর ১৯৯৩ সালে তাঁকে 'লাইফ পিয়ার' সম্মান দেওয়া হয়।

● **বিশ্বের বৃহত্তম ছবি :**

২৬ আগস্ট তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা-তে সমবেত হন কয়েক হাজার মানুষ। পর পর দাঁড়িয়ে তাঁরা সৃষ্টি করেন দেশের সবচেয়ে সম্মানিত রাষ্ট্রনায়ক কামাল আতাতুর্কের একটি ছবি। এই ছবিকেই বিশ্বের বৃহত্তম ছবি বলে দাবি করেছে তুরস্ক।

● **বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ বিপান চন্দ্র প্রয়াত :**

প্রয়াত হলেন ইতিহাসবিদ বিপান চন্দ্র। বয়স হয়েছিল ৮৬। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে তাঁর গবেষণা উল্লেখযোগ্য। ঔপনিবেশিকতা থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন, সমসাময়িক ইতিহাস থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই—অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। বিপান চন্দ্রের লেখা আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাওয়া কয়েকটি বই : 'ইন দ্য নেম অফ ডেমোক্র্যাসি : দ্য জেপি মুভমেন্ট অ্যান্ড দ্য ইমার্জেন্সি', 'দ্য রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অব ইকোনমিক ন্যাশনালিজম', 'ন্যাশনালিজম অ্যান্ড কনোলিয়ালিজম ইন মডার্ন ইন্ডিয়া' ইত্যাদি। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মান দেয়।

● **আত্মহত্যার চালচিত্র :**

প্রতি ৪০ সেকেন্ডে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ আত্মহত্যা করছেন বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানাল। ১৭২টি দেশের নাগরিকদের নিয়ে প্রায় এক দশক ধরে সমীক্ষা চালিয়ে এই তথ্য প্রকাশ করেছে 'হু'। সমীক্ষার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আত্মঘাতী হওয়ার হার বেশি ধনী দেশগুলিতে। বেশিরভাগ ঘটনাতেই আবার আত্মঘাতী ব্যক্তি মানসিক রোগে ভুগছিলেন। ভারতের ক্ষেত্রে 'হু'-র তথ্য, প্রতি এক লক্ষ ভারতীয়ের মধ্যে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন ২১.১ জন।

● **প্রথম মহিলা 'লোকো পাইলট' :**

পূর্ব রেলের ইতিহাসে প্রথম মহিলা ইলেকট্রিক লোকো পাইলটের দায়িত্ব পেলেন পাঁশকুড়ার তরুণী মৌমিতা অধিকারী। টানা চার বছর সহকারী পাইলট হিসাবে দায়িত্ব সামলানোর পর মৌমিতা এই বিরল সম্মান পেলেন।

● **চলে গেলেন ফিরোজা বেগম :**

নজরুলগীতির সম্রাজ্ঞী ফিরোজা বেগম ঢাকায় প্রয়াত হলেন। বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। অতীত দিনের দিক্‌পাল সুরকার কমল দাশগুপ্তের সুরে 'কত দিন দেখিনি তোমায়' এবং 'এমনি বরষা ছিল সেদিন' গেয়ে প্রথম শ্রোতাদের দরবারে প্রতিষ্ঠা পান। তারপর পাঁচ দশক ধরে তাঁর মায়াবী কণ্ঠ শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখে। দীর্ঘ সংগীত জীবনে ফিরোজা পেয়েছেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ 'একুশে পুরস্কার', 'স্বাধীনতা পুরস্কার'। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 'মহাসংগীত সম্মান'-এ ভূষিত করে।□

সংকলক : দেবাংশু দাশগুপ্ত

জা নে ন কি?

পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন

মলয় ঘোষ

পণ একটি দীর্ঘদিনের কু-প্রথা। আর এই প্রথার জেরেই মহিলারা স্বামীর গৃহে বিশেষভাবে নিগৃহীত হন। পণপ্রথা নিষিদ্ধ করতে ১৯৬১ সালে তৈরি হয় 'পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন'। আইনের অনেক ফাঁকফোকর থাকায় সমাজের বিশেষ উপকার হয়নি। বরং সময়ের সঙ্গে পণের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর এর সঙ্গে বেড়েছে বধূ নির্যাতন, আত্মহত্যা বা খুনের মতো ঘটনা। উপযুক্ত বয়সে বিয়ের খরচ বহন করা কষ্টকর, এই ভেবেই অনেক সময় দরিদ্র বাবা-মা বাল্য অবস্থাতেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। অনেকের ধারণা এই সময় পণের পরিমাণ হয়তো কম লাগে। কিন্তু বাল্যবিবাহ অন্যায়। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে বিভিন্ন দফায় এই আইন সংশোধন করে ১৯৮৬ সালে 'পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন' শেষ পর্যন্ত আকার নেয়।

পণপ্রথা নিষিদ্ধ করতে হলে, সেই সঙ্গে দরকার বাল্যবিবাহ রোধ করা। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী 'চাইল্ড' কথাটির অর্থ শূন্য থেকে ১৮ বছর অনূর্ধ্ব একটি মানুষ। প্রতিটি শিশুরই জীবন ধারণের অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, সামগ্রিক বিকাশের অধিকার, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের পাশাপাশি বিয়ে করার অধিকার আছে। আমাদের দেশের আইনে বলা আছে, ছেলেদের ২১ বছর ও মেয়েদের ১৮ বছরের কম বয়স হলে বিয়ে দেওয়া যাবে না। এই আইন অর্থাৎ 'বাল্যবিবাহ রোধ আইন' ১৯২৯ সালে ভারতে চালু হয়। এরপর ১৯৭৮ সালে বেশ কিছু ধারায় তা সংশোধিত হয়। বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। যেমন ১৮ বছরের বেশি কিন্তু ২১ বছরের কম কোনও পুরুষ, যদি বাল্যবিবাহ করে সেক্ষেত্রে তার শাস্তি ১৫ দিন পর্যন্ত জেল অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুই-ই হতে পারে। আবার ২১ বছরের বেশি কোনও পুরুষ যদি বাল্যবিবাহ করে সেক্ষেত্রে তিন মাস পর্যন্ত জেল এবং জরিমানা উভয় শাস্তিই ভোগ করতে হতে পারে। যারা বাল্যবিবাহের আয়োজন করবে তাদেরও শাস্তির কথা আইনে বলা আছে। তিন মাস পর্যন্ত জেল এবং জরিমানা হতে পারে যদি না সে প্রমাণ করতে পারে যে তার বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ আছে যে সেই বিবাহটি বাল্যবিবাহ নয়। এমনকী শিশু যার হেফাজতে আছে (বাবা-মা বা অভিভাবক) তিনি যদি বাল্যবিবাহের চুক্তিতে আবদ্ধ হন বা সেই বিবাহে ইন্ধন দেন বা তাঁর অবহেলার জন্য ওই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তাহলে ওই ব্যক্তির তিন মাস পর্যন্ত জেল এবং জরিমানা হতে পারে। বাল্যবিবাহের মামলা বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া অন্য কোনও আদালতে হতে পারে না। অপরাধ ঘটার এক বছর পর বাল্যবিবাহের অভিযোগ গ্রাহ্য করার অধিকার আদালতের থাকে না। বাল্যবিবাহ হতে যাচ্ছে বা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এমন কোনও খবর যদি আদালতের কাছে অভিযোগ আকারে আসে, তাহলে আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের হলফনামা বা নোটিশ জারি করার পর ওই বিয়ে বন্ধ করার জন্য নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে। আইনে বলা হয়েছে, কোনও মহিলাকে বাল্যবিবাহের অপরাধে জেলে পাঠানো যাবে না। কারণ বিবাহের ব্যাপারে এখনও মেয়েদের স্বাধীন মতামত থাকে না বললেই চলে।

কখন পণ বলব

বিবাহের সময় উভয়পক্ষের একপক্ষ অর্থাৎ বরপক্ষ বা কনেপক্ষ বা তার বাবা বা মা অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কেউ যদি অন্য পক্ষ অথবা তার বাবা বা মা অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনও ব্যক্তিকে বিয়ে করার শর্ত হিসেবে বিয়ের আগে বা পরে, অথবা অনুষ্ঠানের দিন সোজাসুজি বা ঘুরপথে কোনও সম্পত্তি অথবা মূল্যবান জিনিস (নগদ টাকা, সোনা-দানা, আসবাবপত্র) দিতে বা দেওয়ার জন্য রাজি থাকেন, তখন তাকে পণ বলা যাবে।

তবে যাঁরা মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বা শরিয়তি আইন অনুযায়ী চলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে 'মেহের' (যা পাত্রপক্ষ কন্যাকে দেয়) পণের আওতায় আসবে না।

পণ দেওয়া-নেওয়ার শাস্তি

পণ দেওয়া ও নেওয়ার সঙ্গে যুক্ত উভয়পক্ষেরই শাস্তির বিধান আছে। এই কাজে সরাসরি যুক্ত থাকা বা লেনদেনে সাহায্য করার জন্য কমপক্ষে ৫ বছর জেল এবং জরিমানা আবার কমপক্ষে ১৫ হাজার টাকা অথবা পণের মূল্য, দুইয়ের মধ্যে যেটি বেশি সেই সাজা হবে।

কিন্তু কোনও রকম জোর জবরদস্তি ছাড়া যদি বর/কনে-কে উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও অপরাধ নেই। তবে সব উপহারের লিখিত তালিকা অবশ্যই রাখতে হবে। প্রচলিত রীতি বা আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী উপহার দিলে বা নিলে কোনও শাস্তির বিধান নেই।

দাবি করার শাস্তি

সোজাসুজি বা ঘুরপথে পণের দাবি করলে সাজা অন্তত ৬ মাস থেকে দুই বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। গণ মাধ্যমে যদি ছেলে/মেয়ে বা অন্য কোনও আত্মীয়ের বিবাহের জন্য টাকা বা ব্যবসায় ভাগ—এই ধরনের লোভ দেখিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাহলে ছাপাখানা, প্রচারক, প্রকাশকের সাজা হবে ৬

মাস থেকে ৫ বছর জেল অথবা ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

মহিলাদের করণীয়

বিবাহযোগ্যা যে সমস্ত মহিলা আছেন, তাঁরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন। তাঁরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন যে পণ দেবেন না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ (State Legal Services Authority, West Bengal) বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে, শহরে বিভিন্ন সময়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করে থাকে। সেই সব আইনি সচেতনতা শিবিরে দেখা গেছে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী থেকে আইন নিয়ে পাশ করা স্নাতক মহিলারা পর্যন্ত অভূতপূর্ব সাড়া দিচ্ছেন। বিয়ের দিনেও অনেক পাত্রী পাত্রপক্ষ পণ নিচ্ছে জেনে বিয়ে আটকে দিচ্ছেন। প্রতিবাদ করাটাই প্রধান কাজ।

অভিযোগ কোথায় জানাব

পাত্রপক্ষ পণ দাবি করলে, যাঁর কাছে দাবি করেছে তিনি নিজে বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহায়তায় থানায় এফআইআর (ফার্স্ট ইনফর্মেশন রিপোর্ট) করতে পারেন। আর পুলিশ অভিযোগ না নিলে ওই এলাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ জানানো যায়। রাজ্য সরকারও এই আইন প্রয়োগের জন্য বিশেষ অফিসার নিয়োগ করতে পারেন। তবে জেলায় সমাজকল্যাণ আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জানানো যায়। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিজে উদ্যোগ নিয়ে অথবা পুলিশি রিপোর্টের ভিত্তিতে অভিযোগের বিচার করতে পারেন। এছাড়াও যাঁর কাছে বা যাঁদের কাছে পণ চাওয়া হয়েছে, তিনি বা তাঁরা যেকোনও স্বীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে নালিশ জানাতে পারেন। এই অভিযোগ জানানোর কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ

জেলা	টেলিফোন নম্বর
বাঁকুড়া	০৩২৪২-২৫০৩১৫
বীরভূম	০৩৪৬২-২৫৫২৭১
বর্ধমান	০৩৪২-২৬৬২২০২
কোচবিহার	০৩৫৮২-২২৭৬৮১
দক্ষিণ দিনাজপুর	০৩৫২২-২৫৫২০৭
দার্জিলিং	০৩৫৪-২২৫৪২৯৭
হুগলি	০৩৩-২৬৮০২১৯১
হাওড়া	০৩৩-২৬৪০২১৯৩
জলপাইগুড়ি	০৩৫৬১-২২১৬৬৭
কলকাতা	০৩৩-২২৩০৪৬২৩
মালদা	০৩৫১২-২৫২৩০১
মুর্শিদাবাদ	০৩৪৮২-২৫৬৬৫০
পশ্চিম মেদিনীপুর	০৩২২২-২৭৫৮১৫
পূর্ব মেদিনীপুর	০৩২২৮-২৬৯৩৮৯
পুরুলিয়া	০৩২৫২-২২৬৬০৩
নদিয়া	০৩৪৭২-২৫২৩৩৮
উত্তর চব্বিশ পরগনা	০৩৩-২৫৫২৩০৯০
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা	০৩৩-২৪৭৯৭৬৯১
উত্তর দিনাজপুর	০৩৫২৩-২৫২৩০৪

পণজনিত মৃত্যু

বিয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যে অথবা ৭ বছরের মধ্যে বধূ আত্মহত্যা করলে অথবা তার অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে যদি প্রমাণিত হয় যে মৃতার স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের দুর্ব্যবহার, শারীরিক নির্যাতন ইত্যাদি তাঁকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা জুগিয়েছে বা তারা হত্যা করেছে তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে এর মূলে পণ আদায়ের অভিসন্ধি রয়েছে। এক্ষেত্রে অপরাধ যে এলাকায় হয়েছে, সেখানকার থানায় অভিযোগ দায়ের করতে হবে। শুধু জি.ডি. (জেনারেল ডায়েরি) নয়, এফআইআর দাখিল করতে হবে, যার মাধ্যমে পুলিশ মামলা শুরু করতে বাধ্য। দায়রা আদালতে অথবা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে এই মামলার বিচার হবে। এই অপরাধের শাস্তি জামিন অযোগ্য। কমপক্ষে ৭ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। আর সেই সঙ্গে পণ দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে কোনও চুক্তি স্বাক্ষরিত থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

স্ত্রীধন, উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য

বিয়ের এক বছর আগেও কোনওরকম পণ দেওয়া হলে, তা স্ত্রীরই প্রাপ্য। আবার বিয়ের সময় বা এক বছর পরে দেওয়া হলেও একই নিয়ম। নাবালিকা বধূর ১৮ বছর বয়স হলে, যৌতুক হিসেবে পাওয়া সমস্ত সামগ্রী তাকে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, পণের টাকা বা সামগ্রী স্ত্রীধন হিসেবে বধূ বা তার উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য।❑

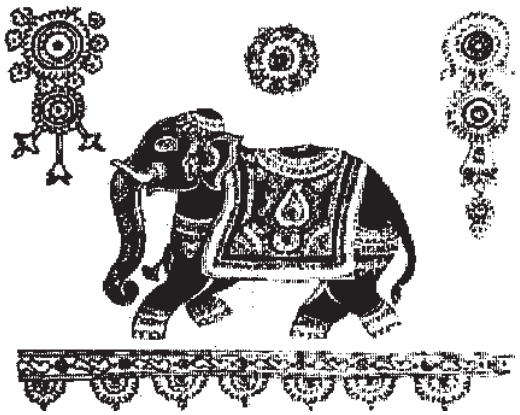

নতুন উদ্যমের কেরিয়ার : অন্ত্রপ্রেনিওরশিপ

মহুয়া গিরি

উদ্যোগপতি হতে চান? কেরিয়ার নিয়ে চিন্তা? সেদিন আর নেই। এই সময়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কেরিয়ার নিয়ে ভাবনার শুরুতেই উদ্যোগব্যবস্থাকে চিন্তা-ভাবনার মধ্যে রাখেন। উদ্যোগ-শিল্প আজ বিকল্প কেরিয়ার। চাকরি পাননি বলে, বা চাকরি করতে ভালো লাগে না বলে কিংবা পারিবারিক ব্যবসা আছে বলে উদ্যোগপতি হওয়ার যে পুরোনো রীতি তা আজকে বাতিল।

যাদের মাথায় নতুন কিছু করার ইচ্ছে, মাথায় অভিনব 'আইডিয়া' ঘোরে তাঁরা উদ্যোগপতি হতে চান এবং তাঁরাই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোয় নতুন চাকরির সম্ভাবনা তৈরি করেন। উদ্যোগপতিদের জন্যেই কোনও দেশের অর্থনীতিতে পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা বেড়ে যায়।

উদ্যমেই রয়েছে সাফল্যের চাবি। কথায় বলে না, 'উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্যানি ন মনোরথৈঃ'। অর্থাৎ উদ্যোগেই স্বপ্নপূরণ। সেই কবে ধনপতি সওদাগর অজানা সাগরে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও স্বপ্নের পাড়ি জামিয়েছিলেন সিংহলে। তবেই না তাঁর বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বসতি হল। ব্রিটিশ জামানায় প্রথম দিকের সফল ব্যবসায়ী-উদ্যোগপতি দেবেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরে মহাত্মা গান্ধী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ভাবুন তো আজকের বিল গেটস, মার্ক জুকারবার্গ-দের কথা। ব্যতিক্রমী উদ্যমই তাঁদের সফল উদ্যোগপতি করেছে। খুঁজে দেখুন এরকম অনেক উদাহরণ পাবেন।

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ কিছুদিন বইছে পরিবর্তনের হাওয়া। নতুন প্রজন্ম পুরোনো ধ্যানধারণায় আর চলতে চায় না। এখন পুঁজির অভাব হয় না—উদ্যোগ নিলে পাওয়া সম্ভব। সুতরাং টাকা না হলে উদ্যোগ সম্ভব নয়—এ কথায় আর কেউ বিশ্বাস করে না। ভাবনাটা এই রকম, ফেসবুক করে মার্ক জুকারবার্গ চূড়ান্ত সফল, স্টিভ জোবস্ অ্যাপল করে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন—আমরা কেন কিছু একটা পারব না?

উদ্যোগপতি হওয়ার ইচ্ছেই বড়—যে কোনও ক্ষেত্রে কেউ উদ্যোগপতি হয়ে উঠতে পারেন। তা না হলে অনেকে কেন চাকরি ছেড়ে এমবিএ পড়ে নতুন উদ্যোগের কথা ভাবেন? কিছুদিন আগের কথা, খড়গপুর আইআইটি-র পক্ষ থেকে জানানো হল যে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী পড়তে পড়তে নতুন উদ্যোগের জন্য কাজ করবেন তাঁদের মাঝখানে এক বছর ছুটি দেওয়া হবে। তাঁরা বাড়তি কিছু নম্বরও পাবেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে শুধু কি ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতেই এই চিত্র? না। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে অন্ত্রপ্রেনিওরশিপে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কেন এই ঝোঁক

শুধু কি বিপুল রোজগার, নাম-যশের হাতছানি নাকি অন্য কিছু? নতুন একটা কিছু করে দেখাবার নেশাতেই আজকের প্রজন্ম উদ্যোগপতি হতে চায়। প্রথামাফিক পড়াশোনার বাইরে এখন রয়েছে নানা রকমের কোর্স। আর সেই কোর্সের পর রয়েছে নতুন নতুন পেশার দিশা। এনজিও বা অনলাইনে ব্যবসা, চলচ্চিত্র কিংবা মাস-মিডিয়ার মতো সৃজনশীল ক্ষেত্রেও এই সব তরুণ উদ্যোগীরা দাপটের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে। 'কনজিউমারিজম'-এর এই সময়ে, পৃথিবী জোড়া এক গ্লোবাল বাজারে হাজার হাজার ক্রেতা আর তাদের চাহিদাও এক নয়। এই নানা রকমের চাহিদা মেটাতে উদ্যোগীরা আনছেন নানা রকমের পরিষেবা। ভার্চুয়াল কিংবা রিয়েল—এই সমস্ত পরিষেবার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এমবিএ-দের চাহিদা এখন তুঙ্গে। এমবিএ-এর পাঠ্যসূচিতে অন্ত্রপ্রেনিওরশিপ বা ব্যবসায়িক উদ্যোগের ওপর এখন বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। তার কারণ হল, ছাত্রদের মধ্যেই নতুন উদ্যোগ নেওয়ার ঝোঁক বাড়ছে। কিছুদিন আগে অনলাইনে করা এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এমবিএ ছাত্ররা এখন পে-প্যাকেজের থেকেও নানা ধরনের চ্যালেঞ্জিং কেরিয়ারেই বেশি আগ্রহী। মাত্র ১৭ শতাংশের কাছে পে-প্যাকেজই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর প্রায় ৮২ শতাংশই নিজেদের উদ্যোগ গড়তে চায়।

ঝুঁকি কতটা

নতুন উদ্যোগে ঝুঁকি তো রয়েছেই। কিন্তু লাভের অঙ্কটাও কম নয় যে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সদ্য কলেজ পাশ করে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একদল তরুণ-তরুণী স্রেফ কিছু পুঁজি আর শুভানুধ্যায়ীর সমর্থন নিয়ে নতুন উদ্যোগ চালু করেছে। এক্ষেত্রে ঝুঁকির আশঙ্কা থেকেই যায়। আবার যথাযথ পরিকল্পনা করে, দেশ-বিদেশের নামী প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি নিয়ে আটঘাট বেঁধে এগিয়েছে—এমন তরুণদের সংখ্যাও কম নয়। পরিকল্পনামাফিক এগোলে ঝুঁকি কিছুটা হলেও কমে। ইদানীং নতুন উদ্যোগপতিদের মধ্যে যথাযথ ট্রেনিং নিয়ে বা কোর্স করার পরেই ব্যবসায়ী উদ্যোগ নেওয়ার ঝোঁক বাড়ছে।

কীভাবে হবেন উদ্যোগপতি

প্রথমেই ঠিক করতে হবে কোন ধরনের ব্যবসায় আপনি আগ্রহী। আপনি কোন ব্যবসা

করতে চান তার উপর নির্ভর করবে আর্থিক বিনিয়োগের পরিমাণ। যেমন ম্যানুফ্যাকচারিং, ট্রেডিং, সার্ভিস বা পরিষেবা—প্রতিটি ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ একেবারে আলাদা। যে কোনও ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মের জন্য বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। আবার পরিষেবা ব্যবস্থার সঙ্গে যারা যুক্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কম হলেও প্রয়োজন কর্মঠ সুদক্ষ কর্মীর। কোন ধরনের ব্যবসায় নামবেন তা স্থির করার পরেই অর্থলগ্নির বন্দোবস্ত করতে হবে। কোনও উৎসাহী পুঁজিপতি বা ব্যাংক লোন, দু'দিক থেকেই আপনি লগ্নির ব্যবস্থা করতে পারেন। ঋণ ও নিজের গচ্ছিত সম্পদের পরিমাণ কতটা হবে তা নিয়ে নির্ভর করে প্রকল্পের সম্ভাবনা এবং আর্থিক অবস্থানের উপর। লোন আর ইক্যুইটি (নিজের গচ্ছিত)-এর আদর্শ অনুপাত হল ২:১-এর কাছাকাছি। এই ফিল্ডে ট্রেনিং নেওয়া থাকলে কাজে নামার আগেই অনেকটা আত্মবিশ্বাসী হওয়া যায়। আর উদ্যোগপতি যদি আত্মবিশ্বাসী হন, তবে অর্থলগ্নির ব্যবস্থা করার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। একজন সফল উদ্যোগপতি হতে গেলে অনেকগুলো বিষয়ে পারদর্শী হতে হয়। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তুখোড় 'পিপল স্কিল'-এর। পণ্য বা পরিষেবা—আপনি যেটাই জোগান দিন না কেন মনে রাখবেন গ্রাহকদের পছন্দ বিচিত্র এবং তা প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। বদলে যাওয়া চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিতে উদ্যোগপতিকে প্রচুর নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। দখল থাকা দরকার অ্যাকাউনটেন্সি, ফাইনান্স, মার্কেটিং, প্রোডাকশন, হিউম্যান রিসোর্স এবং এরকমই আরও কয়েকটি বিষয়ে। এর সঙ্গে অবশ্যই চাই নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা। একজন সুযোগ্য পরিচালক বিভিন্ন কাজে কেবলমাত্র দক্ষ প্রতিনিধি পাঠিয়েই কাজটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে পারেন। সততা ও নৈতিকতার সঙ্গে কাজ করে একবার গ্রাহকদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে পরবর্তী দিনে বাজার ধরার প্রতিযোগিতায় অনেকটাই এগিয়ে থাকা যায়।

কী পড়তে হয়

কেউ সফল উদ্যোগপতি হয়ে জন্মান না, তাঁরা গড়ে ওঠেন। পরিবার, পরিবেশ, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এসবের ওপরেই ভিত্তি করেই গড়ে উঠেন ভবিষ্যতের উদ্যোগপতিরা। তবে পরিকল্পনামাফিক যথাযথ প্রশিক্ষণ নেওয়া থাকলে তা সব সময়েই কাজে লাগে। যে সমস্ত ম্যানেজমেন্ট স্কুল, প্রতিষ্ঠান ও ফেডারেশনগুলিতে উদ্যোগপতি হয়ে ওঠার জন্য কোর্স করানো হয়, সেই প্রতিষ্ঠানগুলির ওপরেই নির্ভর করে কোর্সের মেয়াদ ও পাঠক্রমের ধরন-ধারণ। বিদেশে তো বটেই ভারতেও এখন অনেক প্রতিষ্ঠানেই এই বিষয়ে নানা পাঠক্রম চালু হয়েছে। আমাদের দেশে এই বিষয়ে যে সমস্ত কোর্স চালু হয়েছে সেগুলির ধরন অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

স্নাতকস্তরে বিবিএ কোর্সের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় হিসেবেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এটি পড়ানো হয়। অন্ত্রপ্রেনিওরশিপ নিয়ে এক বা দুই বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পড়াবার সুযোগ আছে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে। দূরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আছে করেসপনডেন্স কোর্সের ব্যবস্থাও। কর্মরত এগ্‌জিকিউটিভদের জন্য রয়েছে এক থেকে ছয় সপ্তাহে শর্ট-টার্ম কোর্স। বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট স্কুলের সহায়তায় চেম্বার অফ কমার্স অথবা ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনগুলো কোর্স চালানোর সঙ্গে যুক্ত থাকে। এমবিএ প্রোগ্রামের অংশ হিসেবেও ঐচ্ছিক অন্ত্রপ্রেনিওরশিপ কোর্স রয়েছে।

কোথায় পড়া যায়

আইআইএম ও দেশের অন্যান্য ম্যানেজমেন্ট স্কুলগুলি ছাড়া এই কোর্সগুলো পড়ানো হয় এমডিআই, এক্সএলআরআই, সিমবায়োসিস, এসপি জৈন-এর মতো প্রতিষ্ঠানে। এছাড়া পড়া যায় অল ইন্ডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (দিল্লি), অন্ত্রপ্রেনিওরশিপ ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়া (গুজরাত), এফআইসিসিআই (নয়াদিল্লি), স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ সার্ভিস ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট (নয়াদিল্লি), ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অন্ত্রপ্রেনিওরশিপ ডেভেলপমেন্ট (নয়াদিল্লি), ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর ন্যাশনাল অ্যান্ড স্মল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট (দিল্লি), লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (নয়াদিল্লি)। রয়েছে ভেলোর ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি (ভেলোর), সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (কলকাতা), বিড়লা ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স (পিলানি), ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ডিজাইন (আমেদাবাদ)-এর মত প্রতিষ্ঠানও।❑

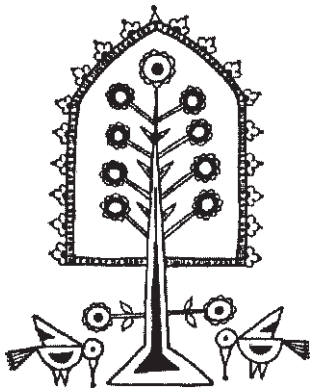

যোজনা ? কুইজ

১. মহাসাগরীয় বিশ্ববিজ্ঞান কংগ্রেস শুরু হবে ২০১৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। কোন দেশে?

২. ভারতের প্রথম প্রো কবাডি লিগে কোন দল জয়লাভ করল?

৩. এই প্রথম সুপ্রিম কোর্টের কোনও প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল হলেন। তাঁর নাম কী?

৪. ভারতের অলিম্পিক জয়ী বক্সার এম সি মেরি কমের জীবন কাহিনি নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র 'মেরি কম'-এ এই কিংবদন্তি বক্সারের ভূমিকায় কে অভিনয় করেছেন?

৫. বর্জ্য পদার্থকে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য কোন ভারতীয় বিজ্ঞানী 'অস্ট্রেলিয়ান লরিয়েট ফেলোশিপ' সম্মান পেয়েছেন?

৬. রাষ্ট্রসংঘের সাম্প্রতিক তথ্য সমীক্ষা অনুসারে বিশ্বের জনসংখ্যার কত শতাংশ শহরাঞ্চলে বসবাস করে?

৭. ভারতের কোন রাজ্যে বনাঞ্চল সবচেয়ে বেশি আছে?

৮. ২০১৫ সালে মহিলাদের ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

৯. ৩৫তম জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে কেরলের কোচিতে। প্রতিযোগিতার শুভেচ্ছাদূত কে নিযুক্ত হয়েছেন?

১০. বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯০৬ সালে। পরবর্তীকালে এর নাম কী হয়েছিল?

১১. রাষ্ট্রপতি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অর্থ কমিশন গঠন করেন। স্বাধীনতার আগে প্রথম অর্থ কমিশন কবে গঠিত হয়েছিল?

১২. পৃথিবীর কোন দেশে প্রথম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়?

১৩. জাহাজের গতিবেগ পরিমাপ করা হয় কোন এককের সাহায্যে?

১৪. 'পান্না' নামক মূল্যবান রত্ন কোন ধাতু দিয়ে তৈরি?

১৫. ভারতে প্রথম বিদেশি ব্যাংক কোনটি?

১৬. সমুদ্রের জল উত্তপ্ত হলে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায় তার নাম কী?

১৭. 'বিশ্ববাসস্থান দিবস' কোন দিনটিতে পালন করা হয়?

১৮. দেশের প্রতিটি পরিবারের অন্তত একজন ব্যক্তিকে ইন্টারনেট ও কমপিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার যে প্রকল্প চালু করেছে তার নাম কী?

১৯. ২০১৫ সালের কমনওয়েলথ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির শীর্ষ বৈঠক কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

২০. 'ইন্ডিয়া আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স' এই বিখ্যাত গ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর :

১. ভারতে। কেরলের কোচিতে অনুষ্ঠেয় এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে দেশ-বিদেশের দু'হাজারেরও বেশি বিজ্ঞানী অংশ নেবেন। ২. জয়পুর পিঙ্ক প্যান্থার্স। ফাইনালে হারিয়ে দেয় মুম্বইয়ে ইউমুম্বা দলকে। ৩৫-২৪ পয়েন্টে। কাবাডি লিগে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হয়েছেন মুম্বইয়ের অধিনায়ক অনুপ কুমার। ৩. পালানিস্বামী সদাশিবম্। কেরল রাজ্যের রাজ্যপাল হয়েছেন তিনি। ৪. প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ৫. বীণা সহজওয়ালা। ৬. ৫৪ শতাংশ। সবচেয়ে জনবহুল শহর টোকিও। দ্বিতীয় স্থানে আছে দিল্লি। ৭. আয়তনে মধ্যপ্রদেশ (৭৭৫২২ বর্গ কিলোমিটার) এবং শতাংশে মিজোরাম (৯০.৩৮ শতাংশ)। ৮. কানাডা। ৯. শচীন তেন্ডুলকার। স্বাধীনতার পর জাতীয় গেমসের প্রথম আসর বসেছিল লখনউতে। ১৯৪৮ সালে। ১০. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ১১. ১৯২১ সালে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন, রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় অনুদান ও সাহায্য সম্পর্কে অর্থ কমিশন সুপারিশ করে। ১২. সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৩. নট্ (Naut)। এক নট্ = ১৮৫২ মিটার। ১৪. বেরিলিয়াম ধাতু। ১৫. হংকং শাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন (HSBC)। ১৬. এলনিনো (EL Nino)। ১৭. অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার। ১৮. 'ই-ইনক্লুশান' প্রকল্প। ১৯. দক্ষিণ ইউরোপের দেশ মাল্টা'তে। ২০. বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ বিপান চন্দ্র'র। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বিপান চন্দ্র ৩০ আগস্ট, ২০১৪ প্রয়াত হয়েছেন।

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ভারতের অপ্রথাগত অর্থনীতির ভূমিকাসমূহ

ভারতে অপ্রথাগত অর্থনীতির আকার, আয়তন, বিস্তার, কাঠামো, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ এই নিবন্ধে তুলে ধরেছেন **বারবারা হ্যারিস হোয়াইট**। *নীতি ও পরিকল্পনার পরিধির বাইরে থেকে যাওয়া এই ক্ষেত্রটি সম্পর্কে বহু ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়ে নিয়ন্ত্রণহীনতা ও অপরাধপ্রবণতা কীভাবে এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়েছে, বিভিন্ন সমীক্ষার সাপেক্ষে তার সম্যক পরিচয় রয়েছে এই লেখায়।*

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ভারতের শহরে অপ্রথাগত ক্ষেত্র

দেশের জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে অবিরাম। আর প্রতিনিয়ত রুজি-রুটির সন্ধানে একের পর এক জনজোয়ার আছড়ে পড়ছে শহরের বুকে। ফলে জীবিকা অর্জনের লড়াইয়ের প্রতিযোগীদের সংখ্যার পাশাপাশি দারিদ্র ও বেকারত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে শহরাঞ্চলে। এই পরিস্থিতিতে "চাহিদা" মেটাতে কর্মসংস্থান "জোগানের" একমাত্র সূত্র হিসাবে অপ্রথাগত ক্ষেত্র কতটা উপযুক্ত ও কার্যকরী? জানাচ্ছেন **অরূপ মিত্র।**

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

লোকবিদ্যা ও ভারতের অপ্রথাগত ক্ষেত্র

স্বীকৃতি না থাকলেও, বিশ্বায়নের হাত ধরার আগে থেকেই ভারতীয় অর্থনীতিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ছিল। বাজার অর্থনীতির যুগে এই অপ্রথাগত ক্ষেত্রের আধিপত্য ছাপিয়ে গিয়ে প্রথাগত ক্ষেত্রের কর্মসংস্থানেও বেশ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। আর নিত্যনতুন প্রযুক্তির ভিড়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে হারিয়ে যাচ্ছে ভারতের সনাতন লোকবিদ্যা। লোকবিদ্যার সঙ্গে অর্থনৈতিক বিকাশের সমন্বয় ঘটিয়ে সার্বিক উন্নয়নের পরিকল্পনা কতটা বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী? আলোচনা করছেন **অমিত বেসোল।**

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

অপ্রথাগত ক্ষেত্র এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান

ভারতের অর্থনীতিতে অপ্রথাগত ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এ দেশের মোট শ্রমশক্তির ৮৬ শতাংশ অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, দেশের সামগ্রিক নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বর্তমান বাজারদরের নিরিখে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অবদান ৬০ শতাংশেরও বেশি। এই প্রবণতা শ্রমিকদের জীবনমান তথা দেশের অর্থনীতির পক্ষে একেবারেই মঙ্গলজনক নয়। অপ্রথাগত ক্ষেত্রের বর্তমান চিত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে **ড. উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য**-*র এই প্রবন্ধ।*

ভারতে অপ্রথাগত ক্ষেত্র

বৈশিষ্ট্য ও কর্মসংস্থান

দেশের মোট কর্মীবাহিনী বা ওয়ার্ক ফোর্স-এর সিংহভাগই অপ্রথাগত ক্ষেত্রভুক্ত। অর্থাৎ নিযুক্তি সংক্রান্ত কোনও বিধি এই সমস্ত কর্মীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোনও রকম সামাজিক সুরক্ষার আওতাতেও এরা পড়ে না। অর্থাৎ বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে কোনও একটা কাজ করতে পারলেই, এদের পক্ষে যথেষ্ট। দারিদ্র যত বাড়বে, ততই এরাও সংখ্যায় বাড়বে, এমনটাই লক্ষ করা যায়। আমরা মনে করি—কিছু তো একটা করছে, একেবারে বসে তো নেই! কিন্তু না, সব কর্মসংস্থানই কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে ইতিবাচক নয়। লিখছেন **ভব রায়।**

প্রধানমন্ত্রীর জন-ধন যোজনা

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ

প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনার মূল উদ্দেশ্য দরিদ্র অর্থক্লিষ্ট মানুষদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ছত্রচ্ছায়ায় আনা। তাদের জীবনের দুরবস্থার সামান্য হলেও উন্নতি ঘটানো। সরকার তাদের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্প বাবদ যে অনুদান দেন তা তাদের হাতে যাতে পৌঁছোয় তার ব্যবস্থা করা; তাদের কাজকর্মকে, উৎপাদনকে বিমার নিরাপত্তা দেওয়া। এইভাবে একটু একটু করে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং ঝুঁকির সঙ্গে যুঝবার শক্তি, ও ক্ষমতা দেওয়া। এই যোজনাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে নানা সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে আমাদের জানাচ্ছেন **প্রভাকর সাহু।**

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ভারত যে খুব একটা ভালো জায়গায় নেই, তা বলার অপেক্ষাই রাখে না। ২০১২ সালেও ১৫ বছরের বেশি বয়স্কদের মাত্র ৩৫ শতাংশের কোনও বিধিবদ্ধ আর্থিক সংগঠনে অ্যাকাউন্ট ছিল। সারা বিশ্বের বিকাশশীল দেশগুলিতে গড়ে ৪১ শতাংশ মানুষের অ্যাকাউন্ট আছে। রিজার্ভ ব্যাংক-এর তৎপরতায় বর্তমানে ২২৯ মিলিয়নটি প্রাথমিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। বিধিবদ্ধ আর্থিক সংস্থাগুলি এখন সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে। কিন্তু এখনও বহু গ্রাম এমন আছে যেখানে কোনও ব্যাংকের একটিও শাখা নেই। বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণের মাত্র ১০ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে যায় যেখানে মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ বাস করেন। অতএব আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলার আর প্রয়োজন নেই।

এ বছর ২৮ আগস্ট থেকে চালু হয় প্রধানমন্ত্রী 'জন-ধন' যোজনা (পিএমজেডি ওয়াই)। এর লক্ষ্যমাত্রা হল আগামী বছর, অর্থাৎ ২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট-এর মধ্যে ৭.৫ কোটি পরিবারের জন্য ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া। যেদিন এ প্রকল্প চালু হয় ২ কোটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। এই প্রকল্পের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল প্রতিটি ভারতীয়র জন্য ব্যাংকে একটি করে অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া। প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি পরিবারে একটি করে অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক স্বাক্ষরতাও তাদের দেওয়া হবে। ফলে কারও মধ্যস্থতা ছাড়া তারা সহজেই টাকা হাতে পাবে বা অ্যাকাউন্টে জমা করে দিতে পারবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যাদের অ্যাকাউন্ট তাদের জন্য আর্থিক পরিষেবা দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে তাদের ক্ষুদ্র বিমা ও পেনশন দেওয়া হবে। সারা দেশের প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংক-এর শাখা খোলা যেহেতু প্রায় অসম্ভব, তাই অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের সুবিধার্থে ব্যাংক করেসপন্ডেন্ট (BC) নিয়োগ করা হবে। এদের সাহায্য ছাড়া এই প্রকল্প সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করতে পারবে না। দেশের আনাচেকানাচে ব্যাংক-এর সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে ভারত উন্নত দেশগুলির তুলনায় তো বটেই, বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায়ও অনেকটাই পিছিয়ে আছে (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য)। অতএব আর্থিক অন্তর্ভুক্তির এই পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল এবং এর জন্য সরকার যথেষ্ট প্রশংসিত। বাস্তবে, সবার জন্য আর্থিক সংগঠনের সমস্ত সুবিধা সবার নাগালের মধ্যে এনে দেওয়া এবং ঋণদানের ব্যবস্থা করা দেশের আর্থিক উন্নয়ন এবং নতুন উদ্যোগ শুরু করবার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার পক্ষে সত্যিই সহায়ক।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও তার গুরুত্ব

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং সবার জন্য আর্থিক সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করবার সুযোগ করে দেওয়া বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান-এর ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। মূলধনের সঠিক, সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টন এবং ঝুঁকির আশঙ্কা সর্বশ্রেণির সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলেই এই আর্থিক বিকাশ ঘটতে পারে। এছাড়া আর্থিক অন্তর্ভুক্তি মানুষের ভাগে আয়ের অংশ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এবং এর ফলে দারিদ্রের প্রকোপ কমতে থাকে। এছাড়া গরিব মানুষদের জন্য ঋণদানের ব্যবস্থা করে তাদের জন্যও একটু সুযোগ করে দেওয়ার ফলে সামাজিক অসাম্য কমায়। আর্থিক পরিষেবাকে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের নাগালের ভিতরে এনে দেওয়ার ফলে স্বনিযুক্তি ক্ষুদ্র উদ্যোগ, গৃহস্থালিতে ভোগের মাত্রা বাড়া এবং আর্থিক কল্যাণ ইত্যাদির উন্নতি যে ঘটে, তা প্রমাণ করা আজ অত্যন্ত সহজ। বিশেষজ্ঞরা এও বলেন যে দারিদ্র দূরীকরণে ক্ষুদ্র ঋণ একটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার।

ভারতের মতো অপ্রথাগত অর্থনীতিতে গরিব মানুষ টাকা ধার করে আবার সুযোগ বুঝে দেনা মিটিয়ে তাদের রুজি-রোজগার বা ব্যবসাপাতির প্রয়োজন কোনও মতে মেটান। আত্মীয় বন্ধু বা মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করা বা আবর্তনশীল সঞ্চয় প্রকল্পগুলিতে